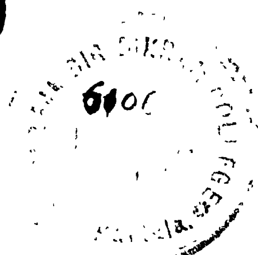
রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়





এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২.

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

মূল্য : টা. ৬'০০ (ছয় টাকা মাত্র)

মুদ্রাকর :
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন
কলিকাতা-৭

কবি শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

করকমলেষু

নিবেদন

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী গবেষক-রূপে যখন 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' সম্পর্কে কাজ শুরু করি, তখনই ভেবেছিলাম বিংশ শতাব্দীর গীতিকাব্য সম্পর্কে না লিখলে এ কাজ সম্পূর্ণ হবে না। প্রস্তুত গ্রন্থ সেই ভাবনার ফল। আধুনিক গীতিকবিতা সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে লেখার ইচ্ছা রইল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে রবীন্দ্রছায়াতলে আশ্রয় লাভ ক'রে যাঁরা কবিতা রচনা করেছেন, 'রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ' তাঁদের কাব্য-সাধনার সামগ্রিক পরিচয় দানের প্রথম প্রয়াস। এই গ্রন্থের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য নাম-প্রবন্ধে আলোচনা করেছি, তার পুনরাবৃত্তি বাহুল্যমাত্র। ভিত্তিহীন অতি-প্রশংসা বা অতি-নিন্দায় আমার আগ্রহ নেই। সৎ মূল্যায়ন ও রসোপভোগেই আমার আগ্রহ। কৈফিয়ৎ এই পর্যন্ত।

এবার ঋণ স্বীকারের পালা। প্রস্তুত গ্রন্থ রচনায় বইপত্র সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীবিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য, শ্রীরঞ্জনকুমার দাস ও অনুজ শ্রীমান বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। পিতৃদেব অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, পিতৃবন্ধু ডক্টর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় এবং বন্ধুবর ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ মিত্রের সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হয়েছি ও অনেক বিষয়ে আমার ধারণাকে স্পষ্ট করে নিতে পেরেছি। অবশ্য সিদ্ধান্তগুলির জন্য আমিই একমাত্র দায়ী। আমার স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় সর্বদা উৎসাহ না দিলে এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হ'ত না। দক্ষিণী বন্ধু শ্রীটি. ভি. গোপালনের বাংলা ভাষা ও কাব্যপ্রীতি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি ; তিনিই প্রবন্ধগুলির প্রথম পাঠক।

সাহিত্যানুরাগী প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে এই গ্রন্থ বর্তমান কাগজ-সংকটের দিনে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ডিসেম্বর, ১৯৫৯
প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলিকাতা-১২

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

॥ ১ ॥

সাহিত্যসংসারে সবাই প্রথম শ্রেণীর লেখক নন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকরাই সংখ্যাধিক্যে অনেকটা স্থান জুড়ে থাকেন। এঁরা হয়ত কোনো মহৎ সাহিত্যকীর্তি রেখে যান না, কিন্তু ইতিহাসের জগতে এঁদের না থাকলে চলে না। সাহিত্যের ধারাকে নিয়ত প্রবহমান রাখার দায়িত্ব এঁরাই গ্রহণ করেন, পালন করেন। মহৎ লেখকের আবির্ভাবকে এঁরাই সুগম ও ত্বরান্বিত করেন। এঁরা সাহিত্যে সম্মাননীয়, কেননা এঁরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেই থাকেন।

তাই মাঝারি-কবিদের কথাও সৎ সাহিত্যপাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এঁদের সম্পর্কে আলোচনায় পাঠকের কিয়ৎ পরিমাণ তাচ্ছিল্য, সমালোচকের উদাসীনতা এবং কবিদের হীনমন্যতা এঁদের সাহিত্য-মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি করে। মহৎ কবির তুলনায় মাঝারি কবিরা অনেকটা অনুজ্জ্বল, তাঁদের সাহিত্যকৃতি কিছুটা কম মূল্যবান : এ চিন্তাই এঁদের সম্পর্কে আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করে। ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যে মাঝারি কবিদের দান আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর হিউ

ওয়াকার এই বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "There is something unpleasant in the phrase, minor poets; and yet it is hardly possible to dispense with the use of it. In the present chapter there will be found included many names, such as that of Mrs. Browning, to which its application may seem almost insulting, and it may be well therefore to explain at the start that it is merely meant to convey the view that the poets so designated are of lesser rank than Tennyson and Browning. It has been said that English literature is not a republic but a monarchy of letters, and that all its members are the subjects of king Shakespeare. In comparison with him, all others might fairly be described as 'minor' writers. Adapting this saying, we have taken Tennyson and Browning to be the joint monarchs of early Victorian song. In the general opinion their reign lasted through the whole length of the period; and as they themselves may be called minor in relation to Shakespeare, so all their

contemporaries in verse, may be called minor in relation to them." (Chap. III, 'The Literature of the Victorian Era', Dr. Hugh Walker)।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের আলোচনায় অনুরূপ অসুবিধা ও অপ্রিয় কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্যুতিতে উজ্জ্বল, প্রভাবে আচ্ছন্ন ও অধিনায়কতায় ধন্য হয়েছে। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের বিপুল সর্বগ্রাসী প্রতিভার কাছে আর সবই অনুজ্জ্বল নিষ্প্রভ বলে মনে হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ ঃ এই পঞ্চাশ বছর রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে চালনা করেছেন। তাঁর একচ্ছত্র একাধিপত্য কেউ বিনষ্ট করতে পারেন নি। খুবই স্বাভাবিক যে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম ও সাহিত্যাদর্শ এ যুগের সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে তিন স্তরের কবিকুল প্রভাবিত হয়েছেন। প্রথম স্তরে, উনিশ শতকের শেষ পাদের কবিরা দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজকুমারী দেবী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রভৃতি। দ্বিতীয় স্তরে—আলোচ্যমান রবীন্দ্রানুসারী কবিকুল—সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরা। তৃতীয় স্তরে—কল্লোল-গোষ্ঠী ও পরবর্তী কালের সাম্প্রতিক কবিকুল। অবিশ্যি কেউ কেউ যে বিরোধিতা করেন নি, তা নয়। যেমন গোবিন্দচন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এঁরা রবীন্দ্র-সরণি ছেড়ে একটি নোতুন

পথাবিষ্কারের প্রয়াস করেছিলেন, তা ফলবতী হয় নি। এঁদের বিরোধিতা বা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়াস দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী, রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাবে তা পরাজিত হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে তাই দুটি কবিগোষ্ঠীর দেখা পাই। একটি গোষ্ঠী, রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, তাঁদের নেতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অপরটি, রবীন্দ্রপ্রভাব-অতিক্রমেচ্ছু কবিসমাজ, তাঁদের নেতা প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, সমর সেন, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এই শেষোক্ত গোষ্ঠী কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-উত্তরা-পরিচয়-পূর্বাশা-নিরুক্ত পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ১৯২৩ থেকে ১৯৩৩—এই দশ বছরে একটি নোতুন কাব্যধারা ও কাব্যদর্শনের সৃষ্টি করেছেন ; এই ধারাই সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ধারা। এই আট জনেরই প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে ১৯২৭ থেকে ১৯৩০এর মধ্যে। এই সময়েই বাংলা কাব্যে মোড় ফেরার ঘণ্টা বেজেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে কবিসমাজের অভ্যুদয় হয়েছিল বিশ শতকের গোড়ায়, তাঁদেরই বলেছি রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ। শতাব্দীর মধ্যবিন্দু অতিক্রম করার আগেই এঁদের সৃষ্টিধর্মী কাব্যসাধনা শেষ হয়ে গেছে ও প্রভাবও অবসিত হয়েছে। রবীন্দ্রানুসরণেই এঁদের সার্থকতা। আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে এঁরাই সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে নিঃশেষ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজেরই তিনজন কবি প্রথম বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন, তাঁদের কাছেই প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু প্রমুখ কবিরা বিদ্রোহের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, একথা অবশ্যস্বীকার্য। এই তিনজন হলেন: মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মোহিতলালের জীবনসম্ভোগবাদ, নজরুলের বাঁধভাঙা তারুণ্যের দুর্দম আবেগ, যতীন্দ্রনাথের আত্মদ্রোহী দুঃখবাদ আধুনিক কবিদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের সার্থকতা ও ব্যর্থতা, অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতি, আত্মসমর্পণ ও পরাজয় আধুনিক বাংলা কবিতাকে বুঝতে সাহায্য করবে বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু, আবার বলি, রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাব কি রবীন্দ্রানুসারী কবিরা, কি আধুনিক কবিরা—কোন গোষ্ঠীই অতিক্রম করতে পারেন নি। আধুনিক কবিদের অন্যতম শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় এর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পাই: "রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সক্রিয় তথা সর্বতোমুখ সাহিত্যিক বাংলাদেশে ইতিপূর্বে জন্মান নি এবং পরবর্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোক না কেন, অনুভূতির রাজ্যে সুদ্ধ তারা এমন কোনও পথের সন্ধান পায় নি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই। বস্তুত তাঁর দিগ্বিজয়ের পরে বাংলা সাহিত্যের যে-অবস্থান্তর ঘটেছে, তা এই: তাঁর অসীম সাম্রাজ্যের অনেক জমি জোতদারদের দখলে এসেছে; এবং তাদের মধ্যে যারা পরিশ্রমী, তারা নিজের নিজের এলাকায় শস্যের পরিমাণ

বাড়িয়েছে মাত্র ;-ফসলের জাত বদ্‌লাতে পারে নি !" (—পৃঃ ৮, 'কুলায় ও কালপুরুষ')

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের কবিরা মুখ্যত এই ক'টি সাহিত্যপত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁদের কাব্য সাধনা চালিয়েছেন : ভারতী, প্রবাসী, মানসী, সুপ্রভাত, বিচিত্রা, মানসী ও মর্মবাণী, উপাসনা, যমুনা, ভারতবর্ষ, প্রতিভা, অর্ঘ্য, জাহ্নবী, বিজয়া, শনিবারের চিঠি। মোটামুটি প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত যে পঁচিশ বছর (১৯১৪-১৯৩৯ খ্রী), সেই পর্বেই এঁদের কাব্যের ফসল বাংলা সাহিত্যের ঘরে উঠেছিল।

এই কবিগোষ্ঠীর অনেকেই যথার্থ শক্তিশালী কবি, তাঁদের 'মাইনর' কবি বলতে স্বভাবতই সঙ্কোচ হয়, তথাপি ডক্টর ওয়াকারের অনুসরণে এঁদের ঐ নামে অভিহিত করা ছাড়া উপায় নেই। আবার অনেক কবি ছিলেন, যাঁরা 'পত্রিকার কবি' ('ম্যাগাজিন পোয়েট') ছাড়া আর কিছু নন। এঁদের সকলের সম্মিলিত সাধনায়, রবীন্দ্র-অনুসরণে ও ব্যর্থতায়, নোতুন পরীক্ষায় ও সার্থকতায় বাংলা কাব্যের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে ও আধুনিক কবিদের আগমনকে সুগম করেছে, এ কথা স্বীকার করতে হয়।

এই কবিসমাজের নেতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। উল্লেখযোগ্য

প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরা হলেন: করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, সতীশচন্দ্র রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পরিমলকুমার ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শেষোক্ত তিনজনই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান কবি ও পরবর্তী কাব্যান্দোলনের পথ-নিয়ামক। এই তেরো জনের কাব্যসাধনা সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের দান, কৃতিত্ব, গুরুত্ব ও সার্থকতা সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ ছবি পেতে পারি। অবিশ্যি আরো বহুকবি ছিলেন ও আছেন, যাঁদের নামও এ প্রসঙ্গে অবশ্য-উল্লেখ্য: রমণীমোহন ঘোষ, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, শশাঙ্ক-মোহন সেন, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, রাধাচরণ চক্রবর্তী, চণ্ডীচরণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুখরঞ্জন রায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দুর্গামোহন কুশারী, সুশীলকুমার দে, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, হেমচন্দ্র বাগচী, সুকুমার রায়, জসীমউদ্দীন, সুনির্মল বসু, শান্তি পাল, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদয়াল বসু, গিরিজাকুমার বসু, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, অপরাজিতা দেবী, তমাললতা বসু, হেমলতা দেবী, উমা দেবী, লীলা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি। আলোচ্যমান তেরোজন কবিদের থেকে

সদ্যোল্লিখিত কবিদের হীনতা প্রমাণ আমার উদ্দেশ্য নয়, তা এখানে স্পষ্ট করেই বলছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি আধুনিক কবিগোষ্ঠীর পাশাপাশি শান্তিনিকেতন-কবিগোষ্ঠীর নাম ; এই শেষোক্ত গোষ্ঠীতে পড়েন—সতীশচন্দ্র রায়, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ রায়, সুধীরচন্দ্র কর, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীলচন্দ্র সরকার, অশোকবিজয় রাহা, কানাই সামন্ত, সুশীল রায় এবং সর্বোপরি প্রমথনাথ বিশী।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের কাব্যপাঠের প্রধান শর্ত হল, পাঠক বাংলাদেশের গ্রামজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং লোক-সংস্কৃতি ও পুরাণকাহিনীর ভক্ত হবেন। আধুনিক জীবনের সংশয় ও বিক্ষোভ, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা নিয়ে এঁদের কবিতা পড়ে রস আহরণ করতে গেলে আমরা ব্যর্থ হবো।

এঁদের সম্পর্কে প্রথম কথা হল, এঁরা কাব্যক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ ও তার ভিত্তিতে কাব্যসৃষ্টি করাই এঁদের মূল লক্ষ্য। এলিঅট যে 'ট্রাডিশনের' কথা বলেছেন, তার গণ্ডী ছেড়ে এঁরা বাইরে যান নি। তাই এঁদের কাব্যভূগোল-পরিধি সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ। দেশের পুরনো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে এঁরা নবরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। বিশ শতকের প্রখর সূর্যালোকে

বৈষ্ণব যুগের ছায়াভরা স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেছেন। বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য ও পুরাণপ্রোক্ত কাব্য-ঐতিহ্য এঁদের হাতে নব মর্যাদা পেয়েছে। নারিকেলের জল যেমন কঠিন আধারে সুরক্ষিত ও স্নিগ্ধ থাকে, ঐতিহ্যের আধারে এঁদের কাব্যও তেমন স্নিগ্ধ ও সুরক্ষিত রয়েছে।

শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বর আমাদের যে অনাবৃত আত্মা দিয়েছেন, তাকে নগ্নাবস্থায় বহন করা চলে না, দেহের খাপে ভরে তাকে রক্ষা করতে হয়, তবেই তার পবিত্রতা ও ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকে। এঁরা অনুরূপ কাব্য-ব্যাপারে বিশ্বাসী। কাব্যের নগ্ন তরবারিকে ঐতিহ্যের খাপে ভরে দেওয়াতেই এঁরা কাব্যসাধনার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। প্রবল রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও সেইজন্য এঁদের কাব্যে ঐতিহ্যপ্রীতি তথা প্রাচীন বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি-জীবন-প্রীতি বজায় আছে।

তাই এঁদের কাব্যের পরিচয় এই ভাবে দেওয়া যায়—প্রাচীন কাব্যধারার মধ্যে নবীনত্বের উদ্‌ঘাটন, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন, সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনধারাকে বহনোপযোগী সংবেদনশীলতা ও চরিত্রদান এবং গ্রামজীবনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মমতা প্রকাশ। বাংলা কাব্যের প্রাচীন ও নবীন যুগে এঁরা সেতু বন্ধন করেছেন। এখানেই এঁদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

আর এই কারণেই বোধ হয় এই গোষ্ঠীর কবিরা রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি কাব্যের ভক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রানুসরণে রোমান্টিক সৌন্দর্য এবং বৈষ্ণব কাব্যানুসরণে ঐতিহ্য প্রীতি এঁদের যথাক্রমে রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের প্রকৃতিধ্যান ও তুচ্ছে-ক্ষুদ্রে ঐশী মহিমা আবিষ্কার, শেলী-কীট্‌সের অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-পিপাসা এবং টেনিসনের ঐতিহ্যপ্রীতিই এঁদের কবিমানস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। বিশ শতকে বাস করেও বিশ শতকের ইংরেজি কাব্যের আত্মানুসন্ধানের নব নব পরীক্ষায় এঁরা কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নি। আর সেই কারণেই কল্লোল-কালিকলমের যে নোতুন সাহিত্যসন্ধান, তা এঁদের প্রভাবিত করে নি।

এই গোষ্ঠীর খুব কম কবির মধ্যেই সমকালীন সমাজ-চেতনা লক্ষ্য করা যায়। নগরজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বেদনা, আশাভঙ্গ, ব্যর্থতা ও নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত মানবাত্মার আর্ত ক্রন্দন এঁদের শ্রবণে পৌঁছয় নি। আসলে এঁরা গ্রামজীবনের কবি—গ্রামের মায়া ও মমতা, স্নেহ ও অনুভূতিই এঁদের ধরে রেখেছিল। একে 'পলায়নী মনোবৃত্তি' আখ্যা দিলে হয়ত ঠিক হবে না। রবীন্দ্রকাব্যে এঁরা যে অক্ষয় শান্তি ও সৌন্দর্যের আশ্বাস পেয়েছিলেন, তা বাস্তব-প্রতিবেশে সমর্থিত হবে না এই আশঙ্কাতেই বোধ করি এঁরা গ্রামজীবনে ফিরে গিয়েছিলেন। নগরজীবনের ফেনিল মদ্য পানে এঁদের ছিল অনীহা, গ্রামলক্ষ্মীর প্রসাদলাভে ছিল একান্ত আগ্রহ। এই মনোবৃত্তির সুন্দর বিশ্লেষণ পাই প্রখ্যাত ইংরেজ

সমালোচক ফর্স্টারের একটি প্রবন্ধে। রূঢ় নিষ্ঠুর বাস্তব-পরিবেশ থেকে কবিদের পশ্চাদপসরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "There are two chief reasons for Escapism. We may retire to our towers because we are afraid·········But there is another motive for retreat. Boredom; disgust; indignation against the herd, the community, and the world; the conviction that sometimes comes to the solitary individual that his solitude gives him something finer and greater than he gets when he merges in the multitude." (—E. M. Forster, "The Ivory Tower", 'London Mercury' Magazine, December 1938 Issue)। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ কবিই এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন শান্ত পল্লীশ্রীতে, ছায়াভরা গ্রামে। কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, কালিদাস, পরিমলকুমার ও যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে এর পরিচয় পাই। আর সমকাল ও নগরজীবনের ছায়াপাত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, সাবিত্রীপ্রসন্ন, সজনীকান্ত, যতীন্দ্রনাথের কবিতায়। কিন্তু এঁরা সমকালে ও বাস্তবে মুক্তি পান নি, রোমান্টিক বিদ্রোহের পথে তৃপ্তি সন্ধান করে ফিরেছেন।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মুগ্ধ আত্মরতির বিরুদ্ধেই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিদ্রোহ করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি এই গোষ্ঠীর হয়েও

সম্পূর্ণভাবে এঁদেরই একজন নন। নিশ্চিন্ত রোমান্টিক সৌন্দর্য-ধ্যান, অন্ধ রবীন্দ্রানুসারিতা, মঞ্জুল-বাক্‌সর্বস্বতার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রূপ-মাখানো প্রতিবাদ তীক্ষ্ণ ও সোচ্চার ঃ

> পেতে নে রে শয্যা,
> দেখে শেখ্ চারিদিকে ঘট্‌তেছে রোজ যা।
> অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে
> মামুলি প্রেমের নেট্‌-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
> তার মাঝে শুয়ে বল্ মশারির নেই আদি—
> অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।
>
> ('মন-কবি', মরীচিকা)

সমকালীন সমাজচেতনা যে কয়েকজনের কবিতায় দেখা যায়, তাঁরাই আধুনিক কবিতার অগ্রদূত ; কাব্যক্ষেত্রে যে দিন-বদলের পালা এসেছে, তা এঁদের কবিতা পড়লে বোঝা যায়। এই কবিগোষ্ঠীর নেতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে তার প্রথম ইঙ্গিত পাই 'সেবা-সাম', 'বিদায়-আরতি', 'নির্জলা একাদশী', 'ইজ্জতের জন্য', 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর', 'জাতির পাঁতি', 'শূদ্র', 'মেথর' প্রভৃতি কবিতায়। মোহিতলাল, নজরুল, যতীন্দ্রনাথের মানবতা-বন্দনায় এরই স্পষ্টতর পরিচয় বিধৃত হয়েছে। মোহিতলালের 'কালাপাহাড়', যতীন্দ্রনাথের 'দুঃখবাদী', নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতা তার প্রমাণ।

এই সমাজচেতনার আরেকটি দিক প্রকৃতি-কবিতায় দেখা গেছে। রবীন্দ্রানুসারী কবিরা সাধারণভাবে প্রকৃতির রোমান্টিক

সৌন্দর্যধ্যানে বিভোর গ্রামপ্রকৃতির রূপবন্দনায় মুখর এবং প্রকৃতিতে শান্তির আশ্রয় সন্ধানে নিয়ত তৎপর। কিন্তু এরই মধ্যে সংশয়ের আভাস পাওয়া গেল। আধুনিক কবিসমাজের মোহমুক্ত খোলা চোখের দৃষ্টির প্রথম আভাস পাই সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতায়; যতীন্দ্রনাথের 'পারুলের আহ্বান' কবিতায় সে সংশয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইভাবে এঁরা নিজেদের ভিতর থেকেই আগামী পালা-বদলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন। আর সেখানেই এঁরা আধুনিক বাংলা কবিতার যোগ্য ভূমিকা রচনা করেছেন। অপরদিকে, রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের অনুবর্তী সতীশচন্দ্র রায়ের প্রকৃতি-কবিতায় একটি বিমুগ্ধ রোমান্টিক কবিমানসের পরিচয় পাই।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্যতম চরিত্র-লক্ষণ হল: আস্তিকতাবোধ, সৃষ্টি ও মঙ্গলে গভীর আস্থা, শান্তিতে বিশ্বাস। ঐতিহ্যপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রীতি এই কাব্যাদর্শে পৌঁছতে এঁদের সাহায্য করেছে। কবি-মানসিকতার চরিত্র-নির্ণয় করলে আমরা দেখি, একটি ঐক্যসূত্রে এঁরা বাঁধা পড়েছেন—যাকে নজরুল, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথও অস্বীকার করেন নি। কাব্যকলার প্রতি গভীর মমতা ও গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর প্রীতি ও সম্ভ্রমবোধ, রবীন্দ্রকাব্যের জীবনপ্রেম ও শান্তির অক্ষয় অধিকারে বিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধের (values) উপর গভীর শ্রদ্ধা ও আস্তিকতাবোধ: এই ক'টি লক্ষণ এঁদের কবিতায় বর্তমান। এখানেই এঁরা

একই সরাণর পথিক। জগৎ ও জীবনের প্রতি শান্তিপূর্ণ আস্তিক দৃষ্টি এবং কাব্যকলার নিষ্ঠাযুক্ত সাধনায় আগ্রহ, এঁদের আধুনিক কবিকুল থেকে সরিয়ে নিয়েছে।

গ্রামজীবন ও প্রকৃতির প্রতি এঁদের যে আসক্তি ও মমতা, তা রোমান্সের মোহাঞ্জন-মাখানো। এক্ষেত্রে এঁরা রোমান্টিক। তবুও দু'একটি ক্ষেত্রে পল্লীপ্রীতিতে সংযুক্ত হয়েছে তীব্র তিক্ত বাস্তব-চেতনা ; তার পরিচয় পাই সাবিত্রীপ্রসন্ন ও যতীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের কবিতায়। অন্যত্র, যেমন, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, কালিদাসে তা বৈষ্ণব দৃষ্টির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। বিশ শতকে তাঁরা একটি দূর বৈষ্ণব রূপলোক সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন আপন আপন কাব্যজগতে। ভারত সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের প্রতি রোমান্টিক দৃষ্টি ঃ এঁদের কাব্যে সর্বত্রই দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ থেকে কুমুদরঞ্জন, কেউ-ই তা থেকে বঞ্চিত নন। কয়েকটি ক্ষেত্রে বঙ্গদেশ-ও-ভারত-মহিমা-খ্যাপন অবশ্য মহিমা-তালিকা-প্রণয়নে পর্যবসিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'বারাণসী', 'আমরা' বা কালিদাসের 'গঙ্গা' কবিতা তার প্রমাণ।

সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল, যতীন্দ্রনাথ যেমন আগামী কাব্য-পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, অপর দিকে তেমনি কয়েকজন পূর্বতন কাব্যধারাকেই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। দুটি বিষয়ে উনিশ শতকের বাংলা কাব্যের অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। এক, নারী-বন্দনা ; দুই, গার্হস্থ্যজীবন-চিত্রণ।

গত শতকে নবজাগরণের প্রথম প্রহরে নারীবন্দনার ধূম পড়েছিল কবিদের মধ্যে। গৃহলক্ষ্মীকে একটি নবজাগ্রত রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছিল। বিশ্বসৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী অপেক্ষা গৃহলক্ষ্মীর প্রতি সেদিনের কবিরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী', সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা', দেবেন্দ্রনাথের 'নারীমঙ্গল', অক্ষয়কুমারের 'এষা' কাব্যে যে নারীবন্দনা, তারই অনুস্মৃতি এঁদের কাব্যে লক্ষ্য করি। দাম্পত্যরস এঁদের কাব্যে অন্যতম প্রধান আলম্বন; একে আশ্রয় করেই নারীবন্দনা রচিত হয়েছে। কিরণধন, পরিমলকুমার, যতীন্দ্রমোহন, কালিদাস, করুণানিধান, সাবিত্রীপ্রসন্ন নারীস্তোত্র রচনায় কখনো ক্লান্ত হন নি। পরিমলকুমার ঘোষের 'নারীমঙ্গল' কাব্যটিই তো এই নারীবন্দনার সুরে বাঁধা।

গার্হস্থ্যজীবনচিত্রণে এঁরা গত শতকের কাব্য-ঐতিহ্যকে বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করেছেন। দাম্পত্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর : এই চার রসের যে সুন্দর প্রকাশ বাঙালির ঘরে ঘরে দেখা যায়, তা-ই এঁদের কাব্যে লক্ষ্য করি। সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রমোহিনী, দেবেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, প্রমথনাথ, গোবিন্দচন্দ্র, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়ের কবিতায় বাঙালি গৃহস্থ ঘরের যে সুখ-বেদনা-উল্লাস-শোক-দুঃখ-মেশানো করুণমধুর উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তারই প্রতিচ্ছবি দেখি কিরণধন, রমণীমোহন, পরিমলকুমার, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, কালিদাসের কবিতায়।

এই শ্রেণীর কবিতা আজ বাংলা কাব্যসংসার থেকে অবলুপ্ত।

এঁরা যে প্রেম-কবিতা রচনা করেছেন, তা রোমান্টিক আদর্শায়িত দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত প্রেমকবিতা। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের যে উচ্চতর রূপ, এঁদের হাতে তা তরল-সুলভ রূপ লাভ করেছে। আধুনিক প্রেমকবিতার বিচিত্র বিন্যাস, তির্যক প্রকাশ, জটিল চিত্রকল্প এঁদের প্রেমকবিতায় অনুপস্থিত। বাঁধন-ছেঁড়া স্বাধিকার প্রমত্ত প্রেমের লীলা এঁদের কাব্যে নেই ; সে অভাব তাঁরা পূরণ করেছেন ভক্তি দিয়ে। রবীন্দ্রানুসারী রোমান্টিক প্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সতীশচন্দ্র রায়ের কবিতায় পাই।

এঁদের কবিতার আরেকটি প্রধান উপজীব্য, স্বদেশপ্রেম। দেশপ্রেমকে যে জ্বলন্ত প্রেরণা ও তীব্র অনুভূতির আগুনে গলিয়ে কাব্য-উপাদানে পরিণত করা যায়, তা নজরুল, সজনীকান্ত ও সাবিত্রীপ্রসন্নে যথেষ্ট আছে। নজরুলের 'অগ্নিবীণা' ও 'বিষের বাঁশী' এবং সাবিত্রীপ্রসন্নের 'রক্তরেখা', 'আহিতাগ্নি' ও 'জ্বলন্ত তরোয়ার' স্বদেশ-প্রেমের কাব্য রূপে একদা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই শ্রেণীর কবিতার সাফল্য অনায়াসলভ্য। কিন্তু স্থায়ী কবিতা রূপে গৃহীত হবার যোগ্যতাও আলোচ্যমান কবিতাগুচ্ছের আছে। অন্যান্য কবিরাও এই সুরের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বস্তুত, সে সময়টাই (১৯২৪-৩৩ খ্রী) ছিল ঝোড়ো হাওয়ার সময় ; সমাজে রাষ্ট্রে ব্যক্তিজীবনে দিন-বদলের পালা এসেছে, এই ধরণের কথা সেদিন আকাশে বাতাসে ঘুরেছে। আর এই

উন্মাদনার মধ্যে ভাঙনের নেশাও কম ছিল না ; সাহিত্যে তার দুঃখকর প্রমাণ, নজরুল ইসলামের অপচয়িত শক্তি। দেশপ্রেম যেখানে প্রত্যক্ষ প্রকাশ লাভ করেনি, সেখানে তা পুরাণকাহিনী ও অতীত-ইতিহাস-প্রীতিরূপে দেখা দিয়েছে ; সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, কালিদাস, কুমুদরঞ্জনের কাব্যে তার অজস্র পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ রবীন্দ্র-প্রভাবে বিকশিত ও পরিণত। আপত্তি উঠতে পারে নজরুল, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে। কিন্তু গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের বিদ্রোহ রবীন্দ্র-প্রণতির নামান্তর মাত্র। নজরুলের যে বিদ্রোহ, তা রোমান্টিক বিদ্রোহ। যৌবনের যে গান নজরুল গেয়েছেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তারুণ্যবন্দনার মিল রয়েছে। বলাকা কাব্যের 'সবুজের অভিযান' কবিতার সঙ্গে নজরুলের 'দুর্বার যৌবন' কবিতার মিল স্পষ্টই ধরা পড়ে। আর নজরুলের প্রেম-চেতনা মূলত রবীন্দ্রানুসারী, তার প্রমাণ 'দোলন-চাঁপা'র প্রেমকবিতা এবং গজল গান।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের মানসিকতা ভিন্নতর। বস্তুত এই দুই কবিকে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রানুসারী কবি বলা যায় না। আধুনিকতার বিশেষ লক্ষণগুলি উভয়ের কাব্যেই পরিস্ফুট। রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে কঠোর বস্তুসত্যকে কাব্যের আলম্বন হিসেবে গ্রহণ, তীক্ষ্ণ যুক্তি-তর্ক-ব্যঙ্গপ্রবণতা, মানবসুলভ অনুভূতিকে প্রাধান্যদান, স্বপ্নাতুরতা ও

ভাবালুতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন, দুঃখবাদ প্রচার ঃ যতীন্দ্রনাথের কাব্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। আবার দেহাতীত রোমান্টিক প্রেমের প্রবল অস্বীকৃতি, মোহমুক্ত তীব্র জীবনপিপাসা, সংস্কাররাহিত্য, অধ্যাত্মচিন্তার বিরোধিতা, কঠোর সত্যভাষিতা মোহিতলালের কাব্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তবে দুজনেই কাব্যরূপ ও কলাবিধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করেছেন। দুজনেই কাব্যাদর্শের বিচারে রক্ষণশীল ছিলেন, বিশেষত মোহিতলাল। তিনি কাব্যের বিশুদ্ধি রক্ষায় যত্নবান ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কাব্যে (সায়ম্-ত্রিযামা) তাঁর কাব্যাদর্শের পরিবর্তন ঘটেছিল, তিনি শ্রান্ত হয়ে সনাতন কাব্য-পথে ফিরে গৃহনিষ্ঠ জীবনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন; স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন কবি একদা-অস্বীকৃত প্রেমকে মেনে নিয়েছিলেন।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজই রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত ও মূলত আস্তিক; মঙ্গল ও শান্তির শেষ বিজয়ে তিনি কখনো আস্থা হারান নি। বাস্তবাতীত মহত্তর সত্তার আভাস তিনি সমগ্র কাব্যজীবনে অনুভব করেছেন, এ থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি। আদর্শ সৌন্দর্য-সন্ধানকে রবীন্দ্রনাথ কখনো বিদ্রূপ করেন নি, নৈরাশ্য মাঝে মাঝে তাঁর

কাব্যে দেখা দিলেও তা কখনো প্রাধান্য লাভ করে নি; তার সঙ্গে আস্তিক্যবোধ সব সময় জড়িত ছিল।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ এই কাব্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন রবীন্দ্রকাব্যে তাঁরা শান্তি ও মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের যে মনোভাব, সেটি যতীন্দ্রমোহন বাগচী সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে একটি কবিতায়ঃ

বসেছিলাম পায়ের কাছে, ভেবেছিলাম মনে,
একটা-কিছু চেয়ে নেব সেবায় আরাধনে!
আর সবারই পূজার শেষে
বলেছিলে ঈষৎ হেসে,
কবি, তুমি বলো, তোমার কিসের নিবেদন,
বলেছিলাম, পাই যেন এই সঙ্গ সারাক্ষণ।......

মুখের কথা নাই বা হলো, বুকের মাঝেই থেকো,
দিন ফুরাবার আগেই আমার এই কথাটি রেখো।
চোখের পথে মনের মাঝে
তোমার যে সুর-সারং বাজে,
সেই সুরেরই আবেশ যেন না ছাড়ে এক তিল,
চোখের পাতায় মনের খাতায় হারায় নাকো মিল।

এই ভক্তিনম্র আত্মনিবেদনের সুরটি রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মনের কথা। আগেই বলেছি, নজরুল, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ রবীন্দ্র-প্রণতিরই নামান্তর। এঁদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনায় তা বিস্তৃত ভাবে বলেছি।

'কল্লোল' (১৯২৩)-'কালিকলম'-'প্রগতি'-'উত্তরা'-'পরিচয়'-'কবিতা'-'পূর্বাশা' পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে যে আধুনিক কবিসমাজের আবির্ভাব, তাঁরা রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শে এই অর্থে বিশ্বাসী নন। আধুনিক কবিরা নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী। এঁরা ইহ-বাদী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংশয় ও নৈরাশ্য এঁদের কাব্যজীবনের সূচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে, পরে তা বক্রকটাক্ষসমন্বিত জীবন-দর্শনে পরিণতি লাভ করেছে। উনিশ শতকের প্রতিষ্ঠিত কাব্যাদর্শ ও বিশ শতকের প্রথম পাদে জীবনসত্যের মধ্যে অসঙ্গতিবোধ থেকেই আধুনিক ইংরেজি কবিতার জন্ম। অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দেয় বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদের বাংলাদেশে ও সাহিত্যে; তারই প্রতিক্রিয়ায় বাংলা কাব্যে নোতুন জীবনবোধ দেখা দিল। প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-সমর-সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে এই নোতুন জীবনবোধের পরিচয় পাই বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে। এখানেই বাংলা কাব্যে পালাবদল হল। রবীন্দ্রনাথের সহায়তা এবং রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের পশ্চাদ্‌গতি এই পালাবদলকে ত্বরান্বিত করেছে।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের হাতে কবিতার ভাবসম্পদ ও শব্দসম্পদ যখন অতিলালিত্য ও অতি-ব্যবহারের জন্য প্রেরণা-নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল, তখনই দেখা মিলল আধুনিক কবিতার। অলঙ্কৃত সমিল কাব্য-প্রসাধনে ও ছন্দোলালিত্যে অনীহা এবং মঞ্জুল বাকসর্বস্বতায় অশ্রদ্ধা নিয়ে আধুনিক কবিরা



এলেন। তাঁদের এই আগমনের ভূমিকা রচিত হয়েছে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের ব্যর্থতায়। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের করণীয় যে কঠোর অপ্রিয় ভাষণ, তার দায় থেকে উদ্ধার করেছেন অগ্রণী কবি-সমালোচক শ্রীবুদ্ধদেব বসু। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এখানে তুলে দিলেই কাজ উদ্ধার হয়।

সে মন্তব্যটি এই ঃ "রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ অন্যান্য কবিদের মধ্যে কতকগুলি মুদ্রাদোষের সৃষ্টি করেছিল। পঁচিশ বছর আগেকার বাঙালি কবিরা শিথিল ও তরল হওয়াটাকেই গৌরবের মনে করতেন ; অকারণ বিশেষণের ছড়াছড়ি, প্রকৃতি-বর্ণনার বাড়াবাড়ি, ছন্দ-মিলের অতিপ্রকট চাতুর্য, এ-সব জিনিষেরই তখন বাজার-দর ছিলো চড়া। সর্বোপরি, কবিরা তখন ছিলেন সম্পূর্ণই আত্মকেন্দ্রিক ; অর্থাৎ যে-বিষয় নিয়ে লিখেছেন তার দিকে লক্ষ্য না রেখে নিজের দিকে তাকিয়ে লেখাই তাঁদের অভ্যেস ছিলো। সুতরাং তাঁদের উৎকৃষ্ট রচনাও ভাববিলাসের উচ্ছ্বাস ছাড়িয়ে বেশিদূর উঠতে পারে নি ; যদি বা কখনো কিছু ক্ষীণ বক্তব্য থাকতো, অজস্র ব্যঞ্জনাহীন কথার চাপে তা দম আটকে মারা যেতো কয়েক পংক্তির মধ্যেই।

এই সহজ, অতি সহজ বাক্যচ্ছটার বিরুদ্ধেই আধুনিক কবির উদ্যোগ। কিছুকাল পূর্বে বাংলা কাব্যে যে-অস্থিহীন নমনীয়তা পরিব্যাপ্ত ছিলো তা থেকে আমাদের কবিরা যে আজ মুক্ত, এ-কথা উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করা বেশি শক্ত নয়। তার গায়ে আজ হাড়মাংস গজিয়েছে, তার রক্ত বইছে দ্রুত তালে।

অকারণ বাক্যভার আর নেই, নিজেকে অতিক্রম করে পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখবার চেষ্টা আজ সুস্পষ্ট। ছন্দের তরলতার চেয়ে দৃঢ়তাই বেশী, একটু-একটু মিষ্টি-মিষ্টি টুংটাং-এর বদলে গূঢ় ধ্বনি প্রতিধ্বনির দিকে ঝোঁক পড়েছে। অনুপ্রাসাদি অলংকার যখন অনিবার্যভাবে এসেই পড়ে, তখন দেখতে পাই সেগুলিকে অপ্রধান, এমন কি প্রচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা।" (—'কালের পুতুল', ১ম সং, পৃঃ ১১৫-১৬)।

সত্যেন্দ্রীয় ধ্বনিরোল ও ছন্দমৌতাতের নেশা কাটিয়ে যে আধুনিক কবিতা দেখা দিল, তার রূপান্তর সাধনে সাহায্য করেছেন এই গোষ্ঠীরই তিন কবি—নজরুল, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ। আধুনিক কবিদের হাতে এই রূপান্তর সাধন সম্পূর্ণ হয়েছে।

আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট চরিত্র-লক্ষণগুলি আলোচনা করলেই রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের সাধনা থেকে আধুনিক কবিদের সাধনার ভিন্নতা প্রমাণিত হবে। পল্লীপ্রীতি, ঐতিহ্য-আনুগত্য, মুগ্ধ আত্মরতি, ভক্তিপ্রবণতা, ভাববিলাস, ছন্দোচাতুর্য ও মঞ্জুল বাক্‌সর্বস্বতা, নগরজীবনের প্রতি বিরাগ ও রূঢ় বাস্তবের অস্বীকৃতি রবীন্দ্রানুসারী কাব্যসাধনায় আমরা লক্ষ্য করেছি। বিপরীত দিকে আধুনিক কবিতায় লক্ষ্য করি, তা একান্তভাবেই নগরভিত্তিক ও সমাজ-সচেতন। আমাদের কালের মধ্যে দিয়ে দুটি রুধির নদী প্রবাহিত হয়েছে; তা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের পূর্বতন আশা-ভরসাকে নির্মূল করেছে; ফলে এসেছে

তিক্ততা, নিরাশা, হতাশা ও বেদনা ; এসেছে রোমান্টিক স্বপ্নাবেশের দ্রুত সমাপ্তি ও প্রখর বাস্তবের সূর্যালোকোদ্ভাসিত নোতুন জগৎ। সংস্কারমুক্তি ও কেন্দ্রাপসরণ, বিশ্ববীক্ষা ও বৈদেশিকতা, নাগরিকতা ও তির্যকদৃষ্টিসমন্বিত জীবনবোধ, অকপট সত্যনিষ্ঠা ও রূঢ় বাস্তবচিত্রণে আগ্রহ আধুনিক কবিতায় বড়ো হয়ে উঠেছে। আর এই সব লক্ষণের মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারি, অন্ধ রবীন্দ্রানুসারিতার দিন শেষ হয়েছে, বাংলা কাব্যে পালাবদল হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে যে কবিসমাজ বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে কাব্যসাধনা রেখে গেলেন, তা দ্রুত পরিবর্তমান বাংলা কাব্যসংসারের ঘরে বিগত যুগের শস্যরূপেই সঞ্চিত হবে। ইতিহাসবোধের দ্বারা প্রণোদিত ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েই আধুনিক কাব্যপাঠক রবীন্দ্রানুসারী কাব্যসাধনার রসাস্বাদ করবেন, এখানেই বর্তমান আলোচনার সার্থকতা।

বর্তমানের অনাদর ও মহাকালের বিচারে আস্থা ঃ এ দুটিকে স্বীকার করে নেওয়া প্রত্যেক সৎ কবির অবশ্য কর্তব্য। সুখের বিষয়, রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ এ কথা বিস্মৃত হন নি। কবি কালিদাস রায়ের একটি সম্প্রতি-রচিত কবিতায় এই সত্যটি বিধৃত হয়েছে ; তিনি এই গোষ্ঠীর মনের কথাটি প্রকাশ করেছেন নিরুত্তাপ শান্ত কণ্ঠে ঃ

বিদায় নিল লুকোচুরি শিউলি যুঁইএর বনে
বিদায় নিল সজল চোখে ন'বছরের ক'নে।

বিদায় নিল কাঁচপোকা টিপ, নয়নে কাজল
নাকটি হ'তে নোলক মোতি, চরণ হতে মল।
বিদায় নিল লাল পেড়ে আধ ঘোমটাটি বধূর
সরল সভয় তরল চোখের চাউনি সুমধুর।
সুবাসভরা টেক্কা খোঁপার চারু চিকন ছবি,
তাদের সাথে বিদায় নিল কবি।......

ধনপতি সাধুর পায়ের উদ্ধত দাপট
ভেঙে দিল খুল্লনা মা'র চণ্ডীপূজার ঘট
ধানদূর্বার আশিস গেল, মায়ের হাতের ফোঁটা,
হৃৎকমলের পাপড়ি ঝরে রইল সুধু বোঁটা।
যুগের হাওয়া বদ্‌লে গেল, নিভিয়ে দিল ঝড়
বঙ্গমাতার আঁচল আড়ের দীপটি মনোহর।
কবির যত পুঁজিপাটা বিদায় নিল সবি,
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।

এই কাব্যধারা পাঠে যে আনন্দ, তা-ই হয়ত সমালোচকের পরমা-প্রাপ্তি। আর এই আনন্দই তো কালজয়ী, এই ভালোবাসাই তো চিরন্তন, এই শান্তির আশ্রয়ই তো কাব্যপাঠের পরম প্রাপ্তি। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মূল্যায়নে এটাই আসল কথা। Love is not Time's fool। সমস্ত পরিবর্তন—জীবনবোধের পরিবর্তন, সাহিত্যরুচির পরিবর্তন, যুগের পরিবর্তন, সমাজের পরিবর্তন—সবার উপরে এই ভালোবাসাই তো বেঁচে থাকবে। এই ভালোবাসার স্বাক্ষর এখানে রইল, এই আশ্বাসেই বর্তমান আলোচনার সূচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ ১ ॥

রবি-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-যুগে যে কজন বাঙালি কবি আপন স্বাতন্ত্র্যে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) তাঁদের অন্যতম। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও কাব্যগত নৈকট্য থাকা সত্ত্বেও 'নৈবেদ্য'-পরবর্তী যুগের ও 'বলাকা'র কবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ চলেছিলেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, সত্যেন্দ্র-কাব্যে এমন কিছু ছিল যার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাব স্বীকার করেও স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবি-জীবনের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ নয়, ১৯০০ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর সব কবিতা রচিত হয়েছে। অবশ্য ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 'বেণু ও বীণা'র কয়েকটি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। 'সবিতা' কাব্যে (১৯০০) তাঁর প্রথম আগমন। তাঁর কাব্য-তালিকা এই ঃ সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), বেণু ও বীণা (১৯০৭), হোমশিখা (১৯০৭), তীর্থসলিল (১৯০৮), তীর্থরেণু (১৯১০), ফুলের ফসল (১৯১১), কুহু ও কেকা (১৯১২), তুলির লিখন (১৯১৪), মণিমঞ্জুষা (১৯১৫), অভ্র-আবীর (১৯১৬), হসন্তিকা (১৯১৭), এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত বেলাশেষের গান (১৯২৩), বিদায়-

আরাতি (১৯২৪), কাব্যসঞ্চয়ন (১৯৩০)। এর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের সমৃদ্ধি-পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ১৯১১-২২ পর্যন্ত বারটি বছরকে, 'ফুলের ফসল' থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।.

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার সম্যক্ আলোচনার আগে তাঁর মনোজীবনের সন্ধান গ্রহণ প্রয়োজন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, আরও অনেকেই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ ও সৃষ্টিপ্রেরণার মৌল উৎস বলে পরিগণিত হতে পারেন। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং মাতুল কালীচরণ মিত্র ছাড়া অজিত চক্রবর্তী, সতীশ রায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ রবীন্দ্র-শিষ্যদের প্রভাবে সত্যেন্দ্র-চরিত্র গঠিত হয়েছিল। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে সত্যেন্দ্রনাথ অভিষিক্ত ও স্নাত হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতিতে যে নীতিপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, কাব্যরসের সঙ্গে দর্শনচিন্তার যে পরিণয়-সাধন-প্রয়াস দেখা যায়, তার মূলে আছেন পিতামহ মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের গূঢ় স্বাজাত্যবোধের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। উনবিংশ শতকের জাতীয় সাধন-চিন্তা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। ফলে সংশয়পিষ্ট বর্তমান ও স্বর্ণময় অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে সেতু-নির্মাণের প্রয়াস তাঁর কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা'র ভূমিকায় এই জীবনাদর্শের প্রকাশঃ "এখনও সময় আছে। পূর্ব প্রতিভার অঙ্গারে এখনও অনল আছে। কে বলিল উৎসুক ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিবে না।" অতীত ভারত-সাধনাকে আত্মসাৎ করেই

বর্তমান ভারতের অগ্রগতি ঘটবে, এই বিশ্বাসে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার সূচনা।

তারপর কালীচরণ মিত্র ও সুরেশ সমাজপতির রক্ষণশীলতা, নীতি-প্রবণতা, শৃঙ্খলাপ্রিয়তা ও বৈজ্ঞানিক মননাদর্শ এক দিকে সত্যেন্দ্র-কবিপ্রকৃতিকে গড়ে তুলেছে, অপর দিকে অজিত চক্রবর্তী, সতীশ রায় ও প্রমথ চৌধুরীর এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের ও আনন্দ-বেদনার উৎসার, কল্পনা ও ফ্যান্সি, বাধা-বন্ধহারা আবেগ ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-সন্ধান সত্যেন্দ্র-কবি-মানসকে বিকাশ লাভে সাহায্য করেছে। এই দুই আকর্ষণ-বিকর্ষণে সত্যেন্দ্র-প্রতিভা গড়ে উঠেছে। তাই হিন্দু-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী সত্যেন্দ্রনাথ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সবুজ পত্রে'র প্রথম সংখ্যায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'যৌবনে দাও রাজটীকা'। এ যৌবন য়ুরোপের যৌবন। প্রমথ চৌধুরী তারই উপাসক। কিন্তু এই পর্যন্তই। তার পরই উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হল। প্রমথ চৌধুরী কোথাও রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাবে পড়েন নি, তাঁর ব্যঙ্গ-প্রধান ফরাসী-সুলভ জীবনাদর্শ তাঁকে রক্ষা করেছিল; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-প্রভাবকে স্বীকার করেছিলেন। কেবল স্বীকৃতি নয়, আনুগত্য প্রকাশ, আত্মসমর্পণ, আত্মনিবেদন। তার প্রমাণ, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাবলী।

॥ ২ ॥

সত্যেন্দ্র-প্রতিভার আলোচনায় যে প্রধান প্রশ্নের বাধা, তা হল তাঁর কবি-প্রতিভার স্বরূপ-বিচার। সত্যেন্দ্র-প্রতিভার ফল-শ্রুতি পাঠককে তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণে উৎসাহিত করে না কেন? মহৎ কবিতার উপযোগী আন্তরিক গভীর হৃদয়াবেগের অভাব সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে আছে। কল্পনা অপেক্ষা ফ্যান্সি প্রাধান্য লাভ করেছে। সত্যেন্দ্র-কাব্যে আবেগ-বিরলতার মূলে আছে অতিরিক্ত বস্তুপ্রাধান্য, বিজ্ঞানী বিশ্লেষণ-বুদ্ধি, যুক্তি-নীতি-পরায়ণতা, প্রত্যক্ষ বাস্তবানুরাগ। সার্থক কবিতা রচনায় এগুলি বাধা নয়, কিন্তু যদি কেবল এই-ই থাকে আর কোন উপাদান না থাকে তখন এগুলি অবশ্যই বাধা। কেবল যুক্তি শৃঙ্খলা নয়, চাই সামগ্রিক ঐক্যানুভূতি; কেবল লঘু কল্পনার লীলাচাপল্য নয়, চাই গভীর সর্বসঞ্চারী মহৎ কবিকল্পনা; কেবল মেধা ও পাণ্ডিত্য নয়, চাই ধীর বুদ্ধি ও সংযম; কেবল উল্লাস ও ছন্দের খেলা নয়, চাই রচনার সর্বাঙ্গীণ সমতা; কেবল শিশুসুলভ আতিশয্য নয়, চাই স্থিতধী জীবনবোধ; কেবল আকস্মিক নৈপুণ্য নয়, চাই সামগ্রিক সুষম বাণী-শ্রী (temperate style); কেবল বর্ণালিম্পন ধ্বনিপ্রাচুর্য ও চিত্রসৌন্দর্য নয়, চাই সামগ্রিক জীবনবোধ যা সামগ্রিক সৃষ্টিকে ব্যাপ্ত করে। ঠিক এই গুণগুলিরই অভাব সত্যেন্দ্র-কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। তাই সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর কবি হতে পারেন নি।

উঁচুদরের সামগ্রিক কবিকল্পনা (higher imagination)

অপেক্ষা লঘু কল্পনার খেয়াল-খুশি (fancy) সত্যেন্দ্র-কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। এই লঘু খেয়ালি কল্পনার স্তর উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না। তার মূলে আছে সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তি-চরিত্র। "সত্যেন্দ্রনাথ এত পড়াশুনা করিয়াছিলেন, শিল্প ও সাহিত্যের এত অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহার মেধা এমন তীক্ষ্ণ ছিল, তথাপি তাঁহার চরিত্র ছিল বালকের মত অপরিণত। তিনি বালকের মতই উত্তেজনাপ্রবণ, বালকের মতই কৌতূহলী, এবং বালকের মতই সরল ও অপকট ছিলেন। বিশ্বাসের সাহস, অবিশ্বাসের অসহিষ্ণুতা এবং পক্ষপাতের উগ্রতা, এই তিন দোষই তাঁহার মানস-প্রকৃতিতে কিছু অধিক পরিমাণে ছিল, এবং তাহার ফলে তিনি কোন ভাব বা চিন্তাকে একটি বিচারসঙ্গত, শান্তশ্রী দান করিতে পারিতেন না।" (মোহিতলাল মজুমদার, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২১২)

তাই এ কথা বলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ফ্যান্সির কবি, লঘু কল্পনার কবি, খেয়ালি উচ্ছ্বাসের কবি। তাঁর কাব্যে শিশুসুলভ ভাবচাপল্য, উল্লাস-প্রবণতা, ক্রীড়াশীলতা, বর্ণালীর সমারোহ দেখা যায়। লঘু চপল ছন্দে এই উল্লাস ধরা পড়েছে। শিশুচিত্ত যেমন নানা বর্ণবৈচিত্র্য ও খেলনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সত্যেন্দ্র-প্রতিভা তেমনই ছোট ছোট মনোহর চিত্র অঙ্কনে ও লীলাচপল ছন্দ ব্যবহারে আনন্দলাভ করেছে। তাই সত্যেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতায় শিশুসুলভ উচ্ছলতা

ও কলকাকলি শোনা যায়। পিয়ানোর টুং-টাং সুরে, পাল্কির ও নৌকার মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল গানের সুরে, ইলশে গুঁড়ির ঝির-ঝির সুরে, ঝরনার উচ্ছলিত গানে, চরকার ঘর্ঘর সুরে, লালপরী আর জর্দাপরীর পাখ্‌নার গুঞ্জনে সত্যেন্দ্রনাথ অপার আনন্দ লাভ করেছেন। এখানেই তাঁর মুক্তি। এই তাঁর গুণ, এই তাঁর ত্রুটি।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শে কোনও বিরোধ নেই। কোনও সংশয়ের দ্বারা তিনি কখনও পীড়িত হন নি। ধ্বনিবৈচিত্র্যের উৎসাহ ('পিয়ানোর গান', 'ঝর্ণার গান', 'চরকার গান', 'পাল্কীর গান', 'কাজরী'), বর্ণালিম্পনের আনন্দ ('হিন্দোল', 'বিলাস', 'জাফরানিস্থান', 'জর্দাপরী'), সত্যেন্দ্রনাথকে যেমন কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত করেছে, তেমনিই সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্রগত ঘটনার বর্ণনায় ('সেবা-সাম', 'বিদায়-আরতি' 'নির্জলা-একাদশী', 'ইজ্জতের জন্য', 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর', 'জাতির পাঁতি') তাঁর অমিত উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এ কেবল মেধা ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক, মহৎ কবিপ্রতিভার পরিচয় নয়। আর এইজন্যই তাঁর কাব্যজীবনে কখনও সংকট উপস্থিত হয়নি। শিশুসুলভ অপার বিস্ময়, চাঞ্চল্য, উল্লাস ও উচ্ছলতা তাঁর কাব্যে গতি দিয়েছে, ছন্দোচাতুর্যে ক্ষিপ্রসঞ্চারী চরণমাধ্যমে তিনি পাঠককে ছুটিয়ে নিয়ে গেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কৌতূহল ছিল বালকের মত প্রবল, তার প্রমাণ তাঁর অনুবাদ-কবিতাগুচ্ছ 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' ও

'মণিমঞ্জুষা'। তাঁর অনুবাদ-কুশলতা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু সর্বত্র তিনি সাফল্য লাভ করেন নি। বিচিত্র অভিনব বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ ছিল, তার প্রমাণ এই অনুবাদ-কবিতা। তিনি যে সব বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেছেন, সেগুলির নির্বাচনে সাহিত্যিক-রসবোধের উপর জয়লাভ করেছে সাহিত্যিককৌতূহল। মহৎ কবি ও কাব্য অপেক্ষা বিচিত্র অপরিচিত অভিনব কবিতা ও কবির উপরেই তাঁর ঝোঁক ছিল। ভাল্‌মোর, লেকঁৎ-দ্য-লিল্‌, লি-পো, ৎসেন-ৎসান, লো-তুং, নোগুচি, জেবুন্নিসা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত কবিদের কবিতা অনুবাদে তাঁর শিশুসুলভ আগ্রহ ও কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে, বিদগ্ধজনোচিত রসসৃষ্টিক্ষমতা প্রকাশ পায় নি। আবার কীট্‌স, ওঅর্ডস্‌-ও আর্থের অনুবাদে রোমান্টিক কবিতার গভীর সৌন্দর্যধ্যান প্রকাশ পায় নি। বিষয়বৈচিত্র্যের প্রতি ঝোঁক ও ছন্দের প্রতি অত্যাসক্তি তাই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে প্রথম ও শেষ কথা। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে ছন্দ-সরস্বতীরই গুণগান করেছেন এবং বলেছেন, কৈশোর থেকেই তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তাতে কবিকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়েছে। এই অভিধা থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয়েছে যে, সত্যেন্দ্রনাথ যতটা কবিতার বহিরঙ্গের ওপর ঝোঁক দিয়েছেন, ততটা আন্তর-প্রেরণার ওপর দেন নি। বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের বহুল

প্রয়োগে ও নানা সংস্কৃত ও বিদেশি ছন্দের ঢঙে বাংলা কবিতা রচনায় তিনি ছন্দ সম্পর্কে নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন। শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের ধ্বনিসম্পদের ওপর সত্যেন্দ্রনাথের সহজাত অধিকার ছিল। ফলে পাল্কীর গান বা ইল্‌শেগুঁড়ির ধ্বনিসম্পদ সহজেই পাঠকশ্রুতিকে আকর্ষণ করে। ছন্দের প্রতি তাঁর আত্যন্তিক আসক্তি বালকের মত ; এখানে মূল্যজ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, বাংলা ভাষার বাক্‌পদ্ধতির নবপ্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধিসাধন সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান। "Rare word-jewels" তিনি যেভাবে নির্বাচন, সৃষ্টি ও প্রয়োগ করেছেন, তাতে বাংলা কাব্যবাণী সমৃদ্ধ হয়েছে। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, শব্দার্থের কারুকলা, ভাষার প্রসাধন, বাণীলাবণ্য —সত্যেন্দ্র-কবিতা সম্পর্কে এই চারটি বিশেষণেরই সার্থক প্রয়োগ সম্ভব। এর পরিচয়-স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি এই কবিতাগুলি : 'বারাণসী', 'শ্মশান-শয্যায় আচার্য হরিনাথ', 'চৌদ্দ-প্রদীপ', 'ওগো', 'মাটি', 'পাল্কীর গান', 'বর্ষা', 'দার্জিলিঙের চিঠি,' 'বজ্র-কামনা,' 'প্রাবৃটের গান', 'কালোর আলো' (কুহু ও কেকা), 'জষ্ঠী-মধু', 'ঘুম্‌তী নদী','পাতিল-প্রমাদ' (বিদায়-আরতি), 'চিত্র-শরৎ', 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর', 'তাজ', 'ইলশেগুঁড়ি', 'তাতারসির গান' (অভ্র-আবীর), 'পিয়ানোর গান', 'সবুজ পরী', 'জর্দাপরী', 'যুক্তবেণী', 'দূরের পাল্লা', 'ছন্দ-হিল্লোল'।

রঙ ও রূপের, ধ্বনি ও সুরের সন্ধানে সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ও শ্রুতির ক্লান্তি ছিল না, বর্ণভাণ্ডের সমস্ত রঙ উজাড় করে দিয়েও

তাঁর ক্ষান্তি নেই। তথাপি এই প্রশ্ন থেকে যায়—সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের স্থায়ী মূল্য কোথায়? এই প্রবন্ধের গোড়াতেই সত্যেন্দ্রনাথের মনোভূমির যে বিশ্লেষণ করেছি, তাতেই এর উত্তর নিহিত আছে। ঐতিহ্য-প্রীতিতে, সৃষ্টিকর্তার মঙ্গলকর্মের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধায়, পুরাণে-ইতিহাসে-শাস্ত্রে ধৃত ভারতচিত্তের নিরন্তর সন্ধানে সত্যেন্দ্রনাথের যে কবিপ্রবৃত্তি প্রকাশ লাভ করেছে, তা ক্লাসিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি বাস্তবকে সহজ বুদ্ধি ও সরল আবেগের মধ্যে গ্রহণ করে, নীতিজ্ঞান ও জীবনের উচ্চতর সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং হৃদয়বৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের জগতে বর্ণালিম্পনে আনন্দের উৎসব জাগিয়ে তোলে। সত্যেন্দ্রনাথ এই পথের পথিক। তাই তিনি জাতীয় ঐতিহ্যের অনুরাগী ছিলেন, আবার বিশ্বমানবতা ও যৌবনের পূজারী ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরাগী সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় যে বলিষ্ঠতা, দার্ঢ্য, বহির্জগৎ সম্পর্কে অতি-কৌতূহল এবং সর্বোপরি ছন্দের উল্লাস ও হর্ষ অজস্রধারায় প্রকাশ পেয়েছে, তা সত্যেন্দ্র-প্রতিভা ও কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

॥ ৩ ॥

বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যদিনে যে রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজ দেখা দিয়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের নেতা। দ্বিতীয় দশকে জনপ্রিয়তার শিখরে তিনি

পৌঁছেছিলেন। সেদিনের সকল মাঝারি কবি তাঁর প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যতদিন না মোহিতলাল, নজরুল এবং যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ ও অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল, ততদিন সত্যেন্দ্রনাথের লঘু কল্পনা ও ছন্দক্রীড়া অবাধে চলেছে। সত্যেন্দ্রনাথ মূলতঃ বিশ্বাসের কবি। প্রাচীন ঐতিহ্যময় ভারতের প্রতি তাঁর একান্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ আস্থা, আবার ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনায় তিনি উদ্‌গ্রীব। প্রথম-মহাযুদ্ধোত্তর যুগের সংশয় নৈরাশ্য তাঁর উপরে ছায়া ফেলতে পারে নি; সত্যেন্দ্রনাথ যে 'ছন্দোরাজ' হয়েই রইলেন, মহৎ কবি হতে পারলেন না, তার কারণ, রবীন্দ্র-পটভূমিতে তাঁর ও সহযাত্রীদের অসহায় পরাজয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক সেই পর্বে—'ভারতী'র যুগে—দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে সত্যেন্দ্রনাথই দাবি করতে পারেন। বোধ হয় এই কথা বললে সঙ্গত হবে, রবীন্দ্রনাথের তরল সস্তা সংস্করণ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ আর তা ঐতিহাসিক সত্য। রবীন্দ্রনাথে যা স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের কথা, সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তা 'আফিম ফুলে'র মৌতাত—দিবাস্বপ্ন। আর এখানেই ফ্যান্সির অনুকূল প্রকাশ: লঘু কল্পনার দায়িত্বহীন লীলাচাপল্য, শিশুসুলভ কৌতূহল ও উচ্ছলতার বার বার আবির্ভাব এবং শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের সুরে পিয়ানোর টুংটাং, পাল্কির হুম-হাম, দূর পাল্লার ছিপের দাঁড়ের ছপছপ, চরকার ঘরঘর, ভোমরার গুঞ্জন, ঝরনার ঝরঝর ধ্বনি। এই ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ এনেছেন

চিত্রসৌন্দর্য—বর্ণভাণ্ডের রঙ উজাড় করে দিয়ে ছবির পর ছবি এঁকেছেন। ফলে কাব্যের আন্তর সম্পদের ঘাটতি চাপা পড়েছে এই তন্দ্রাভরা শব্দঝঙ্কারে, মিষ্টি সুরে।

এর সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন শ্রীবুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে ('সাহিত্যচর্চা', পৃ, ১৪৩)। সত্যেন্দ্রনাথের 'তুলতুল টুকটুক। টুকটুক তুলতুল। কোন ফুল তার তুল। তার তুল কোন ফুল। টুকটুক রঙ্গন। কিংশুক ফুল্ল। নয় নয় নিশ্চয়। নয় তার তুল্য।' এর সঙ্গে তুলনা করুন, রবীন্দ্রনাথের 'ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধু মঞ্জরী। পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন। স্বর্ণের পাত্রে। ফাল্গুন রাত্রে। মুকুলিত মল্লিকা মাল্যের বন্ধন।' এ দুটি একই ছন্দে লেখা, গুরু বক্তব্য উভয়ত্রই অনুপস্থিত, দুই-ই খেলাচ্ছলে রচিত। অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি যে প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশী উঁচুদরের, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ স্পষ্ট, প্রথমটিতে কাব্যগুণের অভাব, দ্বিতীয়টিতে তার উপস্থিতি।

॥ ৪ ॥

একটা প্রশ্ন এখানে স্বতঃই উঠবে। সত্যেন্দ্রনাথ কি কেবল বহিরঙ্গের কবি? ছন্দোচাতুর্য ও চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য কি তাঁর সম্পর্কে শেষ কথা? পরবর্তীদের উপর তাঁর প্রভাব কি কলাবিধি ও বহিরঙ্গ-প্রসাধনে? অবশ্যই সত্যেন্দ্র-প্রভাব কলাবিধি ও ছন্দোবৈচিত্র্যরূপে পরবর্তীদের কবিতায়

দেখা গেছে। কিন্তু তা-ই শেষ কথা নয়। সত্যেন্দ্রনাথ কাল-সচেতন ও সমাজ-সচেতন কবি। সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘটনাবর্তকে তিনি উপেক্ষা করেন নি, তার প্রমাণ 'সেবা-সাম', 'বিদায়-আরতি', 'নির্জলা একাদশী', 'ইজ্জতের জন্য', 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর', 'জাতির পাঁতি', 'শূদ্র', 'মেথর' প্রভৃতি কবিতা। 'সাম্য-সাম' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছেন :

'কে আছে আজিকে অবনত মুখে পীড়িত অত্যাচারে ?
কেবা ক্ষুণ্ণ, কেবা বিষণ্ণ, অন্যায় কারাগারে ?
যুগ যুগ ধরি কি করেছ মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা ?
পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে দহিতে কারণ বিনা ?'

এরই প্রতিধ্বনি শুনি নজরুল ইসলামের দৃপ্ত কণ্ঠে :

'মহা মানবের মহা-বেদনার আজি মহা উত্থান,
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।'
('সাম্যবাদী', সর্বহারা)

মোহিতলালের 'কালাপাহাড়'-বন্দনা আসলে একই মনুষ্যত্ব-মুক্তিমন্ত্র :—

'ঘুচাইতে আসে মহাভয়হারী দেবারি-মানব যুগাবতার—
ঘুচাবে কায়ার ছায়া-শৃঙ্খল, চূর্ণ করিবে পাষাণ-ভার !
কালাপাহাড় !' ('কালাপাহাড়', বিস্মরণী)

মানবতার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের উদার আহ্বান :

'জাগ, জাগ, ওগো বিশ্বমানব ! বারতা এসেছে আজ !
তোমার বিশাল বপু হতে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ।...
মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তার ঘর।'

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কণ্ঠে তারই নির্ভুল প্রতিধ্বনি :

'শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য—দেবতা আছে কি নাই।'
('দুঃখবাদী', মরুশিখা)

আবার প্রকৃতি ধ্যানেও সেই সংশয়ের অগ্রদূত সত্যেন্দ্রনাথই। তার প্রমাণ 'চম্পা' কবিতাটি :

'আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে ;
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ-ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হল —সাহসিকা অপ্সরার মত।'

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় এরই প্রতিধ্বনি :

'জাগে জাগে জাগে ওই নৈদাঘ সূর্য,
বাজে বাজে বাজে তার রৌদ্রক তূর্য ;
বসন্ত অবসান,
কে রাখে ফুলের মান ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো— !
পাতা হতে মাথা তুলি ভাস্করে নমি কে
চাবে সে রুদ্রমুখে, চাবে নির্নিমেখে ?
কে পিয়ে অনলরাশি
হাসিবে তরল হাসি ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো— !'
('পারুলের আহ্বান', সায়ম্)

সৃষ্টির প্রতি, মঙ্গলের প্রতি, সুন্দরের প্রতি বিশ্বাসী সত্যেন্দ্রনাথই অবিশ্বাস ও রুদ্রের এই আহ্বান প্রথম শুনিয়েছিলেন।

মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যে তারই বিকাশ ও পরিণতি। তাই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা পরবর্তীদের পথকে সুগম করেছে, ছন্দোচাতুর্যে বিভ্রান্ত করে নি।

॥ ৫ ॥

এইবার সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের পরিচয় ও সেই সঙ্গে মূল সুরগুলির পরিচয় গ্রহণ করা যাক। পাণ্ডিত্য, যুক্তিশৃঙ্খলা ও শ্রমশীলতার পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বর্তমান। তার সঙ্গে অপ্রতিহত বেগে বয়ে গেছে ছন্দের ধারা। প্রথমেই ফ্যান্সি বা লঘু কল্পনা-বিলাসের পরিচয় দেওয়া যাক। এখানে সচেতন কারু-কুশলতা ও কলানৈপুণ্যই প্রাধান্য লাভ করেছে, 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা' এখানে অনুপস্থিত। 'গ্রীষ্মের সুর', 'যক্ষের নিবেদন', 'পদ্মার প্রতি', 'মেঘলোকে', 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি', 'পুরীর চিঠি', 'মুক্তবেণী' কবিতাগুলিতে এই লঘু কল্পনার উচ্ছ্বাস ও ক্রীড়াশীল ছন্দের উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। গভীর ভাব-কল্পনার অনুসন্ধানে আমরা এখানে ব্যর্থ হব, তাই ক্ষিপ্র চরণগুলির অনুসরণেই তৃপ্তি লাভ করতে হয়। একটি মাত্র উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :

'কতই কথা লিখছে সাগর, লিখছে বারো মাস,
উতলা ঢেউ লিখেছ সাগর-মথন-ইতিহাস ;

দেখছি আমি মুহুর্মুহু জাগছে দিকে দিকে
শাপের রাশি সাপের ফণা চিহ্নিত স্বস্তিকে ;
উঠছে সুধা ফুটছে গরল ; যাচ্ছে যেন চেনা
আঢ়ক-হাতে লক্ষ্মী !—সাথে লক্ষ্মী-কড়ি ফেনা !
ছন্দে ওঠে মন্দ ভালো ; চলছে অভিনয়—
দেবাসুরের দ্বন্দ্ব-লীলা দুরন্ত দুর্জয়।

ঝড়ের বেগে ঝাণ্ডা নিশান ওঠে এবং পড়ে,
নীল-জাঙিয়া নীল-আঙিয়া অসুবগুলো লড়ে !
হঠাৎ হল দৃশ্য বদল উল্‌টে গেল পট—
ঘাঘরা ঘোরায় কোন্ মোহিনী মাথায় সোনার ঘট !
তারে ঘিরে অপ্সরীরা তয়ফা নেচে যায়,
ফেনায় চারু চিকণ-কারু দুল্‌ছে পায় পায়।'

('পুরীর চিঠি', অভ্র-আবীর)

ফ্যান্সির চূড়ান্ত পরিচয় বিধৃত হয়েছে 'নীলপরী', 'সবুজ পরী', 'জর্দাপরী', 'লালপরী' কবিতানিচয়ে। এগুলি রূপসচেতন সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় বহন করে। 'নীলপরী'র এই ধ্বনিতারল্য ও বর্ণোৎসব এক রকম তন্দ্রালু নেশার সৃষ্টি করে, পাঠকচিত্ত তাতেই মুগ্ধ হয়ঃ

'ঢুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় ঢুলের তুমি ঢলবিথার,
তন্দ্রা তোমার সুর্মা-চোখের তন্দ্রা তোমার আলতা পা'র,
নীল গাভী নীল মেঘ দুহে নাও তার বিজুলী শিং ধরি,
নীল পরী গো নীল পরী।'

এখানে গভীর ভাবকল্পনার ধ্যানলোক নেই, আছে অগভীর বাসনালোকের স্পন্দন।

রূপচিত্রাঙ্কনবিলাসী সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় পাই শব্দ-চিত্রপ্রধান কবিতাগুলিতে। কত নিপুণভাবে তুলির হালকা টানে কোমল ও গাঢ় রঙের প্রলেপে রূপমূর্তি গড়ে তোলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ অনায়াস সাবলীলতায় তারই পরিচয় দিয়েছেন। 'দূরের পাল্লা', 'পাল্কীর গান', 'বর্ষা', 'দার্জিলিঙের চিঠি', 'চার্বাক ও মঞ্জুভাষা', 'চিত্র-শরৎ', 'আলোর পাথার', 'সিঞ্চলে সূর্যোদয়', 'রাত্রি বর্ণনা', 'লালপরী' প্রভৃতি কবিতা এর পরিচয়স্থল। শিশুর কৌতূহল ও বিস্ময়, নয়ন ও শ্রুতির সদাজাগ্রত উৎকণ্ঠিত পিপাসা, রঙ ও রেখার প্রতি তীব্র আকর্ষণ—এই সব গুণ এখানে ধরা পড়েছে। এখানে সত্যেন্দ্রনাথ কবি নন, চিত্রী; যাঁর হাতে আছে নিপুণ তুলি ও মনে আছে অকারণ আনন্দোল্লাস। 'চার্বাক ও মঞ্জুভাষা' কবিতায় শব্দচিত্রের নিপুণ উপস্থাপনে, ছন্দ-মন্থর গতিতে ও শব্দের অলস পদক্ষেপে তরুণী মঞ্জুভাষার শরম-জড়িত অলস মন্থর পদধ্বনিটি চিত্রিত হয়ে উঠেছে ঃ

'মঞ্জুভাষা রূপে বনদেবী
শিরে ধরি পাষাণ কলস,
আসে ধীরে আশ্রম বাহিরে
গতি ধীর, মন্থর, অলস।

পর্ণরাশি-মর্মর-মঞ্জীর
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি।
অযতনে কুন্তলে বল্কল
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী।'

('চার্বাক ও মঞ্জুভাষা', কুহু ও কেকা)

আর পাল্কীর দ্রুত গমনের রূপটি ফুটে উঠেছে পাল্কী-বেহারাদের দ্রুত পদক্ষেপে ঃ

পাল্কী চলে	ঢেউয়ের দোলে
পাল্কী চলে—	অঙ্গ দোলে!
দুল্‌কি চালে	শঙ্খ চিলের
নৃত্য তালে।	সঙ্গে, যেচে—
ছয় বেহারা	পাল্লা দিয়ে
জোয়ান তারা	মেঘ চলেছে!
গ্রাম ছাড়িয়ে	তাতারসির
আগ্‌ বাড়িয়ে	তপ্ত রসে
নাম্‌ল মাঠে	বাতাস সাঁতার
তামার টাটে!	দেয় হরষে!
তপ্ত তামা,—	গঙ্গা ফড়িং
যায় না থামা,—	লাফিয়ে চলে ;
উঠ্‌ছে আলে	বাঁধের দিকে
নাম্‌ছে গাড়ায়,	সূর্য ঢলে
পাল্কী দোলে	পাল্কী চলে রে!
ঢেউয়ের নাড়ায়!	অঙ্গ ঢলে রে!

পাল্কী-বেহারার দ্রুত গমন, ক্লান্তি ও শ্রমকাতরতা—সবই এখানে ধরা পড়েছে ছন্দের মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনে, লয়ের হ্রাসবৃদ্ধিতে।

আরেকটি উদাহরণ দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের রূপচিত্র-বিলাসের পরিচয় শেষ করছি ঃ

'হাওয়ার তালে বৃষ্টি ধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে ;
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে,
শাল-ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে।
তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা!
দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে।...
কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে!
মিশির জমি জমিয়ে ঠোঁটে শরৎরাণী পান-খেয়েছে!
মেশামেশি কান্না হাসি, মরম তাহার বুঝবে বা কে!
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসতে থাকে!'

('চিত্রশরৎ', অভ্র-আবীর)

রূপ-সম্ভোগোল্লাসে উত্তেজিত, কৌতূহলে সদাচঞ্চল, চিত্র ও ধ্বনির একান্ত অনুরাগী সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় প্রকৃতি ও ঋতু-বিষয়ক কবিতায় ফুটে উঠেছে। 'পদ্মার প্রতি' কবিতায় পদ্মার উদ্দাম রূপ, 'গ্রীষ্মের সুর' কবিতায় রৌদ্র-রঞ্জিত গ্রীষ্মের দীপ্ত রূপ, 'চম্পা' কবিতায় চম্পার সাহসিকা অপ্সরা-রূপ, 'আফিমের

ফুল' কবিতায় আফিম ফুলের নেশায় বিহ্বল রূপ, 'চিত্রশরৎ' কবিতায় শরতের নৃত্যচঞ্চল কিশোর-রূপ, 'বর্ষা' কবিতায় বর্ষার সুখাবিষ্ট রূপটি ধরা পড়েছে। রঙ-রেখায় চিত্রাঙ্কনের উল্লাসই এখানে বড় কথা। প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সুমহান গভীর ভাবকল্পনা এখানে নেই। প্রকৃতিধ্যানে কবির প্রবণতা ছিল না, রূপচিত্রণেই তাঁর আনন্দ। দুটি উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে :

নৃত্যপরী ঘুম্‌তী নদীর বর্ণনা :

'ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে, ঠুম্‌রী তালে ঢেউ তোলে !
বেল-চামেলীর চুমকি চুলে, ফুলের হাওয়ায় চোখ ঢোলে !
কুড়ুক পাখীর উলুর রবে ঘুম ভাঙে তার, দিন কাটে,
ঝীব্‌রি-দোয়েল-শালিক-শ্যামা-বুলবুলিদের কনসার্টে !
শণের ফুলে ছিটিয়ে সোনা শরৎ তারে সাজিয়ে যায়,
ভিণ্ডি-ফুলের কনক-জবা তার নিকষে যাচিয়ে যায়।
হেমন্ত ভেট ছায় তাহারে আনন্দে দুই হাত ভরি,
মুক্তো-ফাটা গাজর ফুলের চিকণ চারু ফুলকরী ?...
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলিস্ ঝুমকো-ফুলের বন দিয়ে,
ঢেউ-ঝিলিকে মাণিক জ্বেলে চাঁদের নয়ন নন্দিয়ে।'

('ঘুম্‌তী নদী', বিদায়-আরতি)

ইল্‌শে-গুঁড়ি বৃষ্টিধারার বর্ণনা :

ইল্‌শে-গুঁড়ি ! ইল্‌শে-গুঁড়ি !
ইলিশ মাছের ডিম।
ইল্‌শে-গুঁড়ি ! ইল্‌শে-গুঁড়ি !
দিনের বেলার হিম।

কেঁয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা-পাটি শিম।
ইল্‌শে-গুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি
রোদ্দুরে ঝিমঝিম।

('ইল্‌সে-গুঁড়ি', অভ্র-আবীর)

বহির্জগতের প্রতি উন্মুখ কবির শ্রুতি ও দৃষ্টির তৃপ্তিসাধনই এখানে মুখ্য।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় আরও দুটি সুরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এক, দেশানুরাগ; দুই, ইতিহাস-প্রীতি।

দেশানুরাগের সুরটি সত্যেন্দ্রনাথে প্রবলরূপে উপস্থিত। জাতীয়তার যে মন্ত্র স্বদেশী যুগে বহু বাঙালী কবিকে দেশমাতার বন্দনা রচনায় উদ্বোধিত করেছিল, সেই মন্ত্রই সত্যেন্দ্রনাথকে বঙ্গমাতার বন্দনা-গান রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। কবি বঙ্গমাতার যে ভাব-প্রতিমা নির্মাণ করেছেন, তা ভক্তহৃদয়ের অনুরাগে সিঞ্চিত। যে কবি শব্দচিত্রণে ও ধ্বনি-তারল্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন, তিনি এখানে নবানুরাগে বঙ্গমাতার প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির আবেগ এত তীব্র ও প্রবল যে তা পাঠকচিত্তকে মুহূর্তেই অভিভূত করে। 'বঙ্গজননী', 'আমরা', 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি', 'গান', 'কোন্ দেশে', 'বঙ্গজননী' প্রভৃতি কবিতা এর পরিচয়স্থল। স্নেহে প্রেমে,

বীর্যে গরিমায়, জ্ঞানে কীর্তিতে, তপে সাধনায় বঙ্গমাতার একটি লাবণ্যময়ী প্রতিমা কবি এঁকেছেন :

'মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।'

('আমরা')

ইতিহাস-প্রীতি ও ঐতিহ্যানুরাগ সত্যেন্দ্রনাথেব কবিতাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। অতীত ইতিহাসের রোমন্থন নয়, বর্তমানের পটভূমিতে তাকে জীবন্তরূপে উপস্থাপনাই কবির অভিপ্রেত। কবির পাণ্ডিত্য, বস্তুজ্ঞান ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় এখানে পাই। নিপুণ শব্দ-বিন্যাসে এবং চতুর ভাস্কর্য-কর্মে অতীত গৌরবপ্রতিমাকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। ইতিহাস-রসকে কী ভাবে চিত্রে ও ভাস্কর্যে, শব্দে ও কারুকলায়, কাব্যরসে পরিণত করতে হয়, সে কৌশল সত্যেন্দ্রনাথের আয়ত্ত ছিল। তবে বস্তু ও তথ্যের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক মাঝে মাঝেই এই শ্রেণীর কবিতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। 'মহাসরস্বতী' কবিতায় জ্ঞানের শুভ্র আলোর প্রতিমা-সরস্বতীকে

কবি বন্দনা করেছেন এবং অতীত গৌরবচ্যুত বর্তমান ভারতের পতনে গ্লানি ও বেদনায় সমাচ্ছন্ন হয়েছেন। সেই গ্লানি ও বেদনা থেকে কবি মুক্তি পেতে চেয়েছেন অতীত গৌরব-গাথার পুনরুজ্জীবনে। 'কবর-ই-নূরজাহান্', 'আমরা', 'বারাণসী', 'দিল্লী-নামা', 'সিংহল,' 'তাজ' প্রভৃতি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের এই ইতিহাস-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

দিল্লীশ্বরী নূরজাহানের কবর দেখে বাঙালী কবির মনে যে অনুভূতি জেগেছে, তা ইতিহাসনিষ্ঠ। নূরজাহানের উত্থান-পতনের বস্তুতালিকাতেই 'কবর-ই-নূরজাহান্' সমাপ্ত হয় নি। কবি শেষে বলেছেন ঃ

'সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান্।
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্ত প্রাণ।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুবছ কালের সঙ্কেতে।
ডুবছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুববে না,
রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠছে ফুটে সর্বদাই,
অনুরাগের চেরাগ যত উজল জ্বলে বিরাম নাই,
চিত্তলোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি,
মোগল-যুগের তিলোত্তমা! চিরযুগের সুন্দরী!'

নূরজাহানের কবরকে কেন্দ্র করে মোগল-রোমাঞ্চের রস শত বর্ণে রঞ্জিত হয়ে এখানে কাব্যরূপ লাভ করেছে। 'আমরা'

কবিতাটিতে কবি বাঙালীর ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন, তার সমস্ত অতীত ইতিহাসকে ছন্দে ধরেছেন। যে বাঙালী 'বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টীকা পরি,' সেই আমরা আবার লুপ্তগৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব, এই আশাই এখানে ধ্বনিত হয়েছে ঃ

> 'অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
> বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।'

তাজমহলের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন, তাতে তাজের 'কালের কপোলতলে এক বিন্দু নয়নের জল' এই রূপটি প্রাধান্য লাভ করে নি—মর্মর-স্বপ্ন, প্রেমের দ্বারা নির্মিত, চিরসুন্দর তাজের বহিঃরূপই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানেও বর্ণবিলাস লক্ষ্য করা যায়। তাজের দেহবর্ণনায় কবির সযত্ন প্রয়াস স্পষ্ট ঃ

> 'সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
> তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
> বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল,
> সুলেমানী মণি থরে থর,
> ইরাণী গোমেদ, মরকত থাল থাল
> পোখরাজ, বুঁদি, গুল্‌নর,
> চার-কো পাহাড়-ভাঙা মসী মর্মর,
> চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
> যশলমীরের শোভা মিশ্র-বদর
> এনেছ ঢুঁড়িয়া সব দিক,
> মধুমৎত্বিষ্‌ মণি ডুবিয়া পাথর
> দেইলে দেওয়ালী মণি-দশথ।'

আবার 'বারাণসী' কবিতায় কেবল বারাণসীর পুণ্য-গাথা নয়, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী নয়, তার সঙ্গে রোমান্স-রসও সঞ্চারিত হয়েছে। ইতিহাসের কঙ্কাল প্রাণে রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে, মুহূর্তের মধ্যেই বৌদ্ধ-যুগের এক গৌরব-গাথা তার সমস্ত রোমান্স ও মোহ নিয়ে বর্তমানের সামনে আবির্ভূত হয়েছে :

'এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিতমুখ।
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পঁইঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্বচনে প্রাণ-মন উথলায়।
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্মাশোকের মৈত্রীকরুণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হতে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,—
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত ভকতিরাশি!'

অতীত ইতিহাসের আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যরস খুঁজেছেন এবং বর্ণালিম্পনে তাকে সজীব করে তুলতে চেয়েছেন।

॥ ৬ ॥

রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-পর্বে সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। রবীন্দ্রানুসারী হয়েও তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। কোথায় সেই স্বাতন্ত্র্য ?—এই প্রশ্নের সমাধানেই সত্যেন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় নিহিত। সত্যেন্দ্র-প্রতিভা আসলে কিশোর-প্রতিভা। কৈশোরের সারল্য, বিস্ময়, উত্তেজনা সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিত্রে ও কবিচরিত্রে সমুপস্থিত। বাঙালী-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, হর্ষ, চাঞ্চল্য, উল্লাস, স্থৈর্যের অভাব, আবেগের প্রাবল্য, এই সবই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। এটাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। আর এই স্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে 'তাতারসির গান' কবিতাটিতে। সত্যেন্দ্র-প্রতিভার প্রতিনিধিরূপে আমরা এটিকে গ্রহণ করতে পারি :

'রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি।
রসের ভিয়ান্ হেথায় স্বরু,
মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী।'

এই বাঙালীত্ব ও শৈশবসারল্য, এই ছন্দোল্লাস ও বর্ণ-প্রীতি, এই ধ্বনিতারল্য ও শব্দমাধুর্য—সত্যেন্দ্রনাথের কবি-পরিচয় এখানেই নিহিত।

তৃতীয় অধ্যায়

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

রবীন্দ্র-কাব্য-পরিমণ্ডলে যাঁরা আসন পেতেছেন, তাঁদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-সন্ধানেই কবিদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য। তাই কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৫৫) স্বাতন্ত্র্য সন্ধান করলে একটি দিকের উপরই জোর দিতে হয়—তা হল তাঁর প্রকৃতি-প্রেম এবং সে প্রেমের অনবদ্য প্রকাশ। রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কবি করুণানিধানের কাব্য-জীবনের পটভূমি বাংলাদেশের গ্রাম-প্রকৃতি এবং ভারতের নানা তীর্থক্ষেত্রের অনবদ্য প্রকৃতিভূমি। এই পটভূমির সৌন্দর্য তাঁকে বারবার আকর্ষণ করেছে এবং এই সৌন্দর্য-সন্ধানে ও চিত্রণে তিনি কাব্যজীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। কৈশোরে পঞ্চকোটের পার্বতী-প্রকৃতি এবং যৌবনে বাংলাদেশের ও ভারতের নানা বর্ণসমৃদ্ধ প্রকৃতিকে দেখে নয়নের আশা মিটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর কাব্যজীবনে বহির্জগতের ঘটনা ছায়াপাত করে নি; সমকালের উত্তেজনা তাঁকে একেবারেই স্পর্শ করেনি; কোনো সংশয়ের দ্বারা তিনি পীড়িত হন নি; কোনো তত্ত্ব তাঁর কাব্যে আপতিত হয় নি। এইজন্য তাঁর কাব্যে একটি প্রীতিপ্রসন্ন প্রকৃতি-রূপমুগ্ধ

আস্তিক শান্তিকামী কবিমনের দেখা পাই, যে কবিমন কাব্যসাধনার শেষে জীবনের দীর্ঘ পথ উত্তরণের জন্য শান্ত প্রতীক্ষায় অবিচল ছিল; তাই তাঁর পক্ষে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বিদায় প্রার্থনা করা সম্ভবপর হয়েছিল এই বলে—

ছুটি দাও তবে হে বসুন্ধরা,
প্রণমে মন,
পিয়েছি তোমার বিদ্যুতে মধু-
নির্ঝর।
মৃত্যু হাসিয়া প্রসাদ বিতরে
কাঁপে থর থর বুকের ভিতরে,
বাই গো তরণী, কোন্ কূলে শেষ
উত্তরণ? (উত্তরণ)

শান্তিপুরের মাটিতে দীর্ঘ আটাত্তর বছরের জীবন-পরিক্রমা শেষ করে মর্তকায়ার বন্ধন ছিন্ন করে কবি চলে গেছেন। আর যাবার আগেই তার জন্য শান্ত মনে প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন:

আকাশ মোরে করে গো যাদু সাগর-কিনারায়
দিগন্তরে তরীর আলো জলছবিতে ভায়।
কে যেন বাঁশী বাজায় দূরে উতলা করে পূরবী সুরে
মেঘের কোলে পাহাড় দোলে ঝড়ের ইশারায়।
(তিয়াত্তর-জন্মদিন)

কি সেই পরমা প্রাপ্তি—যার বলে তিনি এত শান্ত, এত ধীর, এত সমাহিত হয়ে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করেছিলেন? কি সেই

ধ্যান যার গভীরে ডুবে তিনি বর্তমানের কোলাহল ও উত্তেজনাকে এড়িয়ে গেছেন? কি সেই প্রেম যার বলে তিনি সহজ সুরে সহজ কথা বলে মমতাভরা দৃষ্টিতে সংসার ও জীবনকে দেখে গেছেন?

এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, করুণানিধানের প্রকৃতি-প্রেম—যার ভিত্তিভূমি গভীর আস্তিক্যবোধ ও সুগভীর মমতা। তা ছিল বলেই তিনি এ কথা সহজেই বলতে পেরেছেন ঃ

জন্মমরণ রহস্যময়,
কিসের লাগি এ অভিনয়?—
সুর বাজানো জলে-ভরা
কাচের পেয়ালায়।
ওগো আকাশ, ওগো বাতাস,
তোমরা জানো কিছু আভাস,
নিজের সাথে লড়াই করে,
হার মানিল রে! ('পঞ্চাশ বছর পরে'—শতনরী)

তাই একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, করুণানিধান সুখী প্রকৃতি-প্রেমমুগ্ধ স্বপ্নবিহ্বল কবি। সে স্বপ্ন যৌবনের স্বপ্ন—যা জীবনকে ও প্রকৃতিকে, মৃত্যুকে ও সংসারকে এক সূত্রে বাঁধে। আর করুণানিধানের হাতে সে স্বপ্ন সার্থক রূপ লাভ করেছে।

॥ ২ ॥

করুণানিধানের কাব্যজীবন দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপৃত। তাঁর কাব্যগ্রন্থের তালিকা এই ঃ বঙ্গমঙ্গল (১৯০১), প্রসাদী

(১৯০৪), ঝরাফুল (১৯১১), শান্তিজল (১৯১৩), ধানদূর্বা (১৯২১), শতনরী (হেমচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত সংকলন : ১৯৩০, কালিদাস রায় সম্পাদিত সংকলন : ১৯৪৮), রবীন্দ্র-আরতি (১৯৩৭), গীতায়ন (১৯৪৯), গীতারঞ্জন (১৯৫১), ত্রয়ী (প্রথম তিনটি কাব্যের একত্র পরিশোধিত সংস্করণ, ১৯৫৪)। কালিদাস-কুমুদরঞ্জন-সাবিত্রীপ্রসন্ন-যতীন্দ্রমোহনের মতো করুণানিধান অজস্র লিখতে পারেন নি। কবিতা প্রচারে বা যশোলাভে তাঁর সমান অনাগ্রহ, কবিতা-প্রকাশেও ছিল অনীহা, ফলে তিনি জনবল্লভতা লাভ করতে পারেন নি। প্রকৃতিরূপমুগ্ধ উদাসীন নিরাসক্ত কবির এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে কবি সাময়িক ঘটনার উপর বা জনতার চাহিদা অনুসারে কবিতা লিখতে কখনো উৎসাহ বোধ করেন নি। তিনি আত্মমগ্ন রোমান্টিক স্বপ্নবিভোর রূপমুগ্ধ কবি।

এই রোমান্টিকতা তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র-কাব্য-কলাবিধি তিনি সযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন এবং তাঁর প্রকৃতি-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথেরই অনুবর্তী। 'রবীন্দ্র-আরতি' কাব্যে তার প্রমাণ রয়েছে। রবীন্দ্র-'কাব্য-প্রয়াস স্রোতে' কবি 'নিত্য অবগাহন' করে ধন্য হয়ে বলেছেন :

সরস্বতীর অমর তনয়, বারে বারে প্রণাম করি পায়,
চির-নূতন, চিত্ত-হরণ তোমার নিমন্ত্রণ ;—
তৃপ্তি দিবে এমন কিছু, নাই সেবকের পসরায়,
লও গুরুদেব দক্ষিণা লও শ্রদ্ধা-নিবেদন।

('রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে', শতনরী)

এই শ্রদ্ধাঞ্জলি মামুলি নয়, তা করুণানিধানের কাব্যজীবনের ভিত্তিভূমি।

কিন্তু তাই বলে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের অন্ধ অনুকারী নন, তাঁর স্বাতন্ত্র্য ছিল। সে স্বাতন্ত্র্য তাঁর প্রকৃতি-চিত্রণে, প্রেমকল্পনায়, অনবদ্য বর্ণনায়। এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় খুব অল্প কথায় মোহিতলাল 'কাব্যমঞ্জুষা'য় দিয়েছেন: "করুণানিধান সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। কবি বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভক্ত করুণানিধানের কবিতার ভাষায় লাবণ্য, শব্দচয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য এবং শব্দের সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণ ও রূপ চিত্রিত করিবার শক্তি—এই তিনটি গুণ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবের দিক দিয়া তিনি যেমন নিছক সৌন্দর্য-প্রীতির কবি, তেমনি ছন্দের অনুযায়ী ভাষা ও ভাবের অনুযায়ী শব্দ রচনাতেও তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং ভাষার ললিত-মধুর ও উদাত্ত-গম্ভীর—দুই সুরেরই সাধনা করিয়াছেন। তথাপি করুণানিধান বাংলা গীতিকাব্যে যে একটি নূতন ধরণের প্রকৃতি-প্রেম যুক্ত করিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার যৌক্তিকতা ও কবিত্বের প্রধান নিদর্শন।"

করুণানিধানের কাব্যের এই তিন প্রধান বৈশিষ্ট্যের—ভাষা, ছন্দ ও প্রকৃতি-প্রেমের—পরিচয় গ্রহণে তাঁর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। করুণানিধানের কাব্যজগতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-চিত্র পাই কবির সত্তর বৎসরের

সম্বর্ধনা উপলক্ষে রচিত মোহিতলালের 'সন্ধ্যারতি' কবিতাটিতে। অনুরাগী পাঠককে অনুরোধ করি সেই আশ্চর্য-সুন্দর কবিতাটি ('শতনরী' দ্রষ্টব্য) পড়ে নিতে। কবি মোহিতলাল সুহৃদ্ করুণানিধান-রচিত কাব্য-জগতের পরিচয় দিয়েছেন এই কথা বলে,

জমিছে সবুজ ঘাসে এখনো সে ব্যাকুল বকুল,
দামিনী তেমনি নাচে, মেঘে তাই বাজে পাখোয়াজ;
ভালে কোহিনূর-টিপ, ঝিলিমিলি রেশমী-দুকূল—
নামে সন্ধ্যা তালীবনে, পাখী করে কাঁকন-আওয়াজ!
রূপার ফলক তোলে চন্দ্রকর তালের বাকলে,
মুঠি ভরি' জোৎস্না ধরে কে তরুণী লতাকুঞ্জ-তলে!
প্রভাতে গিরির শিরে—দেখ, দেখ, কে গিয়েছে
ফেলি—

কি সুন্দর!—যেন সে ময়ূবকণ্ঠী কুয়াসার চেলী!
দীপ্ত প্রবালের শিখা—দিক্ প্রান্তে পলাশের বন!
ডালিম-ফুলের ডালি কে সাজায় সাঁজের আকাশে!
জাফ্রাণ-মেঘে সেই পলাতক চাঁদের চুম্বন;
নদী ধায়—জরীর ফিতায়-বোনা জলের ফণা সে!

বস্তুজগতের ও প্রকৃতির সমস্ত স্থূলতা ও রূঢ়তা বর্জন করে একটি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যস্বপ্ন নির্মাণ করেছেন করুণানিধান আর সে কাজে তিনি ব্যবহার করেছেন লাবণ্যময়ী ভাষা, এই ইংগিতটি এখানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

সৌন্দর্যসম্ভোগস্পৃহা করুণানিধানের কাব্যের প্রধান লক্ষণ এখন তার সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

(১)

সুদূর স্মৃতি জাগায় আজি ভাঁটের ফুলের গন্ধ মিঠে—
লাজুক মেয়ে উঠল নেয়ে চুলের গোছা ছড়িয়ে পিঠে।
নীলাম্বরীর তিমির টুটে' রঙটি তোমার উঠল ফুটে'—
কামিনী-বন ফুটিয়ে গেল সজল তোমার রূপের ছিটে!…
স্বপ্নময় তার কাহিনী—আজকে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে :—
নোনা আতার সোনার গায়ে রবির কিরণ পিছলে পড়ে ;
দূর্বা-শ্যামল নিম্বতল, দীপ্ত নভ নীলোজ্জ্বল,
ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙে গাঙের বুকে স্তরে স্তরে!

('দ্বিপ্রহরে', ঝরাফুল ও শতনরী

(২)

নাচিছে দামিনী, মেঘে পাখোয়াজ বাজে। (শতনরী)

(৩)

উড়ো পাখীর সুরের সুরায় সরল-তরুর আবছায়ে,
প্রবাল-বরণ বৈকালে আজ কোন্ পাষাণী গান গাহে ?
ফুল-পরাগের ঘোম্‌টা টানি'
লুটিয়ে চলে আঁচলখানি,
লাজুক মেয়ে সৌদামিনী আল্‌তা পরায় তার পায়ে।
রূপের তরী ভাসায় পরী গৌরী চাঁপার রঙ মেখে,
পদ্ম-গোলাপ নিন্দি পাখা পরিয়েছে তার অঙ্গে কে।

কোন্ মহুয়া-মদির সুরা
পান করে ওই ফুল-বধূরা !
পালিয়ে গেছে প্রাণ-বঁধুয়া বিম্বাধরে দাগ রেখে !

('তন্দ্রাপথে', শতনরী)

(৪)

ঝর্ণা-ধারা গাইছে গো তার নূপুর-পরা পা'র কাছে,
ভোরের পাখী উঠছে ডাকি'—ফুটছে আলো সজল-গাছে।
মৌরী-ফুলের মদালসে
ওড়না-খানি গেছে খসে'
তখনও তার 'পরে জরির চিকন জাল আছে।

('ঠুম্‌কারাণী', শতনরী)

(৫)

হের সখি সেই দিগন্ত তারা তেমনি জ্বলে—
ডালিম ফুলের রঙ্‌টি ফলানো মেঘের কোলে !

(শতনরী)

(৬)

যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে
হেথা-হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক,
মাধবী লতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি' ধরে চন্দ্রালোক !

(শতনরী)

(৭)

সাম্‌নে হেরি সুনীল বারি তালীবনের ফাঁকে,
গেরুয়া রঙ্ ভাঙা মাটি ঢালু পথের বাঁকে ;

ঝর্ণা-ঝালর পড়ছে ঝরি, শ্যামল-তরু পর্ণ 'পরি,
আলোক লতা অলক জালে কালো পাথর ঢাকে।
('ওয়ালটেয়ারে', শতনরী)

(৮)

দোল-দোলনে ঢিলা হয়ে সোহাগ-বেণী যাক খুলে,
ঢাকা দিয়ে রাখিস্‌নে মুখ, তাকা তোরা চোখ তুলে।
মনের কোণে রঙ্ ধরেছে,
আকাশ বাতাস বদলে গেছে,
মল্লী-চাঁপা যুঁই-বেলাতে দখিণ্ হাওয়া যায় বুলে'—
তাকা তোরা চোখ তুলে'।

চৈত্র-রাতি, আকুল রতি ফুল-শরে!
ঘর ছেড়ে চল্ তমাল বীথির পথ ধরে'।

কোন্ পুলিনে নীল সলিলে
খেলবি খেলা সবাই মিলে',
মন্ত্র নিবি বন্-বিহারীর মন্তরে—
সে যে বাঁশীর ভাষায় ডাক দিয়েছে নাম ধরে'।

(শতনরী)

এই ক'টি উদ্ধৃতি আশা করি যথেষ্ট সৌন্দর্য-সম্ভোগস্পৃহা-ব্যাকুল রূপোল্লাস-উন্মত্ত কবিমনের আনন্দ ও উল্লাস এই স্তবকগুলিতে ধরা পড়েছে। করুণানিধানের প্রকৃতিপ্রেম এবং রূপদক্ষতার পরিচয় এখানেই নিহিত আছে। এ কেবল প্রকৃতির ফটোগ্রাফি নয়, এ প্রকৃতি-প্রেমিক কবির প্রিয়া-রূপ বন্দনা। প্রকৃতি-রূপ-সম্ভোগে কবির যে আবেগ, তা বাস্তবের

যথাযথ বর্ণনায় নয়, স্বপ্নলোকের মায়াসৃজনে পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। অভিযোগ করা যেতে পারে, সত্যেন্দ্রীয় ধ্বনিকৌশল ও ছন্দোনৈপুণ্য এখানে রয়েছে। কিন্তু ছন্দপ্রয়োগে বা শব্দচয়নে নৈপুণ্যই এখানে শেষ কথা নয়। কবিমনের আবেগ ঐই বাণীবন্ধে রূপলাভ করেছে। এই সব কবিতার ভাষাসৌষ্ঠব আসলে ভাবগভীরতার বাণীলাবণ্য মাত্র। Middleton-Murray তাঁর 'Countries of the Mind' গ্রন্থে বোধ করি এই প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'It is love of this kind that gives true significance to the poetry of nature, for only by its alchemy can the thing seen become the symbol of the thing felt'। করুণানিধান এই প্রকৃতি-প্রেমের কবি। বাংলা কাব্যসংসারে এর জন্যই তিনি স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারেন। আপন হৃদয়রসে জারিত করে মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন, "বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর।" 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা' যে কবি-প্রতিভা, সে-ই পারে এই মায়ালোক, স্বপ্নলোক, রূপলোক সৃষ্টি করতে।

আর এই স্বপ্নই বারবার কবিকে বস্তুর ঊর্ধ্বে যে জগতের অধিষ্ঠান, সেখানে তাঁকে উত্তীর্ণ করে দেয়। সেখানে সহজ কথায় দোলায়িত শ্বাসাঘাত-প্রধান ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কৌশলে নিপুণ বর্ণালিম্পনে সেই নবতর সৌন্দর্যলোকে কবি পাঠককুলকে

উত্তীর্ণ করে দেন। ‘স্বপ্নলোকে’ কবিতাটি তার সার্থক পরিচয়; বোধ করি করুণানিধানের শ্রেষ্ঠ কবিতানিচয়ের একটি। তা সম্পূর্ণ উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ঃ

হেথায় তা'রা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যোৎস্না ঘাটে,
গিরি-দরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন-ঝালর
ধূসর পাষাণ-সীঁথির তটে—
অফুট ভাষে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে ওঠে।
তা'দের চুলের ফুলের বাসে
গন্ধ হারায় গোলাপ-বেলা।
কে অপ্সরী সারঙ বাজায়,
কি অপরূপ সুরের খেলা!
নিদাঘ-রাতে রাখাল-ছেলে
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে
স্বপ্নে শোনে নূপুর তা'দের
গুঞ্জরিছে গিরির কোলে;
তন্দ্রা ভেঙে দেখি তা'দের—
দূর আকাশে মিলিয়ে যায়,
পাখায় ঝরে সোনার রেণু
জ্যো'স্না-মাখা মেঘের পায়।

(ঝরাফুল ও শতনরী)

করুণানিধান সেই স্বপ্নলোকের কবি। কালিদাস রায়ের কথায় বলতে পারি "আধিজীবনের কবি তিনি নহেন, অধিজীবনের কবি তিনি।" ('শতনরী'র ভূমিকা)।

॥ ৩ ॥

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, করুণানিধান কি কেবল এই মায়াঘেরা স্বপ্নময় প্রকৃতিরূপলোকের কবি? না, করুণানিধান কেবল বহিঃপ্রকৃতির কবি নন, তিনি অন্তঃপ্রকৃতিরও কবি। বাঙালী জীবনের সুখদুঃখ, আশা বেদনা, আনন্দ বিষাদেরও কবি। গ্রামবালিকা মৃণুর যে আলেখ্য কবি এঁকেছেন, তাতে এই সংসারানুরাগ ও মর্তপ্রীতির সুন্দর পরিচয় পাই।

'মৃণু'র কবির যে অনুরাগ, তা মানবজীবনেরই প্রতি অনুরাগ। কবি যে গভীর স্নেহে মৃণুকে চুম্বন করেছেন তাতে এই প্রীতি বিধৃত হয়েছে:

ময়ূরকণ্ঠী চেলীর মতন কুয়াশা গিরির শিরে,
সহসা উঠিয়া বাতায়ন-দ্বার খুলিয়া দিলাম ধীরে—
হেরিনু মৃণুর বাহুটি বেড়িয়া ঘুমায়ে পড়েছে কেশ,
চুম্বন দিনু কপালে তাহার ভুলিনু লজ্জা লেশ।
কি-এক আবেশে মুগ্ধ জীবনে হেরিনু ক্লান্ত মুখ,
করপুটখানি ভরিয়া দিলাম বনফুল-যৌতুক।

(ঝরাফুল ও শতনরী)

'ঝরাফুল' কাব্যের বালিকা 'শেফালী', দুষ্টু মেয়ে 'রেণু', কবির 'বাসনা', 'সরযূর মৃত্যু', 'প্রসাদী'র 'পত্রপাঠ', 'শতনরী'র

'বাংলাদেশের মেয়ে' প্রভৃতি কবিতায় এই সংসারানুরাগের স্নিত প্রকাশ ঘটেছে। যে কবি স্বপ্নলোকের দেহলি নির্মাণ করেছেন, তিনিই বঙ্গভূমির স্নেহের দেউলে ঠাঁই পেতেছেন। 'বঙ্গমঙ্গল' কাব্যের দেশপ্রেমমূলক কবিতা ও গানে এই কবিরই দেখা পাই।

কবি করুণানিধান ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমেরও কবি, এই পরিচয়টি অদ্যাবধি অনালোচিত রয়েছে। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজে যাঁরা ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা লিখেছেন, তাঁরা হলেন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, রাধারাণী দেবী, পরিমলকুমার ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং করুণানিধান। করুণানিধানের প্রেমকবিতায় যৌবনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। এককালে করুণানিধানের প্রেমকবিতা যুবকণ্ঠে উচ্চারিত হত। আজ তা অনাদৃত। অথচ সে পরিচয় না নিলে করুণানিধানের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না বলে আমার ধারণা। 'শতনরী' সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে 'প্রেমালোকে' অধ্যায়ের কবিতাগুচ্ছ এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। প্রেমের সব-ভোলানো প্রহরগুলির কথা এই শ্রেণীর কবিতায় আছে, আবার উদাস বিধুর বিরহলগ্নের কথাও আছে; দুই-ই ব্যক্তিপ্রেমের আবেগতপ্ত। একদিকে যৌবনের বিহ্বল দিনের কথা—

> ফুল দিয়ে সে ভুলিয়ে দিল চুল-বাঁধা
> সেদিন ছিল ফাল্গুনী বৈকাল
> মন 'স্বরদে' ভালবাসার সুর-সাধা
> টুটল আধেক লাজের অন্তরাল।

রঙ্গমহল খুল্‌ল অকস্মাৎ
ঘোম্‌টা দিতে ভুল্‌ল দুটি হাত
দখিনহাওয়ায় বুকের মাঝে জাগ্‌ল বসন্ত,
চিনিয়ে দিল পাগ্‌লা ফাগুন অচেনা পন্থ।

('বাসন্তী', শতনরী)

অপরদিকে চিরবিরহের তীব্র বেদনার গীতধ্বনি—

মরণের ছায়া-'চিকের' ওপারে লুটাইছে তব নীলাম্বরী,
হাত বাড়াইয়ে পাইনে নাগাল, পরশের আগে যাওগো সরি'।
কথা ছিল এই, আগে যাবে যে-ই, করিয়ে পাঠাবে নিমন্ত্রণ,
গেছ দূর ঠাঁই, খবর না পাই, একা-একা ওগো আছ কেমন ?

('উদ্দেশ' শতনরী)

করুণানিধান কিছু কাহিনীমূলক দীর্ঘ কবিতাও লিখেছেন, যেমন 'চণ্ডীদাস', 'জয়দেব', 'বাদ্‌শাজাদী', 'অরফিউস্‌ ও ইউরিপিডিস্‌' (শতনরী ' কিন্তু তা সার্থকতা লাভ করেনি এই-জন্য যে, তা' ছিল করুণানিধানের কবি-প্রকৃতির স্বভাব-বিরোধী। কাহিনী-বিন্যাস, গ্রন্থন ও সংযোজনের যে ক্ষমতা সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলালের ছিল, তা করুণানিধানের ছিল না।

॥ ৪ ॥

কবি করুণানিধানের কাব্যজগতে স্বপ্নের ছড়াছড়ি। এ যেন 'এল্‌ ডোরাডো'র জগৎ, যার পথে পথে মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে। সে কাব্যপথে গেলে পাঠকের পরিশ্রম পুরস্কৃত হবে বলেই আমার ধারণা। করুণানিধান যে কাব্যজগৎ

গড়ে তুলেছেন, তার অধিষ্ঠাত্রী কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনাও করে গেছেন। সে পরিচয় দিয়েই এই আলোচনার ছেদ টানি। 'সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি' কবিতাটিতে করুণানিধানের কবি-প্রেরণার সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে। মোহিতলালের কথায় বল্‌তে পারি, "উর্ধ্বে সন্ধ্যা-রঙ্গীন নভস্তল, ও নিম্নে ধরণীর কানন-শোভা—ইহাকে আশ্রয় করিয়া সন্ধ্যা তাহার 'রঙের ইন্দ্রজালে' কবির নয়ন ভরিয়া দিয়াছে। করুণানিধানের প্রকৃতি-প্রেম ও রূপ-রসাবেশের মধ্যে যে সরল প্রীতিপিপাসু কবিপ্রাণের আকুতি আছে, এই কবিতায় নির্মল গীতিস্রোতে তাহাই উৎসারিত হইয়াছে।" (সাহিত্য-বিতান)

করুণানিধান এই কবিতায় কাব্যলক্ষ্মীকে অসীম অনুরাগে আহ্বান করেছেন এই বলে,

তোমার আলো সব ভুলালো লো অমরী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি চুলের তারার মালা ;
পাখীর গানে কাঁকন তোমার বাজে কানন ছেয়ে,
শিউরে ফোটে শিউলি-কলি তোমর সোহাগ পেয়ে।
অলক-ঢাকা কোমল পলক, নয়ন গরবী—
কাঙাল বায়ু যাচে তোমার চুলের সুরভি।
কোহিনূরের টিপটি ভালে, কাণে রতন দুল,
বরণ-কালের তরুণ বধূ রে দুলালী ফুল!
এস নেমে আমার ঘরে, তালী-বনের তলে।
এস মানস-নন্দিনী মোর, এস আমার কোলে।

(ঝরাফুল ও শতনরী)

করুণানিধান এই কাব্যলক্ষ্মীর রূপমুগ্ধ পূজারী। এঁর রূপধ্যানেই তাঁর কাব্যসাধনা সার্থকতা লাভ করেছে। অধীর রূপ-সৃষ্টির আগ্রহে সদাচঞ্চল কবি আমাদের প্রকৃতির সেই রূপলোকে নিয়ে গেছেন, সেখানে 'নাচিছে দামিনী, মেঘে পাখোয়াজ বাজে'। সেই মেঘলোক থেকে আজ বাংলা কাব্যসংসার অনেক দূরে চলে গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

॥ ১ ॥

রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের অন্যতম কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৭-১৯৪৮) বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। ভারতী পত্রিকার সাহিত্য-মজলিসে যতীন্দ্রমোহন অন্যতম প্রধান ছিলেন। ভারতী, প্রবাসী, মানসী প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে কলকাতায় যে তরুণ সাহিত্যিক-গোষ্ঠী দেখা দেন, তাঁরা ছিলেন রবীন্দ্র-ভক্ত। সেই সময় রবীন্দ্র-বিরোধীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তাঁদের সঙ্গে নিয়ত লড়াই করে রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরার কর্তব্য এঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন এঁদের অন্যতম। বন্ধু কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্নীতির অভিযোগে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন, তখন যতীন্দ্রমোহন মানসী পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর বন্ধুকে পাল্টা আক্রমণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাছাড়া নিজগৃহে তিনি একটি অনামা রবীন্দ্র-চক্র গড়ে তুলেছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর-পূর্তি উপলক্ষে টাউন হলে যে প্রকাশ্য অভিনন্দন জানানো হয়, তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। এই কাজে

তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। যতীন্দ্রমোহনের জীবনের এই ঘটনাগুলি তাঁর সাহিত্যকৃতির সঙ্গে জড়িত। বস্তুত এগুলি থেকেই যতীন্দ্র-কাব্যের পরিচয়টি পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-প্রভাবকে সানুরাগে বরণ করে নিয়েই যতীন্দ্রমোহন কাব্যসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে অধিনায়ক রূপে মেনে নেওয়াতেই সাহিত্যসাধনার সার্থকতা, একথা যতীন্দ্রমোহন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। রবি-প্রশস্তিমূলক কবিতায় তার প্রমাণ পাই ঃ

বসেছিলাম পায়ের কাছে, ভেবেছিলাম মনে,
একটা-কিছু চেয়ে নেব সেবায় আরাধনে !
আর সবারই পূজার শেষে
বলেছিলে ঈষৎ হেসে,
কবি, তুমি বলো, তোমার কিসের নিবেদন,
বলেছিলাম, পাই যেন এই সঙ্গ সারাক্ষণ।

তারপর যতীন্দ্রমোহনের ব্যাকুল প্রার্থনা,

মুখের কথা নাই বা হলো, বুকের মাঝেই থেকো,
দিন ফুরাবার আগেই আমার এই কথাটি রেখো।
চোখের পথে মনের মাঝে,
তোমার যে সুর-সারং বাজে,
সেই সুরেরই আবেশ যেন না ছাড়ে এক তিল,
চোখের পাতায় মনের খাতায় হারায় নাক মিল।

('রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য')

এখানেই যতীন্দ্রমোহন কাব্যসাধনার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন।

যতীন্দ্রমোহনের কাব্যগ্রন্থ নয়টি : লেখা (১৯০৬), রেখা (১৯১০), নাগকেশর (১৯১৭), বন্ধুর দান (১৯১৮), অপরাজিতা (   ), জাগরণী (১৯২২), নীহারিকা (১৯২৭), মহাভারতী (১৯৩৬), পাঞ্চজন্য (১৯৪১)। এছাড়া 'কাব্যমালঞ্চ' নামে আরও একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, সম্প্রতি তার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৫৭) প্রকাশিত হয়েছে। যতীন্দ্রমোহনের প্রথম কাব্য 'লেখা' রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত এবং রবীন্দ্রনাথ এর কবিতাগুলি দেখে দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন মানসী, যমুনা ও পূর্বাচল পত্রিকার সম্পাদকতাও করেছিলেন। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে চল্লিশ বৎসর ধরে তিনি বাংলা কাব্যের সেবা করে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, জগদিন্দ্রনাথ রায়, প্রভাতকুমার, করুণানিধান, যতীন্দ্রনাথ, কালিদাস, চিত্তরঞ্জন, চারুচন্দ্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সাবিত্রীপ্রসন্ন, হেমেন্দ্রকুমার, খগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

॥ ২ ॥

যতীন্দ্রমোহনকে রবীন্দ্রানুসারী কবি বলে অভিহিত করা যায়। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। পরন্তু, যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে যে অন্তরঙ্গ সহৃদয়

সুরটি অভ্রান্তরূপে ধ্বনিত হয়েছে, তা তাঁর একান্ত নিজস্ব। তাঁর কাব্যে ভাবেরই প্রাধান্য। তিনি দেশ-কাল-পরিবেশকে কোথাও উত্তীর্ণ হয়ে যান নি। এই বাংলা দেশ, শ্যামল স্নিগ্ধ পল্লী মা, বাংলার নিসর্গ, পুরাণ-প্রোক্ত-কাহিনী-সমুজ্জ্বল মহাভারত তাঁকে বারবার প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগের সংশয় ও অনিশ্চয়তা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। তিনি ঐতিহ্য-অনুরাগী কবি ছিলেন। ঐতিহ্যকে অস্বীকাব করার কোনো প্রয়াস তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। 'ভারতী' 'সাহিত্য' থেকে সুরু করে 'পূর্বাচল' পত্রিকা পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যে কবিতার ফসল ফলিয়েছেন, তাতে ভুল বা অনুতাপের, বেদনা বা সংশয়ের সুর কখনোই প্রাধান্য লাভ করে নি। অপরপক্ষে একটি ভাবমুগ্ধ রূপমুগ্ধ বাঙালি কবিপ্রাণের পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে।

যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে ভাবমুগ্ধতার সঙ্গে মিলেছে রূপচিত্রণে অনায়াস দক্ষতা। এ দুয়ের রমণীয় পরিণয় ঘটাতে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের শ্যামল স্নিগ্ধ রূপটিই সেখানে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু মহনীয় বা সাময়িক নয়। অতি-সাধারণ গ্রামজীবনের সাধারণ সুখদুঃখই তাঁর আন্তরিক সহৃদয়তা-গুণে অসাধারণের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এখানেই যতীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় নিহিত বলে আমার ধারণা। যে বাস্তবপ্রীতি তাঁর কাব্যে প্রবল, তা সংশয়ে ক্লিষ্ট বা অবিশ্বাসে পীড়িত নয়। গ্রামবাংলার দুঃখ

তাঁর প্রীতিপ্রসন্ন কবিচিত্তের মাধুর্যকে নষ্ট করতে পারে নি। বরং এই দুঃখ তাঁর কাছে রসমূর্তি লাভ করেছে। আর এই সহৃদয়তার সঙ্গে এসে মিলেছে কবি-কল্পনার সৌকুমার্য এবং রূপকর্মে ত্রুটিহীন দক্ষতা। রবীন্দ্র-প্রভাবের ফল স্বরূপ এই দুটি গুণ যতীন্দ্রমোহনের কবিতাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। যতীন্দ্রমোহনের উপজীব্য সাধারণ গ্রামজীবন বা ছোট সুখদুঃখ, তা পরিশুদ্ধ হয়েছে সহৃদয়তায়। কিন্তু তাকে উপেক্ষার অভিশাপ থেকে রক্ষা করেছে এই কল্পনার সৌকুমার্য এবং রূপকর্মের ত্রুটিহীন দক্ষতা। যতীন্দ্রমোহনের কবিতা পাঠে বারবারই মনে হয়, 'Poetry is the fine excess', এটি তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। অথচ দেশ-কাল-পরিবেশের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আন্তরিক গভীর ছিল বলেই তা অবাস্তব হতে পারে নি। আর আঙ্গিক ও শিল্পকর্মে তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। যতীন্দ্রমোহনের পাঠক মাত্রেই তার পরিচয় পেয়েছেন। অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই যোগ্য শিষ্য তাঁর আস্তিক্যবোধ, পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ এবং সহৃদয়তা-গুণ লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যে অভিষিক্তচিত্ত যতীন্দ্রমোহনের কাব্যসাধনা তাই রবীন্দ্র-পূজা বলেই স্বীকৃতি পাবে।

॥ ৩ ॥

প্রথমেই অতি-সাধারণ বাঙালি জীবনের ঘরোয়া সুখদুঃখ চিত্রণে যতীন্দ্রমোহনের দক্ষতার পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

'নাগকেশর' কাব্যের 'অন্ধ বধূ' কবিতাটির 'কথাই এখানে স্বতঃই মনে পড়ে। বাঙালি ঘরের বঞ্চিতা বধূর অসহ্য হৃদয়-বেদনার কী নিপুণ প্রকাশ ঃ

পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি !
আস্তে একটু চল্ না, ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এযে ঝরা-বকুল !—নয় ?
তাইত বলি, বসে' দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে—
আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয় !
জষ্টি আসতে ক'দিন দেরী ভাই,—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায় ?

—টানিস কেন ? কিসের তাড়াতাড়ি ?
সেই ত ফিরে যাব আবার বাড়ি,
একলা-থাকা সেই ত গৃহকোণ—
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে—
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে—
দরদ-ভরা দুখের আলাপন ;
পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মত'
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত !

স্বামিবঞ্চিতা অন্ধ গ্রামবধূর মর্মবেদনা এর চেয়ে করুণ, কোমল রূপে প্রকাশ করা যায় বলে আমার জানা নেই। এর পিছনে ক্রিয়াশীল কবির গভীর সহানুভূতি।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে ‘বাঁশীওয়ালা’ কবিতাটি :

ওগো বাঁশী-ও’লা, এই বাড়ি এস—আধেক-জানালা-ফাঁকে,
কোমল-মধুর কণ্ঠে ষোড়শী ডাকিল ফেরিও’লাকে ;
অঙ্কে তাহার ফুটফুটে মেয়ে—তারি পানে বাহু মেলি’—
তৃতীয়ার শশী আসিবে যেন সে আকাশের কোল ফেলি।

আরো মনে পড়ে ‘সত্যদাস’, ‘গঙ্গাস্নান’, ‘ঘুমহারা’, ‘কাজলা-দিদি’, ‘মালোর মেয়ে’, ‘চাষার মেয়ে’, ‘জেলের ছেলে’, ‘আইবুড়ো কালো মেয়ে’ প্রভৃতি বাঙালি গৃহজীবনের আলেখ্যগুলি। যে সহৃদয়তা অন্ধ গ্রামবধূর বেদনাকে ছন্দে ধরেছে, তা-ই ব্যাকুল শিশুচিত্তের বেদনাকে প্রকাশ করেছে। ‘কাজলা-দিদি’ কবিতায় তার সুমিত প্রকাশ :

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্‌লা-দিদি কই ?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে খোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই ;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা-দিদি কই ?

এই সহৃদয়তা থেকে কেউ বঞ্চিত হয় নি ; ‘চাষার মেয়ে’, ‘জেলের ছেলে’, ‘আইবুড়ো কালো মেয়ে’, ‘মালোর মেয়ে’—গ্রামের সবাই এই স্নেহধারায় অভিষিক্ত হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন গ্রামজীবনের বৈতালিক ছিলেন, তার পরিচয় এই শ্রেণীর কবিতায় রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাণের অন্তরঙ্গ সুরটি ধরার প্রয়াস তিনি করেছিলেন এবং তাতে সার্থকতা লাভ করেছিলেন। ‘বঙ্গবধূ’ কবিতায় দেখি আন্তরিকতা-মাখানো প্রশস্তি :

অন্তঃপুর কোণে—
কি যে বন্ধনে বাঁধিয়া রেখেছ গুরুজনে পরিজনে।
সিক্ত ফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে—
স্নেহের উৎস সবারে সমান ছুটে—
বাণীহীন সারা ক্ষণে।

কবিচিত্তের মমতা ও আন্তরিকতা এখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

॥ ৪ ॥

এই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা কেবল গ্রামজীবন-চিত্রণে নয়, নিসর্গ-চিত্রণেও লক্ষ্য করা যায়। বাংলার পল্লীশ্রী যতীন্দ্রমোহনের হাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তিনি যে বর্ণালিম্পন ব্যবহার করেছেন, তা কোমল অনুজ্জ্বল, তা একটি মুগ্ধ কবিচিত্তের বহিঃপ্রকাশ।

গ্রামবাংলার নিসর্গ-সৌন্দর্যকে যতীন্দ্রমোহন গভীর অনুরাগের সঙ্গে কবিতায় ধরে দিয়েছেন। ‘ঐ যে গাঁ-টি’ কবিতায় একটি মুগ্ধ চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে ঃ

ঐ যে গাঁ-টি যাচ্ছে দেখা ‘আইরি’-ক্ষেতের আড়ে—
প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কেয়াঝাড়ে,
পূবের দিকে আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জট্‌লা করে যাহার তলে রাখাল-বালকেরা—
ঐটি আমার গ্রাম—আমার স্বর্গপুরী,
ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি !...

শোভা বল', স্বাস্থ্য বল',—আছে বা না আছে,
বুকটি তবু নেচে ওঠে এলে গাঁয়ের কাছে ;
ঐ খানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ—
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, ভায়ের হাসিমুখ ;—
তাইত আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
সেথায় আমার হৃদয়খানি গেছে চুরি।

'খেয়া ডিঙি'র পারাপার শিশুর সারল্য ও মমতা-মাখানো দৃষ্টিতে কবি দেখেন :

হঠাৎ—সেদিন বানের জলে ছাপিয়ে ওঠে মাঠ,
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি, গলা-নাগাল পাট,
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টল্‌মলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে।...
জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূয্যি উঠে পূবে,
দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে ;
বারো মাসে একটি দিনও ছুটি-কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।

বাংলার গ্রাম-নিসর্গ-চিত্রণে যতীন্দ্রমোহনের এই নিপুণতার পরিচয় তাঁর কাব্যে অবিরল। পল্লীবধূর পথ-পরিক্রমার সুন্দর বর্ণনা :

ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি-ঝুমুর ঝুমুর-ঝিঁঝি স্বরে দূরে নূপুর বাজে
খর্জুরে ঘেরা দীর্ঘিকাতীরে বল্লরী বেড়া বনের মাঝে।

এখানে শব্দচিত্রের মাধ্যমে কবি পরিবেশটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

'চন্দন দীঘি'র বর্ণনায় অনায়াস দক্ষতার প্রমাণ পাই :

সন্ধ্যার ছায়া ধীরে নেমে আসে—
কালো হয়ে আসে জল,
তালীতরু বেয়ে উঠিছে আলোক
ধীরে ছাড়ি' ধরাতল,
চিক্কণ-ঘন নারিকেল-শিরে
স্বর্ণমুকুট পরাইয়া ধীরে
দিবা অবসান—রবি চলে ফিরে'
লভিতে অস্তাচল।
চকিতে ধরণী টানি' দিল শিরে
গোধূলি-রঙিন বাস,
হালকা হাওয়ায় উঠিল ভাসিয়া
প্রদোষের রসাভাস ;
পঞ্চম স্বরে পাগল পাপিয়া
আকাশটি যেন ফেলিবে ছাপিয়া !

তুলির দ্রুত টানে কী অনায়াস দক্ষতায় কবি চন্দন-দীঘিতে সন্ধ্যার চিত্রটি এঁকেছেন !

সহযোগী কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতি-চিত্রণে যে কৌশলের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, তা যতীন্দ্রমোহনের কবিতাতেও বর্তমান। দুটি কবিতা প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করছি : 'নেবুফুল' ও 'ঝরণাঝারা'। 'নেবুফুল' কবিতায় সত্যেন্দ্রীয় দ্রুতলয়ের ছড়ার ছন্দে পিয়ানো-সুরের প্রতিধ্বনি :

ছোট্ট নেবুর ফুলটি আমার, ছোট্ট নেবুর ফুল—
স্বর্ণ-উষার কর্ণভূষার বর্ণ তুষার-দুল !

চন্দ্রধবল সরস কান্তি
চন্দনজল পরশ শান্তি,
মন্দমারুত বন্দনারত গন্ধ তব অতুল !

'ঝরণাঝারা'য় অনুকার অব্যয় যোগে চিত্ররচনা ঃ

ঝর্ঝর্ ঝরণা গিরি ঘর করনা—
জ্বল জ্বল উজ্জ্বল যেন কালো কজ্জল,
কভু সাদা ধব্ ধব্ তুষারের উদ্ভব,
উঁচু হতে নীচুতে না টলিয়া কিছুতে,
তুহিনের নির্ঝর দিনরাত ঝর্ঝর
ঝর্ ঝর্ ঝরছে ধারা নাহি ঝরছে !

প্রকৃতি-চিত্রণে যতীন্দ্রমোহনের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে পরবর্তী কাব্যগুলিতে। 'সরোবরে সন্ধ্যা', 'প্রান্তর-পথে', 'জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী', 'অন্ধকারে', 'পদ্মাতীরে' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতায় এর পরিচয় পাই। যতীন্দ্রমোহন যেখানে প্রকৃতির গম্ভীর ধ্যাননিমগ্ন রূপটি এঁকেছেন, সেখানে তিনি বিরল সাফল্য লাভ করেছেন। 'পদ্মাতীরে' ও 'সরোবরে সন্ধ্যা' কবিতা দুটি বাংলা প্রকৃতি-কবিতা ধারায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। শেষোক্ত কবিতাটি পাঠে মনে হয় কবি গম্ভীর কণ্ঠে সন্ধ্যাপ্রকৃতির বন্দনা-স্তোত্র উচ্চারণ করেছেন। উপমা-প্রয়োগে অসাধারণ দক্ষতা ও বিশেষণ-প্রয়োগে শিল্পকুশলতা এখানে লক্ষণীয় ঃ

নিভৃত কুলায়ে দিল মরালের দল শেষ-পাখাঝাড়া,
নিঃসঙ্গ মরাল-শিশু চীৎকারিছে দূরে হয়ে দলছাড়া ;

ধূসর আকাশপটে তরঙ্গিয়া দিয়া জ্র-বঙ্কিম রেখা—
অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাদুড়ের শ্রেণী ঊর্ধ্বে দিল দেখা।
সিক্ত শৈবালের গন্ধে পূর্ণ হয়ে ওঠে সন্ধ্যার বাতাস ;
হিমাচ্ছন্ন শস্যক্ষেত্র তারি সাথে ফেলে দিনান্ত নিঃশ্বাস।
জলে স্থলে নভস্তলে মোহিনী সন্ধ্যার নির্বাক মন্তরে—
অশরীরী কল্পযন্ত্রে শান্তিরসধারা ঝর ঝর ঝরে।

এই কবিতা পাঠের পর যতীন্দ্রমোহনকে সার্থক প্রকৃতি-কবিতা-রচয়িতা বলে মেনে নিতে আমার দ্বিধা নেই।

॥ ৫ ॥

যতীন্দ্রমোহন কেবল ঘরোয়া সুখদুঃখের কবি বা নিসর্গ-চিত্রী ছিলেন না, তিনি প্রেমের কবিতাও লিখেছেন। তাঁর প্রেমকবিতানিচয়ে যেমন গভীর ভাবাবেগ আছে, তেমনই আছে হৃদয়-নিবেদনের শোভন সংযত প্রকাশ। প্রেমকে তিনি দীপক রাগে জ্বলে উঠতে দেন নি, শান্ত রূপেই তাকে পেতে চেয়েছেন। রোমান্টিক প্রেমের কোমল সুমিত প্রকাশ তাঁর কবিতাগুলি। এগুলি পাঠে মনে হয় কিশোরী রাধার মতোই সঙ্কোচে অনুরাগে বেদনায় তিনি প্রেমকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছেন। 'অনাহূত' কবিতায় কবি বলেছেন :

দুখ-দুর্দিন নামিয়াছে যবে—
বেদনা-বাদল পরান ফেলেছে ছেয়ে,
বলি না এ কথা—কোন প্রিয়জন
বাহু বন্ধনে বাঁধে নি নিবিড় স্নেহে ;

তবু তারি মাঝে, জানি না কেমনে
চকিতের মত পড়েছে নয়ন পাতে—
সেই সব চেয়ে অল্প আলাপে—
সব চেয়ে কম পরিচয় যার সাথে !

'হাফিজের স্বপ্ন' কবিতায় দেখি অমা-নিশায় মৃদু উশীরের মদির গন্ধে ভুবন ভরে দিয়ে নম্র পদক্ষেপে স্বপ্নের মতো প্রিয়ার আগমন ঘটেছে, প্রিয়ার মঞ্জীর-সঙ্গীতরবে কবিহৃদয়ে ধ্বনি জেগে উঠেছে, প্রিয়ার অঙ্গুলিপাতে সেতার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে ; তারপর—প্রিয়ার চকিত অন্তর্ধান, এবং—

তারপর হতে বাজিছে সাহানা সোহিনী সিন্ধু কাফি—
তারি সাথে সেই পরম পরশ উঠিতেছে কাঁপি' কাঁপি' ;
তালে তালে উঠে দুলে' দুলে' তারি হৃদয়েরই আকুলতা,
সুরে সুরে সদা ঘুরে' ঘুরে' ফিরে তাহারি গোপন কথা ।

একটি রোমান্টিক প্রেমস্বপ্নের সুন্দর প্রকাশ এই কবিতাটি ।

কিন্তু কেবল রোমান্টিক প্রেমস্বপ্নেই কবি আবদ্ধ ছিলেন না, বাস্তবের প্রেমকেও তিনি বন্দনা করেছেন। পত্নীর বিয়োগব্যথা কবিকে একাধিক তীব্র বেদনাপূর্ণ প্রেমকবিতা রচনায় উদ্বোধিত করেছে। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'বিয়োগিনী' কবিতাটি। এতে কেবল কবিপত্নীর নয়, কবিরও আন্তর-পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কবিহৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে দীর্ঘ পয়ার ছন্দে :

গৃহলক্ষ্মী নহ শুধু, তুমি দেবি, ছিলে মোর বাণী ;
তব স্পর্শে প্রাণ পেয়ে আমার এ চিত্তবীণাখানি

মুখরি' উঠিত নিত্য,—জানুক বা না জানুক কেহ ;
অত্যুক্তি বলিয়া এরে বন্ধুজনে করিবে সন্দেহ,
জানি তাহা ; কিন্তু এই অন্তরের তন্ত্রীর বারতা
তুমি ছাড়া কে জানিবে ? কে বুঝিবে এর মর্মকথা !
আজ তুমি ছেড়ে গেছ, পড়ে আছে অন্ধকার কোণে
যন্ত্রের কঙ্কালখানা—কে আর তাহার কথা শোনে !
ধূলি-জালে ঢাকে নিত্য, বায়ু আসি' নাড়া দিয়ে যায়,
হা-হা করে কাঁপে বক্ষ ; আজি হায়, সে ধ্বনি কোথায় ?

'তিরিশের' যুগে 'কল্লোল'-পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে কবিতাটির মাধ্যমে, তার নাম 'যৌবন-চাঞ্চল্য'। এতে নবীন প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে ঃ

ছুটিয়া যুবতী চলে পথ !
টস্‌টসে রসে ভরপুর—
আপেলের মত মুখ আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপুর।
মেঘ ডাকে কড়্ কড়্ বুঝি বা আসিবে ঝড়,
একটু নাহিক ডর তাতে,
উঘারি' বুকের বাস, পূরায় বিচিত্র আশ
উরস পরশি' নিজ হাতে !
অজানা ব্যথায় সুমধুর—
সেথা বুঝি করে গুরুগুর।

এই যৌবন-চাঞ্চল্যের বর্ণনায় যতীন্দ্রমোহনের সহজ উদার জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাই।

॥ ৬ ॥

যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় এখানেই শেষ নয়। কাব্যসাধনায় যে বহুমুখিতা যতীন্দ্রমোহনের কবিজীবনে লক্ষ্য করা যায়, তার প্রৌঢ় পরিণতি বহুবিস্তৃতিতে। ঘরোয়া সুখদুঃখের বর্ণনায় আজ কবি আবদ্ধ নন, তিনি বহুতে নিজেকে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত করেছেন। দেশানুরাগের কবিতায় তিনি অন্তর-আবেগকে প্রকাশ করেছেন। 'পাঞ্চজন্য' কাব্যে সাময়িকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তার প্রমাণ 'নিরুপায়' কবিতাটি ঃ

শ্রমিকের ফাটছে পিলে ধনিকের বুটের ঘায়ে
বণিকের বংশ বাড়ে তেতলা প্রাসাদ-ছায়ে ;
কে খাটে, কেই বা খাটায় ? কে বা কাল খেলায় কাটায়
যে বোনে গায়ের কাপড়, সে মরে আদুল গায়ে !

কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের প্রতিভা এখানে সহজ স্ফূর্তি লাভ করে নি। তাই যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় এখানে পাওয়া যাবে না। সাময়িক ঘটনা বা উপলক্ষ্য তাঁর কাছে কখনোই বিশেষ মর্যাদা লাভ করে নি বলে আমার ধারণা।

শেষের দিকে যতীন্দ্র-প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছিল 'মহাভারতী' কাব্যে। গোড়াতেই বলেছি, ঐতিহ্যপ্রীতি ও আনুগত্য যতীন্দ্রমোহনের বিশেষ ধর্ম। এই ধর্মের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে 'মহাভারতী'র পুরাণ-প্রোক্ত চরিত্রাদি ও ঘটনা অবলম্বনে রচিত কবিতাগুচ্ছে। আধুনিক জীবনে মহাভারতীয় জীবন-দর্শনকে কবি নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে

যতীন্দ্রমোহনের কৃতিত্ব অবশ্য-স্বীকার্য। এই কবিতাগুলির শব্দঝঙ্কার, ছন্দোবৈচিত্র্য, ধ্বনিরোল ঐতিহ্যের পুনঃসৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। ঐতিহ্যবাহী 'মহাভারতী' তাই যতীন্দ্রমোহনের কবিপ্রতিভার একটি নোতুন দিক উদঘাটিত করে দেয়। 'কর্ণ', 'দুর্যোধন', 'ভাম', 'শবরীর প্রতীক্ষা', 'অশোক' 'বাসবদত্তা' প্রভৃতি কবিতায় পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্রের নব মহিমা প্রকাশিত হয়েছে।

কর্ণের আত্মবিলাপ ঃ

চালাও শল্য, ত্বরা লহ রথ—যেথা সে পার্থ আছে ;
শেষ প্রণিপাত লহ দিননাথ আজি কর্ণের কাছে ;
—সবই তো সমান—জয় পরাজয়—
অর্জুন-বধ—আত্ম-বিলয় !
—ভাগ্যের হাতে সবই অভিনয়—কর্ণ তা বুঝিয়াছে ;
—চালাও শল্য—দ্রুত, দ্রুততর যেথায় পার্থ আছে।

অথবা, মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধনের শেষ বিক্ষোভ ঃ

রাত্রি ঘনায়,—বন্ধু, বিদায়,
ফিরে' যাও ঘরে প্রণাম লয়ে ;
দুর্যোধনের দৃপ্ত মহিমা
জাগুক শিয়রে সঙ্গী হয়ে !
বেদব্যাসের পূতনাম-যুত
দুলুক অদূরে দ্বৈপায়ন,—
ক্ষাত্র তেজের দীপ্ত তারকা
জ্বলুক আঁধারে দুর্যোধন।

যে শক্তি নির্মম অমোঘ নিয়তির বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে পরাজিত হয়েছে, কবি যতীন্দ্রমোহন সেই পরাভূত অথচ দৃপ্ত মানবচরিত্রকে কাব্যাভিনন্দন জানিয়েছেন। যতীন্দ্রমোহন সম্পর্কে প্রথম কথা, সহৃদয়তা; তার পরিচয় গ্রামবাংলার নিপুণ আলেখ্য। তাঁর সম্পর্কে শেষ কথা, সহৃদয়তা; তার প্রমাণ 'মহাভারতী'র দৃপ্ত মানবমহিমাখ্যাপন।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাই কবি যতীন্দ্রমোহনের প্রতিষ্ঠা অবিচল।

———

পঞ্চম অধ্যায়

সতীশচন্দ্র রায়

॥ ১ ॥

উনিশ শতকের শেষপাদে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ স্নেহে সাহচর্য-লালনে যে ক'জন সাহিত্যসেবক আপন জীবন ও সাহিত্যকে গড়ে তোলার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম হলেন সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮১-১৯০৩)। বাকি যাঁরা তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এই দুজনের সঙ্গেই সতীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল রবীন্দ্র-স্নেহচ্ছায়াতলে। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজে স্বল্পপ্রসবী লেখক সতীশচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট আসন আছে। তাঁর মৃত্যুর পর 'গুরুদক্ষিণা' (১৯০৪) নামে একটি কিশোরপাঠ্য কাহিনী এবং অজিতকুমারের সম্পাদনায় 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' (১৯১২) প্রকাশিত হয়েছে; এতে সতীশচন্দ্রের বত্রিশটি কবিতা, আটটি গদ্য রচনা ও 'ডায়েরির কয়েকটি পাতা' মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর কিছু গদ্য-পদ্য রচনা 'বঙ্গদর্শন' ও 'সমালোচনী' পত্রিকায় ১৯০২-০৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৮-১১ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের দরবারে এই অল্প অথচ মূল্যবান উপহার সমর্পণ করে অকালে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে সতীশচন্দ্র মারা যান। তবু তাই সতীশচন্দ্রকে অমরতার গৌরব

দান করেছে। জাতীয় গ্রন্থাগারে সতীশচন্দ্র রায়ের নামে যে ক'টি গ্রন্থ রয়েছে, তা এই সতীশচন্দ্রের রচনা নয়। শান্তিনিকেতনের সতীশচন্দ্র ছাড়া সেখানে আরো চারজন সতীশচন্দ্র রায় আছেন, তাঁরা হলেন (১) 'শুকতারা' কাব্য (১৯২১)-প্রণেতা; (২) 'বাসনাঞ্জলি' কাব্য (১৯০০)-প্রণেতা; (৩) 'নিত্যপূজা' কাব্য (১৯২৩)-প্রণেতা এবং (৪) 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়।

সতীশচন্দ্রের প্রতিভা সম্পর্কে প্রধান সাক্ষ্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন, 'যে জীবন দৈবশক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, অথচ অমরত্বলাভের পূর্বেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাখিয়া যাইতে পারিল না। যাহারা তাহাকে চিনিয়াছিল, তাহার বর্তমান অসম্পূর্ণ আরম্ভের মধ্যে ভাবী সফল পরিণাম পাঠ করিতে পারিয়াছিল, যাহারা তাহার বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে একটা বেদনা এই যে, আমার শোককে সকলের সামগ্রী করিতে পারিলাম না। মৃত্যু কেবল ক্ষতিই রাখিয়া গেল। সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে।...কিন্তু লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহমাত্র করিতে পারে না যে, সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।'

এই সাক্ষ্যের পর সতীশ-প্রতিভা সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের নেতা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এবং সত্যেন্দ্র-প্রভাব তাঁর কবিতায় দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু সতীশচন্দ্রের কবিপ্রতিভা স্বকীয়তার দাবিতেই কাব্যসংসারে প্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য। সতীশচন্দ্র মুখ্যতঃ প্রকৃতির কবি। প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি তা একান্তই নিজস্ব। এই দৃষ্টিভঙ্গি সতীশচন্দ্র পেয়েছিলেন দুটি উৎস থেকে। এই দুইটি উৎসের প্রভাব আলোচনায় সতীশ-প্রতিভার সত্য পরিচয় নিহিত আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

॥ ২ ॥

প্রথম প্রভাব রবীন্দ্রনাথ। 'ডায়েরি'তে সতীশচন্দ্র বলেছেন, কৈশোরে 'গুরুদেবের স্বর্ণময় কবিতার সহিত পরিচয় হয়।...গুরুদেবের কবিতাই আমাকে ধরিয়াছিল। সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ উদয়াচলের ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছি। রবির কিরণ প্রত্যক্ষভাবে আমার মর্মের ভিতরে নামিয়া মধু ভাণ্ডারটিকে পূর্ণ করিতেছে, দলগুলিকে বর্ণে পূর্ণ করিতেছে।' পুনশ্চ, 'আজ রবীন্দ্রনাথকে আরও ভাল করিয়া চিনিলাম। সন্ধ্যার দিকে আমাদের পাঠসভা বসিল। সম্মুখে উদার মাঠে আকাশ মেঘল কোমল আচ্ছাদনে ঘেরা, মাঠে ছায়া, মৃদুশীতল বায়ু। পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কল্পনা লইয়া প্রথমে

"আজি এই আকুল আশ্বিনে" পড়িলাম। এক রকম লাগিল। কিন্তু 'বর্ষশেষ' পড়িতে গিয়া আমার মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল। বুক ফাটিয়া স্বর বাহির হইতে লাগিল। সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এবার কবিতাটি বুঝিলাম। কালিদাসের splendour আছে, সমারোহ আছে—majestic flow আছে, শান্তি আছে। কিন্তু একি weird বুকভাঙ্গা বৈদিক কবির মত ক্রন্দন! এ যে রুদ্র ইন্দ্রের দিকে উত্থিত গান!'

এই সাক্ষ্যের পর রবীন্দ্র-কাব্য-নিষ্ণাত সতীশচন্দ্রের কবিমানস কী ধাতুতে গঠিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকে না।

দ্বিতীয় প্রভাব : শান্তিনিকেতনের উদার প্রকৃতি। সংসারের সকল সুখমোহ বিসর্জন দিয়ে সতীশচন্দ্র প্রথম যৌবনে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক রূপে যোগ দিয়েছিলেন, সম্বল কেবল শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। বাল্যে বরিশালের গ্রাম-প্রকৃতি থেকে তাঁর মনে যে আনন্দের গান বেজে উঠেছিল, তা পরিপূর্ণ সমে এসে পৌঁছেছিল শান্তিনিকেতনে। 'ডায়েরি'তে বাল্যকাল প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র বলছেন : 'ছেলেবেলায় 'আমাকে' স্পষ্টই ঐ দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতির সঙ্গে আমার কি ভাব ছিল। বৃষ্টির দিনে কে আমাকে ঘরে রাখিবে? ঝড়ের দিনে কত ভাল লাগিত। বর্ষায় বিদ্যুতের গর্জনে কি নিবিড় আনন্দে হৃদয় কাঁপিত। বাহিরই আমার প্রিয় ছিল···আজও গ্রাম্য প্রকৃতিটি আমার কাছে দেবতার মতো বোধ হয়। স্মরণমাত্রেই

হৃদয়ে এমনি একটি অপূর্ব আনন্দ এবং ঔদার্যের সঞ্চার হয় যে তাহা বলিতে পারি না।'

কৈশোরের এই প্রকৃতি-প্রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল যৌবনের গভীর প্রকৃতি-প্রেমে। বস্তুতঃ শান্তিনিকেতনে না এলে সতীশচন্দ্রের কবিমানস এমন গভীরভাবে গড়ে উঠতে পারত না। বীরভূমের রুক্ষ প্রান্তর, গ্রীষ্মের ঝড়, রাত্রির গম্ভীর নৈঃশব্দ্য, প্রভাতের ঔদার্য: সব কিছুই এই অসাধারণ sensitive তরুণ কবিমনে এক আশ্চর্য-সুন্দর প্রভাব মুদ্রিত করেছিল। বাংলা কাব্যে এইরূপ গভীর প্রকৃতি-প্রেম রবীন্দ্র-কাব্য ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র বলছেন: 'এই বিরাট বোলপুরের মাঠ! রৌদ্রে অগ্নিতেজ বুঝাইয়া দেয়, সবিতার তেজ বুঝাইয়া দেয়, ঝড়ে বায়ুর শক্তি প্রকাশ করে, মেঘে বর্ষায় ইন্দ্রকে স্মরণ করায় এবং অন্ধকারে চান্দ্রমাসী ভাষা তারকী ভাষা লিখিয়া অশ্বিনীকুমারের রসভাবের অনুভূতি দান করে।' নিসর্গ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র আর্য ঋষিদের রহস্যদৃষ্টির উত্তরাধিকারী রূপে নিজেকে এখানে দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্র-প্রভাব ও প্রকৃতি-ভাব, এই দুটি তন্তুর টানাপোড়েনে সতীশচন্দ্রের কবিপ্রতিভার বয়ন হয়েছিল।

॥ ৩ ॥

সতীশচন্দ্রের কবিতার বাতাবরণ মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে ভাস্বর। তাঁর কবিতাগুচ্ছ পড়লেই এই ভাবটি অনুরাগী পাঠকমনে জাগ্রত

হয়। এই বিষয়টি আলোচনা করে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী যা বলেছেন, তাতে এই অভিমতের পোষকতা হয়। তিনি বলেছেন, 'শেলির ও সতীশচন্দ্রের রচনায় আবহাওয়াটির ভাব একই প্রকার—দুই-ই মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে ভাস্বর। শেলীর কাব্যলোকের অম্বর ইটালীয় মধ্যাহ্নের কিরণপ্লাবে সর্বদাই যেন দেখা-না-দেখার প্রান্তে কাঁপিতেছে। একটা প্রখর 'ইনটেলেক্ট'-এর ধারায় সমস্ত জগৎ অভিষিক্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে যেন অতীন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই দেখিয়াই শেলির নিগূঢ় কবিমানস যেন তাহার উপরে বিশুদ্ধ চৈতন্য সিঞ্চন করিয়া দিয়া তাহাকে খানিকটা লঘু, খানিকটা অবাস্তব করিয়া লইয়াছে। ইহাকে বলা যাইতে পারে বুদ্ধি দ্বারা বস্তুর শোধন। শেলির জগৎ বুদ্ধিশোধিত জগৎ। এই শোধন তাঁহার সজ্ঞান মন করিত না। কবি-মন শেলির অগোচরে করিত। তাঁহার কাব্যের অবিরল মধ্যাহ্নের আবহাওয়া এই বিশুদ্ধ 'ইনটেলেক্ট'-এর প্রতীক।

'Blue isles and snowy mountains wear
The purple noon's transparent might.'

এই purple noon-এর রৌদ্র কেবল পার্থিব নয়, তাহার সহিত কবির আত্মার কিরণ মিশিয়া তাহাকে একপ্রকার অপার্থিবতা দান করিয়াছে। এই অপার্থিবতা শেলির কাব্যের ধর্ম।

শেলির কাব্যের এই ধর্মটি সতীশচন্দ্রের কাব্যেও

বিরাজমান।' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)। সতীশচন্দ্রের 'রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি' পড়িলে আর সন্দেহ থাকে না যে, তিনি শেলির কাব্যের মর্ম আত্মসাৎ করেছেন। রৌদ্র-কিরণস্নাত কবি বলেছেন :

সুগভীর নীলাকাশ স্বচ্ছ, সুনির্মল,
ধ্যানসম নির্বিকার। বৃহৎ গগনে
রৌদ্র উঠিয়াছে জাগি আনন্দিত মনে।
বহু কথা মনে পড়ে—গ্রামের প্রান্তরে
দুটি বড় বড় পক্ষী হরষ অন্তরে
উড়িয়া, বঙ্কিম পথে আসিছে নামিয়া—
রৌদ্রভার বুকে ঠেলি', পৃষ্ঠে অনুমিয়া,
[illegible]
আমার চিত্তও যেন উঠিয়া পড়িয়া
রৌদ্র-সমুদ্রের মাঝে সাঁতারি গভীর
ক্রীড়া আজি করিতেছে।.........
বহুদূর বালুচর—হস্ আসে ঢেউ,
হস্ কলকল্ পুনঃ চলি' যায়, কেউ
কোনদিকে নাহি আর—রৌদ্র জ্বলজ্বল।
বিদায় সুহৃদ তবে। আলো বক্ষ চাপে
ওবি মাঝে যেন তব হৃদিস্পন্দ কাঁপে।

এই রৌদ্রমুগ্ধ স্পন্দিত কবিপ্রাণের পরিচয় আরো কয়েকটি কবিতায় পাই। 'শেলির প্রতি', 'মধ্যাহ্নে', 'স্বপ্ন, সম্মুখের', 'পরীর জন্মকথা', 'দিবাভাগের চাঁদ', 'আগ্রাপ্রান্তরে', 'আজি'

প্রমুখ কবিতাগুলিতে মধ্যাহ্নদীপ্তিতে ভাস্বর প্রকৃতির অপূর্ব-সুন্দর ছবি পাই।

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চরণ উৎকলন করলেই এই সম্পুর্ণ ছবিটি পাঠকের চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

তপন খচিত এই নভ-চন্দ্রাতপ
সুগভীর নীল ছটা মাথায় বিরাজে,
বান্ধব বিটপী যত পল্লব-সৌষ্ঠব
বিকাশে কবির যত সুন্দর প্রচুর,—
সহকারে বাড়ে ফল নিটোল কঠিন
সরস কৈশোরসম! তপ্ত সুমধুর
সোমরস আলো! —'আজি'

এ কি এ ভুবনময় মহিমা রবির
কিরণ নীরব এ কি গগন গভীর! —'মধ্যাহ্নে'

এ স্বপন সারাদিন ধরে!
সোনার আলোকময় ঘরে। —'স্বপ্ন, সম্মুখেব'

ডুবিয়া আছে তরী—
কিরণময় সুনীল নভ-সাগর মাঝে পড়ি
ডুবিয়া আছে তরী। —'দিবাভাগে চাঁদ'

আকাশের নীলকান্ত মণির পেয়ালা থেকে 'তপ্ত সুমধুর সোমরস আলো' সমস্ত পৃথিবীর 'পরে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে, কবি ঊর্ধ্বমুখে সেই সুধা পানে পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন: এই ছবিটিই এখানে পাঠকমনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ ত সেই purple noon, তারই স্বচ্ছ আলোয় সমস্ত পৃথিবী রৌদ্রস্নাত,

আর কবিমানসও সে সুধা পানে বিভোর। এই বর্ণনাগুলিতে ভাষার যে প্রৌঢ়তা, যে নিটোল কঠিন মূর্তি, তা রূপদক্ষ কবির শিল্পনৈপুণ্যকে প্রকাশ করেছে।

কিন্তু মধ্যাহ্নের তপ্ত সুধারস পানেই কবি পরিতৃপ্ত থাকেন নি। শান্তিনিকেতনের উদাস সন্ন্যাসী প্রকৃতির যে বৈরাগী রূপ সন্ধ্যায়, নিশীথে, প্রভাতে দেখেছেন, তাকে তিনি নিপুণ বর্ণসম্পাতে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

অপরাহ্নের শ্রান্ত ছায়ায় শান্তি-অন্বেষণে ব্যাপৃত কবি বলেছেন ঃ

অপরাহ্নে দীর্ঘতর শ্রান্ত ছায়া আঁকি
ধরণী বিমৌন পড়ি, আলোক সুন্দর
আকাশ ভরিয়া ফেলে বৃক্ষরাজি 'পর
সুধারস দেয় ঢালি,—মেলি' চিত্র পাখা
নানা পাখী উড়ি উড়ি পড়িছে প্রান্তরে—
এ নীরব রূপ হতে লভিছি অন্তরে
দুঃসহ মৌনের ভার—সমীরের সনে
মনে হয় বিজড়িত, অস্ফুট বচনে
সুগন্ধ পরশ কার—মোরে অন্ধ সম
করিতেছে আলিঙ্গন—পরাণের ব্যথা
নাহি ঘুচে। কোথা সেই অনুপম
মধুরিমা পরিপূর সান্ত্বনার কথা—
তিল রোধে যে কথাটি বহি' অনুচ্চার
দুঃসহ করিছে এই মৌন রূপ ভার!

—'অপরাহ্নে'

এই কবিতা পাঠে বার বার প্রকৃতি-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। সতীশচন্দ্রের প্রকৃতি-বর্ণনা কাব্যে ও গদ্যে মূলত এক। 'ডায়েরি', 'রাজকন্যা' ও 'মেঘচ্ছবি' প্রবন্ধের সঙ্গে 'অপরাহ্ণে', 'সন্ধ্যার একটি সুর', 'চাঁদ', 'ছায়াগর্ভসম্ভূতা', 'বর্ষারাত্রি', 'নিশায়', 'আত্মসমর্পণ', 'নিশীথিনী' প্রভৃতি মিলিয়ে পড়লেই এর সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়। সতীশচন্দ্রের কাব্যজীবন ও ব্যক্তিজীবনে যে কোনো প্রভেদ ছিল না তার প্রমাণ এখানে স্পষ্ট।

একটি মাত্র উদাহরণ নিলেই সতীশচন্দ্রের প্রকৃতিপ্রেমী কবিমানসের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে পারি। 'মেঘচ্ছবি' প্রবন্ধের 'শান্ত সুন্দর গদ্যধারা'য় যে প্রেম প্রকাশিত, তাই 'নিশীথিনী' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে আবেগপূর্ণ কবিচিত্তের উৎসার ঃ

'কোথা হইতে কোথা চলিলাম ? কিন্তু আজিকার দিনেই সহজেই রাত্রির কথা মনে পড়ে। দিন আজ রাত্রির মত প্রায়, সমস্ত সুখ আজ দুঃখের মত প্রায়। নীপসুন্দরস্মিতা-সুন্দরি, তোমার হাস্য আজ সিন্ধুতলের রত্নের মত অন্ধকার। সুরচাপ-ভ্রূ-বিলাসিতা, তোমার উজ্জ্বল চক্ষুতারকা আজ ঘনঘোর আকাশের মত বাষ্পময় অন্ধকারে আবিষ্ট। কোথায় রাত্রি ? কোথায় রাত্রিমুখে সন্ধ্যা ? আজ কিরূপে তাহাকে চিনিয়া লইব ? তাহার আকাশভরা কোমলতা হইতে নীলাভায় বিগলিত হইয়া আজ কখন কোথায় অন্তর্হিত

হইয়া যাইবে! ঘনবিন্যস্ত মেঘের রন্ধ্রে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইব কি? কিন্তু না,—আজিকার সন্ধ্যা অপূর্বতর। একি অভিনব সন্ধ্যা! বিকচজবাপুষ্পরাগরক্ত এই সায়াহ্নকাল। ক্ষণকালের জন্য একটি রক্তমেঘ হইতে কোমলতর রক্তাভা নির্গত হইয়া এমন তীব্র উজ্জ্বলতা ধারণ করিল যে, মনে হইতেছে, যেন বিশ্বকর্মার অগ্নিকুণ্ডে দেবসেনাপতির বহ্নিদগ্ধ কঠিন, লৌহবর্ম নির্মাণ হইতেছে। রক্তাভার নিম্নদেশে পৃথিবীও বনচ্ছবি মিলাইয়া দিল। বৃষ্টিধৌত মেঘচ্ছায়াচকিত নিবাত নিষ্কম্প বনচ্ছবি এমনি প্রগাঢ় সবুজ যে, ঐ ছবিটিকেও যেন কার্ত্তিকেয়ের একটি কঠিন তাম্রঢালের উপরে উৎকীর্ণ বলিয়াই মনে হইতেছে। মেঘে এবং বনে মিলিয়া একখানি রক্ত-পীত-নীল-হরিত-তরঙ্গায়িত প্রগাঢ়বর্ণ তাম্রপত্রে খচিত বৃহৎ ছবি।'

'নিশীথিনী' সেই মুগ্ধ প্রকৃতিপ্রেমীর আন্তর প্রকাশ:

সোনার সন্ধ্যার পর এলো রাত্রি, বিকাশিল তারা
দিগন্ত মিলায় বনে নভস্তল চন্দ্রকলাহারা।
কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর বিপুল
আবরিয়া বসিয়াছে ধরণীর মধুময় ফুল!
সেই আলো প্রস্ফুটিত লক্ষদল কুসুম সুন্দর
তারি পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা গভীর অন্তর
বিদারি, অতল মধু বিকশিয়া করিতেছে পান
ধরণী গগনে লাগে মধুরস জোয়ারের টান!

রসভরা বহে বায়ু বনস্পতি শাখায় সঞ্চরি—
রসাবেশে বনস্পতি আপনারে রেখেছ আঁধারি,
প্রান্তরের ক্ষুদ্রতম তৃণমুখে লেগেছে শিশির
অতল নিদ্রার রসে ডুবে গেছে জীব ধরণীর !
সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই
মনে হয় এ আঁধার একেবারে নহে রস বই !

সতীশচন্দ্র যে অনুরাগের প্রদীপ হাতে নিয়ে জগৎ দর্শনে যাত্রা করেছিলেন, সেই প্রদীপের আলোকেই এই অপূর্ব সুন্দর ছবিগুলি উদ্ভাসিত হয়েছে। আক্ষেপ এই যে, সতীশচন্দ্র সে যাত্রা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি, অকালমৃত্যু সে যাত্রাকে মধ্যপথে খণ্ডিত করেছে।

॥ ৪ ॥

সতীশচন্দ্রের অপর পরিচয় তাঁর ব্রাউনিং-প্রীতি। 'রচনাবলী'তে ব্রাউনিংএর উপর দুটি প্রবন্ধ—'আরো একটি কথা' (One word more) ও 'প্যারাসেলসাস্' (Paracelsus), এবং তিনটি কবিতার অনুবাদ—'রাত্রে মিলন' (Meeting at Night), 'প্রাতে বিদায়' (Parting at Morning) ও 'ভগ্ননগরে প্রেমমিলন' (Love among the Ruins) আছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'সাহিত্যের মধ্যে ব্রাউনিং তখন সতীশকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। খেলাচ্ছলে ব্রাউনিং পড়িবার জো নাই। যে লোক ব্রাউনিংকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সে হয় ফ্যাশানের

খাতিরে, নয় সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ বশতঃই এ কাজ করে। আমাদের দেশে ব্রাউনিংএর ফ্যাশান বা ব্রাউনিংএর দল প্রবর্তিত হয় নাই, সুতরাং ব্রাউনিং পড়িতে যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।'

যদিও সতীশচন্দ্রের কাব্যের অধিপতি রবীন্দ্রনাথ ও শেলি, তথাপি ব্রাউনিংএর যুক্তি, নীতি ও বিশ্লেষণপ্রবণতা যে তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তার প্রমাণ ঐ দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। সুহৃদ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত এক পত্রে তাঁর কবিজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেলি-সুলভ সৌন্দর্যধ্যান ও ব্রাউনিং-সুলভ মানবজীবনে তত্ত্বারোপ : এ দুয়ের উল্লেখ করে বলেছেন, 'Robert Browning-এর সেই Mediaeval Musician-এর মত কল্পনার মুহূর্তে Life-এর চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়া পড়ি। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার মাটির সঙ্গে সমান হইয়া যাই। জানি না কোনদিন দৃঢ় হইব কিনা।' আমার ধারণা সতীশচন্দ্রের কবিমানস এই দৃঢ়তা ও বৈরাগ্যের অনুকূল ছিল না; তাই তাঁর কবিতায় ব্রাউনিং শেলির মতো কোনো স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করতে পারেন নি। ব্রাউনিং-এর যে তিনটি কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন, সেখানেও হৃদয়-বিশ্লেষণ অপেক্ষা হৃদয়-আবেগ প্রাধান্য লাভ করেছে। এই তিনটি অনুবাদের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ 'রাত্রে মিলন'

(Meeting at Night)। ব্রাউনিং-এর মিল-পারম্পর্য (ক-খ-গ, গ-খ-ক) সতীশচন্দ্র এই কবিতায় রক্ষা করেছেন। কবিতাটি ক্ষুদ্র এবং সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য ঃ

পাণ্ডুর সাগর দীর্ঘ কৃষ্ণ তীর ভায়
পীত অর্ধ চন্দ্রকলা পড়েছে নামিয়া,—
চমকিত বীচিমালা নেচে নেচে টুটে
ছোট ছোট অগ্নিচক্রে, নিদ্রা হতে উঠে—
তখন থামানু তরী ধাইয়া আসিয়া,
জলবাঁকে—হৃতবেগ সিক্ত সিকতায়।
সিন্ধুগন্ধি উষ্ণ বালুতীরে তারপর—
ক্রমে তিনখানি মাঠ, প্রান্তে বাড়িখানি—
দুয়ারে একটু হানা দ্রুত বিদারণ
দেশলায়ে—দীপ্তি সনে নীলাভ স্ফুরণ
পরে সুখশঙ্কাত্রস্ত মধুময় বাণী
দুটি লগ্ন বক্ষোস্পন্দ হতে মৃদুতর !

॥ ৫ ॥

কবি সতীশচন্দ্র কেবল অনুরাগী রবীন্দ্র-শিষ্য নন, তিনি আগামী দিনের কাব্যান্দোলনের অগ্রদূতও বটেন। তাঁর কবিতায় যেমন ভাষার প্রৌঢ়তা, উপমার অনিবার্যতা ও সুমিত শব্দচয়ন-নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ভাবে ও ভাষায় আধুনিক-সুলভ প্রাকৃত প্রয়োগও দেখা যায়। শব্দ-ব্যবহারে সতীশচন্দ্রের সহজাত নৈপুণ্য ছিল। কেবল তৎসম শব্দের

ধ্বনিরোল সৃষ্টিতে নয়, তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রয়োগেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তার সঙ্গে মিলেছে কল্পনা ও ভাবের ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবৃত্তি।

ছন্দ ও শব্দপ্রয়োগে তাঁর সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের পরিচয় রয়েছে এই সব চরণে—

চুপ চুপ চুপ, নীরবে নীরবে
আয় তোরা সরে, যা তোরা সবে—
সোনার ফড়িং সোনা মক্ষিকা ;
উত্তর দখিণ পূবের দালান
এখনও ঘুমে অন্ধ নয়ান
শুধু পশ্চিমে ধবধবে জ্যোতি
পট তুলি' দিয়া জাগে সম্প্রতি।

—'ভগ্নবাড়ির দেবতা'

পশ্চিম দিগন্তে যেথা গভীর সিঁদুর
যেন কোন উপন্যাস-রাজার মহাল-মালা
ভাঙিয়া পড়েছে চুর চুর।

—'দুঃখদেবতার মূর্তি'

পত্ পত্ চীনাম্বরে রথাগ্রচূড়ায়—
হাজার কপোতী যেন উড়িয়া বেড়ায়!

—'জামদগ্ন্য'

দলমল স্বর্ণ গাঁদা!

—'আত্মসমর্পণ'

সেই যে পক্ষীর দল, উড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে
মাঝে মাঝে ঋতুচারে যেথা এসে থাকে।

—'রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি'

বহুদূর বালুচর—হস্ আসে ঢেউ,
হস কলকল্ পুন, চলি যায় কেউ

—'রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি'

দিনু ছুঁড়ি পত্রখানি। ওগো কবিগণ,
তোমরা বুঝিয়া লও কি এ জলপন। —ঐ

হুস্ করি' নেমে পড়ে বারিরাজ্যমাঝে,
জল উঠি' উচ্ছ্বসিয়া চারি ধারে নাচে,
ডুবায় উপুড় করি, কাৎ করি তরী
—শিশুদের কোলাকুলি !— —ঐ

শব্দপ্রয়োগে ও ছন্দ-ব্যবহারে সতীশচন্দ্রের সাহস ও সংযম দুয়েরই পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

সতীশচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা—তাঁর শব্দপ্রীতি ও তরল ছন্দ ব্যবহারের দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা স্বীকার্য। 'বসোরায় গোলাপ', 'স্বপ্ন, পশ্চাতের' কবিতা দুটি তার প্রমাণ। শেষোক্ত কবিতায় সতীশচন্দ্র পরীদের বর্ণনায় সত্যেন্দ্রীয় ধ্বনি-কৌশল গ্রহণ করেছেন :

পরীদের রঙ পরীদের পাখা
পরীদের আঁখি নীল আছে আঁকা!
সত্যই জানি
পরীদের রাণী
অপরাজিতায় বেগুনিয়া রঙে
চালায়েছে তুলি ;—ঝুমুকার সনে
নাচিতে নাচিতে ঝুমুকার' পরে
পীত পদরেণু পড়ে গেছে ঝরে—

ঝুমুকা মরমে
প্রণয়ে সরমে
তাড়াতাড়ি চুমি, পালায়েছে কোনো
পরী—সেথা মধুমদিরা এখনো !

কিন্তু সতীশচন্দ্রের কয়েকটি বিরল বর্ণনায় আধুনিক কবিমানসিকতার প্রথম পরিচয় পাই।

'ভগ্নবাড়ির দেবতা'র কবিতা ভাঙা ইঁটের ফাঁকে ঘাসের বর্ণনায় সতীশচন্দ্র যে প্রত্যক্ষ বাস্তব-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে মনে হয় বেঁচে থাকলে এক্ষেত্রে সতীশচন্দ্র আধুনিক কবিদের পথিকৃৎ হতে পারতেন। বর্ণনাটি এই ঃ

শুষ্ক মাথার কঠোরতা দেখে,
ভাঙা কুঠরিটি দিছি ওই রেখে,—
ইষ্টক যত কুঞ্চিত কালো
কোথাও কঠিন তীক্ষ্ণ ছুঁচালো—
শুধুই নীরস নীরস ঘাস,
এর পরে জনমিছে বারোমাস,
শুষ্ক মুখে দাড়ির মতন।

রবীন্দ্রানুসারী কাব্যসংসারে এই ধরণের বাস্তব-বর্ণনা অতি বিরল। কিন্তু এ কেবল সম্ভাবনা, অকাল-মৃত্যুর দ্বারা তা খণ্ডিত।

কবি সতীশচন্দ্রের প্রথম ও শেষ পরিচয়—তিনি রবীন্দ্র-শিষ্য। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রকৃতির প্রেম, এই দুই প্রভাব তাঁকে morbidity-র হাত থেকে প্রথম যৌবনে রক্ষা করেছে

একথা তিনি 'ডায়েরীতে' স্বীকার করেছেন। সতীশচন্দ্রের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে তাঁর সেই আনন্দ-স্বীকৃতির কথা স্মরণ করি, যাতে তিনি বিশিষ্ট: 'গুরুদেবের স্নেহই তো আমার জীবনের উপরে সূর্যরশ্মির মতো পড়িয়াছে। তাঁহার সেই অপরাজিতা ফুলের মতো কোমলতাপূর্ণ চক্ষু দুটি আমার হৃদয়ের ভিতরের সহস্রদল পদ্মের উপর স্থাপিত হইয়াছে। আমার প্রাণে মনে ভাবে কল্পনার সংসারে সর্বত্র তাঁহার স্নেহকিরণ পড়িয়াছে। ফুলের উপরে প্রভাতের সূর্যরশ্মি পড়িলে সে যাহা অনুভব করে তাহা আমি একটু একটু যেন বুঝিতে পারি।' সতীশচন্দ্রের কবিতা সেই আনন্দ, সেই প্রেম, সেই স্নেহের ফল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

॥ ১ ॥

শতাব্দীর একপাদ পূর্বে কৈশোরে ইস্কুল-পাঠ্য গ্রন্থে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের একটি কবিতা পড়েছিলাম; কবিতাটির নাম 'দরদ' আজও তা মনে আছে। কবিতাটির বিষয়বস্তু নিতান্তই সাধারণ হৃদয়াবেগ, কোন গুরু তত্ত্ব তাতে ঠাঁই পায় নি। কিন্তু প্রকাশের অনায়াস সারল্য, গভীর আন্তরিক হার্দ্য স্থর, অকপট বেদনানুভূতির ও যত্নকৃত সচেতন স্টাইলের অনুপস্থিতির জন্যই বোধ করি ওই কবিতার কিছুটা মনে আছে ঃ

একটি শুধু পয়সা দিয়ে বকেছিলাম কত,
আজকে তাহা বিঁধছে বুকে কুশাঙ্কুরের মত।...
ক্ষমা চাওয়ার সময় গেছে—চাব কাহার কাছে?
ভিখারী আজ নাগাল ছাড়া—সুদূর দেশে আছে।
কথা তো সে কয়নি কিছু,
করেছিল মুখটি নীচু,
মলিন দুটি চক্ষু হল অশ্রুভারানত।

হায় রে কথা, ছোট্ট কথা কেনই বা হায় বলা,
রাখলে এমন দারুণ দাগা মর্মভেদী ফলা।
নয়নজলে ধোয় না তাহা,
অনুতাপে নোয় না তাহা,
তামার কুচির তাম্র-শাসন শাসায় অবিরত।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (জন্ম : ১৮৮৩ খ্রীঃ) রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের জীবিতদের মধ্যে বোধ করি শ্রেষ্ঠ। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে আছে ওই অকপট গভীর আন্তরিকতা ও দরদ। 'দরদী কবি' এই বিশেষণটি কুমুদরঞ্জনের সার্থক অভিধা। কুমুদরঞ্জনের এই দরদী কবিমানসের পরিচয় তাঁর কাব্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাঁর কাব্যপরিধির বিস্তার অর্ধশতাব্দীব্যাপী। বিশ শতকের প্রথমার্ধের সূচনায় তিনি কাব্যলক্ষ্মীর অর্চনা শুরু করেন, একান্ত নিরলস নিষ্ঠায় আজও তিনি সেই অর্চনায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের তালিকা এই : শতদল (১৯০৬), বনতুলসী (১৯১১), উজানি (১৯১১), একতারা (১৯১৪), বীথি (১৯১৬), বীণা (১৯১৬), বনমল্লিকা (১৯১৯), নূপুর (১৯২১), রজনীগন্ধা (১৯২২), অজয় (১৯২৭), তূণীর (১৯২৮), চূণকালি (ব্যঙ্গকাব্য) (১৯৩০), স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৭)।

এ ছাড়া আরও বহু কবিতা মাসিক পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

কুমুদরঞ্জন গ্রামবাংলার কবি। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে গ্রামলক্ষ্মীর উপাসক যে কজন কবির আবির্ভাব হয়েছে, কুমুদরঞ্জন তাঁদের অন্যতম। রাঢ়বঙ্গের, বিশেষ করে বর্ধমান জেলার, গ্রামাঞ্চলের প্রকৃতি তাঁকে মুগ্ধ করেছে। অজয় নদের শান্ত ও প্রচণ্ড দুই রূপই কুমুদরঞ্জনের কবিতায় ধরা পড়েছে। আর এই নদীমাতৃক গ্রামাঞ্চলের পথে পথে যে রোমান্টিক কাব্যভাবনা

ছড়িয়ে আছে, বৈরাগী কবি কুমুদরঞ্জন তাঁর কাব্যবীণায় সে ভাবনাগুলিকে সুরের মূর্ছনায় মুক্তি দিয়েছেন। তাই কুমুদ-রঞ্জনের কবিতাপাঠের প্রথম যে যোগ্যতা পাঠককে অর্জন করতেই হয়, তা হল গ্রামবাংলার প্রতি আন্তরিক অকপট ভালবাসা। এই ভালবাসার ছাড়পত্র না পেলে পাঠক কুমুদরঞ্জন-সৃষ্ট কাব্যজগতের সৌন্দর্যসন্ধানে ব্যর্থ হবেন।

॥ ২ ॥

কুমুদরঞ্জনের কাব্যে যে অকপট প্রকৃতিপ্রেমের কথা উল্লেখ করেছি, তার বিস্তারিত পরিচয় পেতে হলে অজয়-কুনুর-তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলে মানস-পরিভ্রমণ করে আসতে হয়। এই প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়ে আর একজনের কথা অবধারিত মনে পড়ে, তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী'কারের যে প্রকৃতিপ্রেম, কুমুদরঞ্জনের প্রকৃতিপ্রেম তা থেকে ভিন্নতর নয়। সাধারণ পাঠক ও লেখকের কাছে—আমাদের কাছে—প্রকৃতিপ্রেম একটি বিশেষ সাহিত্য-প্রত্যয় (concept) মাত্র। বিভূতিভূষণের কাছে তা ছিল গভীর বিশ্বাস (faith)। এই গভীর বিশ্বাস সাহিত্যক্ষেত্রে অতি-বিরল। কুমুদরঞ্জন সেই বিরল গভীর প্রকৃতিপ্রেমের অধিকারী। এই প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় কুমুদরঞ্জনের কবিতা থেকে দিতে পারি,

গেছে কবি, নামটি তাহার গাঁয়ের বুকে আঁকা,
তরুলতার শ্যামল গায়ে মমতা তার মাখা।

('পল্লীকবি', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আজকের নগরকেন্দ্রিক কাব্যসংসার থেকে গ্রামপ্রীতি অনেক দূরে চলে গেছে। কুমুদরঞ্জন সেই দূরায়ত গ্রামজীবনের কবি।

প্রকৃতিপ্রেমই তাঁর কবিমানসের ভিত্তিভূমি। গভীর বিশ্বাসে ও আন্তরিক অনুরাগে তিনি এই গ্রামজীবনকে গ্রহণ করেছেন। অজয় নদের তীরেই তিনি সমস্ত জীবনটা কাটিয়েছেন, বাকী ক'টি দিনও সেখানেই কাটাবার বাসনা রাখেন। শ্রীসজনীকান্ত দাসকে লিখিত ও 'শনিবারের চিঠি' শ্রাবণ ১৩৪৭ সংখ্যায় মুদ্রিত এক পত্রে কবি বলেছেন, "প্রাচীন অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষগুলি পল্লীর সম্পদ, তাহাদিগকে আমি গ্রামের সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বুনিয়াদী জীবন্ত অধিবাসী বলিয়া মনে করি। বর্ষায় অজয়ের বন্যা, অন্য সময়ে তাহার লহরীমালার নৃত্য, এমন কি তাহার ধূসর বালুচর দেখিয়া আমি ক্লান্ত হই না, দিনের পর দিন দেখি।" ব্যক্তিজীবনের এই অনুরাগ-আসক্তিই কাব্য-জীবনের নব নব রূপে প্রকাশ লাভ করেছে। তার সামান্য পরিচয় এখানে উদ্ধার করি।—

(১) তোমারে যে আমি ভালোবাসিয়াছি কাব্য পড়িয়া নহে,
নহেকো শ্যামল স্নেহের লাগিয়া অন্যে যে কথা কহে।
হয়েছি তোমার সুখ-দুখভাগী,
নয় তো নেহাত অভাবের লাগি,
আমার ভক্তি—এ অনুরক্তি বুকের রক্তে বহে ॥

('পল্লী', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(২) রহিল তোমার বুকে ভালবাসা কূলে কূলে উল্লাস,
আমার আদর রাখিবে ধরিয়া এই বনফুলবাস।

হেরিবে সকলে পাণ্ডুর সৈকতে
তব খেয়াঘাটে নির্জন বনপথে,
মোর কবিতার অটুট পাণ্ডুলিপি ছড়ানো প্রাণের গীতি।

('কুন্থর', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(৩) আমিই সৌধ, আমি প্রাঙ্গণ, আমি তার শশী-রবি,
আমি আলোছায়া গীত ও গন্ধ মাঠ দিগন্ত শোভি।

আমি তার বায়ু, আমি তার জল,
আমিই কুমুদ, আমিই কমল।
আমি তার রূপ, আমি তার প্রাণ, আমি তার দীন কবি।

('একটি গ্রাম', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এই তিনটি উদ্ধৃতিই কবির গ্রামপ্রকৃতিপ্রেমের যথেষ্ট পরিচয়। কুমুদরঞ্জনের কবিতার যে সহজ-সরল, গভীর ও অকপট রূপ, তার মূলে আছে এই গভীর ভালবাসা। গ্রামপ্রকৃতির সৌন্দর্যসৃষ্টিতে কবি এই শ্রেণীর কবিতায় যে সার্থকতা লাভ করেছেন, তা যত্নকৃত নয়, স্বভাবগত। ভক্তি ও প্রীতির আবেশে একটি অশ্রুসজল কবিমানসের পরিচয়ই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। এইজন্য কলাকৌশল-গত ত্রুটি কুমুদরঞ্জনের কবিতায় পাওয়া বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়। এখানে বড় কথা এই, কী গভীর অনুরাগে এই কবিতাগুলি স্পন্দিত হয়েছে! নগরসভ্যতার সংকট-মুখর সংশয়পূর্ণ পরিবেশে তাঁর এই গ্রামবন্দনাগীত হয়তো

কেউ শুনবে না, তা কবি জানেন; তাই তিনি তাঁর মানস পরিভ্রমণের ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন গ্রামের উদার প্রান্তরে—

চল্ গাবি গান উদাসে তোর চেনা মাঠে সেখানে
নদী কলকল মিলাইবে সুরে যেখানে।
উঠানে সূর্যমুখীটি উঠিবে ফুটিয়া,
শেফালী হাসিবে ঘাসের উপর লুটিয়া,
তুই কবি তোর পল্লীবাণীর শ্যামল মাধবী বিতানে
চল্ গাবি গান উদাস বাতাসে
তোর চেনা মাঠে সেখানে।

('শেষ', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আর এখানেই কবি তাঁর কাব্যসাধনার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন।

কবি যে প্রকৃতিচিত্র রচনা করেছেন, তাতে যত্নকৃত কারু-নৈপুণ্যের অভাব আছে, কিন্তু স্বভাবগত সৌন্দর্যের অভাব নেই। এত সহজে ও স্বচ্ছন্দে তদ্ভব শব্দের প্রয়োগে এবং লাচাড়ী বা ত্রিপদীছন্দের দোলায় তিনি এই ছবিগুলিতে আনন্দানুভূতি সঞ্চার করেছেন যে তা দেখলে অবাক হতে হয়। যেমন,

বাড়ি আমার ভাঙন-ধরা অজয় নদীর বাঁকে,
জল যেখানে আদরভরে স্থলকে ঘিরে থাকে।
সামনে ধূসর বেলা জলচরের মেলা
সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে।

ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে নাচে জলের ঢেউ,
আমি দেখি আপন মনে, আর দেখে না কেউ।
জেলেরা দেয় বাচ লাফায় বোয়াল মাছ,
নীরব আকাশ মুখর ভরে শঙ্খচিলের ডাকে।
('আমার বাড়ি,' শ্রেষ্ঠ কবিতা)

গ্রামপ্রকৃতির সহজ-সরল নিরাভরণ উদাস সৌন্দর্যের এফেক্ট কবি এনেছেন অনায়াসনৈপুণ্যে। প্রকৃতি-চিত্রণের জন্য তাঁকে উপমা হাতড়ে ফিরতে হয় নি। চারপাশের গ্রামজীবনের অজস্র সুলভ দৃশ্য থেকে তিনি উপমাগুলি বেছে নিয়েছেন। উঁচু ভাবকল্পনায় সমাহৃত বস্তু তিনি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেন নি, উদাসী বাউলের প্রেমে তিনি গ্রামকে গ্রহণ করেছেন, আর এই প্রেমসাধনার পথে যে ফুল ফুটেছে, তা-ই তিনি কাব্যে গ্রহণ করেছেন। এর ফলে কুমুদরঞ্জনের কবিতা একটি অনন্যসুলভ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। গ্রামের মাটির গন্ধ ও ফুলের সুবাস তাঁর কবিতায় একান্ত সহজভাবেই এসেছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে যখন এক দিকে রবীন্দ্রকবিপ্রতিভা মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে ভাস্বর, আর এক দিকে নব পরীক্ষায় উন্মত্ত আধুনিক কবিদের পথানুসন্ধান ও বহুচারিতা, তখন কুমুদরঞ্জন এই গভীর পল্লীপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মস্থ হয়েছেন ও সহজ-সরল দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন। ফলে তাঁর কাব্যজীবনে কখনও সংশয় ও নৈরাশ্যের ছায়াপাত হয় নি।

॥ ৩ ॥

এই পল্লীপ্রীতি তাঁর কাব্যগুলির নামকরণেও ধরা পড়েছে—অজয়, উজানী, একতারা, নূপুর, বনতুলসী, বনমল্লিকা। এই পল্লীপ্রীতিরই নব পরিচয় পাই বাংলার লোকজীবন, সংস্কৃতি ও পুরাণ-কাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত আকর্ষণে। তাঁর কবিমানস এই পল্লীতেই নির্মিত হয়েছে। পল্লীজীবনের সৌন্দর্য এই কবিমানসের সৌন্দর্য।

এত গভীরভাবে অনুরাগবেদনা-মেশানো কণ্ঠে কুমুদরঞ্জন পল্লীমায়ের বন্দনা করেছেন যে, তা মুহূর্তেই আমাদের অবিশ্বাসী মনকে স্পর্শ করে ঃ

ফিরে এলাম তোমার কোলে
আবার এলাম ফিরে,
অভাগিনীর বেশে মা গো,
আকুল আঁখিনীরে।
চন্দ্রহারা কোজাগরে,
জাগতে এলাম তোমার ঘরে,
সোনালী মেঘ সজল হয়ে
ঘিরল অবনীরে।
পাঠাইতে পরের ঘরে
কেঁদেছিলে বড়,
আজকে কেঁদে ফিরে এলাম,
মা গো, কোলে কর।

('ফিরে', অজয়

এই পল্লীপ্রীতি নবরূপ লাভ করেছে মাতৃপ্রেমে। মাতৃ-স্নেহের জন্য অবুঝ কিশোরের যে তীব্র ব্যাকুলতা, কুমুদরঞ্জনের মাতৃপ্রীতিমূলক কবিতায় সেই তীব্র ব্যাকুলতাই প্রকাশ লাভ করেছে। এখানে যে দরদ, আন্তরিকতা ও গভীরতা প্রকাশমান, তা সমালোচকের সকল সংশয়ের অবসান ঘটায়—

মা গো আমার পুণ্যময়ি !—তুমি আমার জগন্মাতা,
জনম জনম পেলাম তোমার এই করুণা, এই মমতা।
গুল্ম হয়ে, বসুন্ধরে, স্তন্য তোমার টেনেছি গো,
তারা হয়ে, নীলিমা, তোর বুকের দরদ জেনেছি গো।
চাতক হয়ে তোমায় আমি কাতর হয়ে ডেকেছিলাম,
পূর্ণিমা, তোর সুধার আদর চকোর হয়ে চেখেছিলাম।...
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি, জনম জনম যা দিয়েছ !
তোমার ডাকে চাঁদ আমারে টিপ দিয়ে যায় বরণ করি,
সাঁঝের প্রদীপ লয় মা আমার আলাই-বালাই হরণ করি।
পান্না ঝরে কান্নাতে মোর, মাণিক ঝরে হাস্যেতে গো,
লুকোচুরি খেলেন গোপাল কোমল কচি আস্যেতে গো।
জনম জনম মা হয়েছ—জনম জনম হবেও মা,
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার, তোমার কাজল, তোমার চুমা।

('মাতৃস্তোত্র', স্বর্ণসন্ধ্যা)

এই পল্লীবাংলার প্রতি প্রীতির আর এক রূপ, বাঙালী জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি প্রেম। এই প্রেমের পরিচয় 'বাঙালী' কবিতাটি—

শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গার এই দেশ
নব চেতনার করিয়াছে উন্মেষ।

বাঙালী জাতিই বাঁচাইবে এ ভুবন,
রণমুখী নয় হরিমুখী করি মন।
সুধাসত্রের সেই অধিকারী ভাবী,
সারা ধরণীর গুরুপদে তার দাবী।
ভালে দাও তার প্রথম হোমের টিকা,
গালে উষ্ণতা, সন্ধ্যাদীপের শিখা।

('বাঙ্গালী,' শ্রেষ্ঠ কবিতা

সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা' কবিতার ছায়াপাত হয়েছে এই কবিতায়। কিন্তু এখানে সত্যেন্দ্রীয় ছন্দোল্লাস ও কৌতূহল-প্রবণতাকে ছাপিয়ে উঠে প্রাধান্য লাভ করেছে কবির বৈষ্ণবীয় বিনয়-নম্র ভক্তি ও অনুরাগ।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের যে কটি 'সামান্য' লক্ষণ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি লক্ষণ : দেশানুরাগ ও ইতিহাস-প্রীতি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে এই প্রীতির সূচনা, কুমুদরঞ্জন করুণানিধান যতীন্দ্রমোহন কালিদাসে এর বিচিত্র প্রকাশ। কুমুদরঞ্জনের ভারত-সংস্কৃতির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ইতিহাস-প্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গভীর ভক্তি। এইখানে কুমুদরঞ্জন সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষা বড় কবি। সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা,' 'তাতারসির গান,' 'বারাণসী,' 'কবর-ই-নূরজহান,' 'তাজ' প্রভৃতি কবিতায় ছন্দোল্লাস, ইতিহাস-চেতনা ও কৌতূহল বড় হয়ে উঠেছে, ভক্তি সেখানে অপ্রধান। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের

কবিতায় ভক্তিই মুখ্য : 'জাগ্রত ভারত', 'আমাদের ভারত', 'ভারত-মহিমা', 'বাঙ্গালী' এবং 'সোমনাথ' সম্পর্কিত কবিতাগুচ্ছে ভক্তির সুরটিই প্রাধান্য লাভ করেছে, ইতিহাস-চেতনা বা ছন্দোল্লাস সেখানে গৌণ।

ভারতের মহান গাম্ভীর্যকে কবি আত্মসাৎ করেছেন ভক্তি দিয়ে—

অভ্রভেদী তুষারকিরীট, বিশাল হিমালয়,
আপন করা তাঁকে বড় সহজ কথা নয়।
দুর্নিরীক্ষ্য অদ্রি বিরাট, নাগাল পাওয়া ভার,
অন্ত না পাই তাহার রূপের, তাহার মহিমার।
আমরা তো সেই হিমগিরির হেরি রাজ্যশ্রী—
পার্বতী যার কন্যা এবং মেনকা যার স্ত্রী।...
মোদের শ্যামা চামুণ্ডা নন, তিনি তো নন ভীমা,
অন্নপূর্ণা তিনি যে, তাঁর স্নেহের নাহি সীমা।
করেন নাকো কেবল তিনি দৈত্যদলনই,
'কমলেকামিনী' তিনি গণেশজননী।
দশ হাতে দশ প্রহরণের রাখব খবর কি ?
আমরা দেখি কেবল মায়ের হাতের ঝিনুকই।

('আমাদের ভারত', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কবির দেশপ্রেম, ইতিহাস-চেতনা ও ভারত-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা শেষ পর্যন্ত ভক্তিতে পরিণতি লাভ করেছে সোমনাথ-সম্পর্কিত একাধিক কবিতায়। এগুলিতে ঐতিহাসিক রোমান্স-রসের আয়োজন আছে যথেষ্ট, কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কবিমানস

তাতেই সার্থকতা খোঁজে নি, সোমনাথদেবের প্রতি বিনম্র, ভক্তি-নিবেদনেই সার্থকতা চেয়েছে; তাই মেগাস্থিনিস, হিউয়েনসাঙ. বা অল্‌বিরুনির সোমনাথ-দর্শন-ভিত্তিক কবিতাগুলিতে নয়, 'সোমনাথ' শীর্ষক প্রণতিমূলক কবিতাটিতেই ভক্ত-কবিপ্রাণের সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করি—ভক্ত-কবির মানস-নয়নে সোমনাথের যে রূপটি প্রতিভাত হয়েছে, তাই কবির কাছে ইতিহাস অপেক্ষা সত্যতর হয়েছে। ব্যাকুল গভীর কণ্ঠে কবির নম্র নিবেদন ঃ

মিটিল না সাধ, হয়তো আমায় আবার আসিতে হবে,
সে মুরতি তব না দেখি যে মোর আঁখি উপবাসী রবে।

তব দেউলের প্রতি প্রস্তর ভাঙা
জানি প্রভু মোর রক্তে হয়েছে রাঙা।
অস্থি আমার পাষাণের চাপে পিষ্ট হয়েছে কবে।...

মনে পড়ে সেই নীলাকাশভেদী মন্দিরচূড়াগুলি,
স্বর্গসরণি দেখাইছে যেন বিধাতার অঙ্গুলি।

বিরাট দেউল শোভে ত্রয়োদশতল,
স্ফটিক-সোপানে আছাড়ে সাগরজল,
তীর্থযাত্রী হেরে বিস্ময়ে উর্ধ্বে নেত্র তুলি।

জম্বুনদের সুবর্ণে গড়া দুই শত মণ ভারি—
শৃঙ্খলে ঝোলে ঘৃত পরিপূর দীপের সারি।

চূড়ার উচ্চ হৈম কলসতলে,
তারকার মতো সন্ধ্যা হতে যা জ্বলে,
নাবিকেরা সব বন্দি' সে-আলো সমুদ্রে দেয় পাড়ি।

সোমনাথের অতীত বৈভব কবি ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে তৎসম শব্দ ও যুক্তাক্ষরের আঘাতে রূপায়িত করে তুলেছেন, শেষে কবি মানসনেত্রে সোমনাথদেবকে দেখে এই অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন :

হাজার বছর আগেকার সেই শুভদিন ফিরে আসে,
অনাগত সুর অনাগত রূপ শ্রবণে নয়নে ভাসে।
আসে সোমনাথ নাহি আর দেরি,
জ্যোতির্ময়ের জটার ছটা যে হেরি,
শতদল দশ শত বরষের ফুটে উঠে উল্লাসে।

এই ভক্তির চরমোৎকর্ষ ঘটেছে 'পুরীমন্দিরে' কবিতাটিতে। কবিতাটি কুমুদরঞ্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভক্তির আবেগে অশ্রুসজল কবিকণ্ঠ এখানে পুরুষোত্তম-বন্দনায় নিয়োজিত। এখানে ভাবের প্রেরণা ভক্তিপথে একাগ্র ও গভীর রূপ লাভ করেছে, এবং নির্দোষ বাণীলাবণ্যে কবিতাটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কুমুদরঞ্জন ভাবপ্রকাশে একটি মাত্র অলংকার ব্যবহার করেন, তা উপমা ; এই কবিতায় উপমার অতিশয় সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করি। ক্লান্ত অশ্রুসিক্ত ভক্ত-হৃদয় আজ বিনম্র-চিত্তে পুরুষোত্তমদেবের কাছে বিদায় ভিক্ষা করছে। ছন্দে, শব্দযোজনায়, চিত্রাঙ্কনে ও উপমাপ্রয়োগে কবিতাটি নির্দোষ। কবিতাটি পড়তে গিয়ে ভক্তিনম্র অশ্রুসজল কবিমানসের রূপটি পাঠকচিত্তে ভেসে ওঠে—

বিদায় হৃদয়রাজ,
নয়নের জলে কাঙাল যাত্রী—বিদায় মাগিছে আজ।

লয়ে অতি ক্ষীণ ভকতির কণা
বহুদূর হতে এসেছে এ জনা,
ভবনে তোমার ঠাঁই দিলে প্রভু হরিলে সকল লাজ।

মন্দিরবায়ু শত ভকতের ভরা অনুরাগ মাখা।
ভকতি-নম্র অক্ষয়বট ছায়াময় তারি শাখা,
তৃষিত অযুত আঁখির আলোক,
ভকত-হিয়ার অধীর পুলক—
দেবতা-চরণ-চিহ্নিত পথ মরমে রহিল আঁকা।…

রাখিয়া গেলাম আঁখির পিয়াসা আরতির দীপে তুলি।
হিয়ার ভকতি রাখিয়া গেলাম পাদ্য-সলিলে গুলি।
মিশায়ে গেলাম বিদায়ের ক্ষণে
কাতর কামনা পথধূলি সনে,
তোমার প্রসাদে ভিখারীর আজ পূর্ণ হয়েছে ঝুলি।

কবিমানসের ভক্তি ও কাব্যপ্রেরণার রমণীয় পরিণয় এই কবিতায় সাধিত হয়েছে। এখানেই কুমুদরঞ্জনের প্রতিভা জয়যাত্রার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

কুমুদরঞ্জনকে শাক্ত-কবি, বাউল-কবি, বৈষ্ণব-কবি, পল্লী-কবি প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। আমার মনে হয়, এই ভক্তিনম্র কবিমানসের মধ্যেই এই সব আখ্যা রয়েছে। কবিশেখর কালিদাস রায় যথার্থই বলেছেন, "কুমুদরঞ্জনের কবিতারচনা দেবার্চনার মতো।"

॥ ৫ ॥

কুমুদরঞ্জনের এই পল্লীপ্রীতির অপর দিকে বাঙালীজীবন-প্রীতি। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অপর একটি সামান্য লক্ষণ—গার্হস্থ্যজীবনচিত্রণ। উনিশ শতকে সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী প্রমুখ কবিরা নবজাগ্রত রোমান্টিক দৃষ্টিতে বাঙালীগৃহস্থ-জীবনে নোতুন সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিলেন। বিশ শতকে তারই অনুস্মৃতি লক্ষ্য করি কিরণধন, রমণীমোহন, পরিমলকুমার, যতীন্দ্রমোহন, কালিদাস এবং কুমুদরঞ্জনের কবিতায়। দাম্পত্যরস, বাৎসল্যরস, সখ্যরস ও মধুররসের বিচিত্র উপস্থিতি ঘটেছে কুমুদরঞ্জনের এই শ্রেণীর কবিতায়। এখানে যে কবিদৃষ্টি দেখা গেছে, তা শৈশবসারল্য-মণ্ডিত বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি—রোমান্টিকতার প্রথম ধাপের দৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে কুমুদরঞ্জন সাফল্য লাভ করেছেন অকপট সারল্যের জোরে। 'অজয়', 'বীথি', 'একতারা', 'স্বর্ণসন্ধ্যা' প্রভৃতি কাব্যে অতিশয় গভীর অথচ সরল হৃদয়ানুভূতির অনুরাগরঞ্জিত গার্হস্থ্য-চিত্রগুলি পাই।

দাম্পত্যের সুন্দর চিত্র ঃ

নয়নে পড়েছে মৃত্যু-কালিমা
দেরি নাই বেশী আর,
মোর পানে প্রিয়া তুলিল বারেক
করুণ নয়ন তার।

অঞ্চলে বাঁধা চাবি-রিং তার
দিল মোর পদতলে
শুভদৃষ্টির দুই জোড়া আঁখি
ভরিয়া উঠিল জলে।...
বিজন দুপুরে উদাসী পরাণ,
হাতে নাই কোনো কাজ—
বাক্সটি তার কাছেতে আনিয়া
খুলিয়া দেখিনু আজ।
রহিয়াছে সেই আশীর্বাদীর
ইয়ারিং একজোড়া,
ঠাকুমার দেওয়া প্রাচীন ঝুম্‌কা
লাল কৌটায় ভরা।...
তারি সাথে আছে চিঠি এক তাড়া
অনেকদিনের লেখা—
নব-অনুরাগ-রঞ্জিত লিপি
আজ পড়িতেছি একা।
পড়ি আর কাঁদি কত শরতের
গত-উৎসব স্মরি,
ঝরা শেফালির আলিঙ্গনের
আমেজ রয়েছে ভরি।
ছোট ছোট কথা, ছোট দুখ-সুখ
গাঁথা আছে তার সাথে,
ফুলশয্যার শুষ্ক কুসুমে
অতীত সুরভি রাজে।

যৌবন হেথা বাঁধা পড়িয়াছে—

*   *   *

দেখে মনে হয় ভুল,
কুড়ানো উপলে পাই যে আবার
ঝরণারি কুল-কুল।

('শেষদান', অজয়)

গত বসন্তের জন্য আজ প্রৌঢ় হেমন্তের বিলাপ এই কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। প্রৌঢ় কবিচিত্তের দীর্ঘশ্বাস যেন সামান্য প্রয়াসেই শুনতে পাওয়া যায়।

গার্হস্থ্যজীবনের সুন্দর চিত্র পাই 'ফুল-ঝুমকা' কবিতাটিতে। স্মিতহাস্যে কবি তাঁর বৃদ্ধ প্রমাতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহের যৌবনচাপল্য স্মরণ করছেন ; সেই অতি বৃদ্ধ যে তাঁর প্রিয়ার জন্য ফুল-ঝুমকা গড়িয়েছিলেন, তা আজ উত্তরাধিকারসূত্রে কবির হাতে এসেছে ; সেটি হাতে নিয়েই কবির এই চিন্তা। স্নেহমণ্ডিত গৃহস্থজীবনের সেই দূর শান্তিনিকেতনের দিকে তাকিয়ে আজ আমাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। বোধ করি সে জীবনের সাক্ষ্যরূপেই এই কবিতাটি থেকে যাবে। কবিতাটি এত সুন্দর যে উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য ঃ

আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ,
কটকে ছিলেন নিমক-দেওয়ান, চাকুরি কষ্টসহ।
অর্থ প্রচুর, সম্মান বড়—কাজেই প্রিয়ার তরে,
মুকুতা-দোলানো ঝুমকা গড়ান স্বর্ণকারের ঘরে।

প্রতি মুক্তাটি সুন্দর খাঁটি, নিটোল চমৎকার,—
দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন নিশ্চয় প্রিয়া তাঁর।
তার পর গেছে সুদীর্ঘকাল প্রীতির বারতা বহি,
সে ফুল-ঝুমকা পেলেন ক্রমেতে সে যে মোর মাতামহী.
বহু ঝঞ্চাট অভাব গিয়াছে তাহার উপর দিয়া—
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ছয়টা মেয়ের বিয়া ;
ঝুমকা তবুও অটুট রয়েছে বন্ধক হতে ফিরি,
স্বর্গবাসিনী আত্মীয়াদের প্রেম আছে তারে ঘিরি।
যুগের যুগের নবীন বধূর রাঙা ঘোমটার ঘামে
প্রেমের জ্যোৎস্না, প্রীতির সরিৎ বক্ষে তাহার নামে।
প্রণয়-ব্যবসা করিতে করিতে সে পেয়েছে বুঝি প্রাণ,
অতীত প্রেমের নির্মাল্য সে—কুল-দেবতার দান।
ঝুমকা জোড়াটি যৌতুক পেলে পরিশেষে মোর প্রিয়া,—
শত বাসন্তী ফুলের পরশ আদর সোহাগ নিয়া।
এখন হয়েছে আবার রঙিন কৌটায় তার ঠাঁই,
স্বর্গবাসীর স্বর্ণ-মরাল, তুলনা তাহার নাই।
ফুল-ঝুমকায় মোদের প্রণয় যাইতেছি যথ দিয়া—
অংশ লভিয়া হাসিবে মোদের নাতির নাতির প্রিয়া ॥

('ফুলঝুমকা', স্বর্ণসন্ধ্যা)

বোধ করি বর্তমান কালের তরুণতরুণীদের এটি উপঢৌকন দিয়ে কবি বিদায় নিলেন।

॥ ৬ ॥

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্যসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিয়েছি। ঐতিহ্যপ্রেমী, হৃদয়ানুভূতি-বিশ্বাসী, ভক্ত

কবিহৃদয়ের যে পরিচয় দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীব্যাপী কাব্যসাধনায় ছড়িয়ে আছে, তা কবি সম্পর্কে একটি উঁচু ধারণা গড়ে তুলতে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। নাগরিক জীবন ও সমাজ-বিক্ষোভ থেকে দূরে শান্তির নীড় গ্রাম থেকে কুমুদরঞ্জন তাঁর একতারায় যে কাব্যসুর ঝঙ্কৃত করেছেন, তাতে কোন খাদ নেই, সে সাধনায় কোথাও ফাঁকি বা কপটতা নেই। দরদ, প্রীতি, গভীর আন্তরিকতা ও অকপট সারল্য—এই ক'টিকে পাথেয় করে কবি কুমুদরঞ্জন যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, আজ তা সমাপ্তির মুখে। কবি যে কখনও সংশয়ের দ্বারা পীড়িত হন নি, নৈরাশ্যের দ্বারা অভিভূত হন নি, তা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তিনি একটি শান্তির আশ্রয় পেয়েছিলেন, যা তাঁকে বাইরের সমস্ত বিক্ষোভ ও হতাশা থেকে রক্ষা করেছে। বাংলা কাব্যসংসারে যে ধারাটি এই বর্ষীয়ান কবির সঙ্গে সমাপ্ত হতে চলেছে, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করাতেই বোধ করি এঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হবে।

ভক্তকবি কুমুদরঞ্জন তাঁর কাব্যসাধনার সার্থকতা কোথায়, এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কটি কথায়—

ফোটার পুলক স্মরায় ঝরার ব্যথা,
ফুল চায় তার ফোটার সার্থকতা।
সে খোঁজে না কোথা আছে মুক্তির চাবি,
কেবল পূজার অধিকার করে দাবি,
দেবতা তাহার যেথা আছে যায় তথা।

('পূজা', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এই পৃথিবীকে, সমাজ ও সংসারকে প্রীতির দৃষ্টিতে কবি দেখেছেন। কবি ঘোষণা করেছেন, আনন্দময় এই ভুবনে কাব্যসাধনার দীপখানি জ্বেলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপে এই রূপকে আরতি করাতেই কাব্যসাধনার সার্থকতা—

ভুবন আমার অমৃতসিক্ত শুধু আনন্দ আলোকের,
ক্ষীর নবনীর অবনী সে মোর আমার ধরণী বালকের।
সোনার নূপুরে গুঞ্জরে যেথা বাজে রয়ে রয়ে বাঁশরী,
সব দুখ মোর সুখ মনে হয় সব ব্যথা যাই পাসরি'।
লিখি হিজিবিজি কি পাই তাহাতে? বন্ধু কহিব
কিবা আর?—
সেই সুখ পাই, রামধনু আঁকি' উপজে যে সুখ বিধাতার।
('কবির সুখ', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

রোমান্টিক কাব্যসাধনার প্রাথমিক শৈশব-সারল্য ও বিস্ময়-বিস্ফারিত প্রকৃতিপ্রেমী দৃষ্টি নিয়ে কবি কুমুদরঞ্জন এই ভুবনকে দেখে গেলেন, এখানে তারই আনন্দময় স্বীকৃতি।

দুটি নয়ন মেলে ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে কবি কুমুদরঞ্জন এই সংসারকে দেখে গেলেন, যাবার আগে একটি নম্র নিবেদনে কবিহৃদয়ের অন্তিম কামনাটি প্রকাশ করেছেন:

হয়তো আমার এ-পথে আর হবে নাকো আসা
দু ধারে যাই রোপণ করে বুকের ভালবাসা।
ধূলার এ-পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে,
অমর করে যাই রেখে যাই ক্ষণিক কাঁদাহাসা।

সরায়ে দিই পথের কাঁটা, ছড়ায়ে যাই ফুল,
নিকায়ে যাই স্নেহের বেদী ছায়া-তরুর মূল।
মমতা মোর পথের কীটও
পায় যেন হায় পায় যেন গো,
বন-বিহগের কণ্ঠে আমার অমর হউক ভাষা।...
জানি নে এ মানব-জনম আবার পাব কিনা?
নিরুদ্দেশের যাত্রী রাখি প্রণয়-রাখীর চিনা।
অনুভূতির ছিন্ন সত্র
যাই রেখে যাই যত্র তত্র,
পারবে না যা করতে পরশ কালের কর্মনাশা।
হয়তো কারও হরবে ক্ষুধা আমার তরুর ফল,
স্নিগ্ধ কারও করবে দেহ অশ্রু-দীঘির জল।
ঝরা ফুলের গন্ধে ওরে
হয়তো কেহ স্মরবে মোরে।
ভাবুক-পথিক বলবে হেসে লোকটা ছিল খাসা।

('হয়তো', অজয়)

প্রকৃতিপ্রেমী কবির এই আশা ব্যর্থ হবে না, এ আশ্বাস বাঙালী পাঠকবর্গের পক্ষ থেকে কবিকে দিতে পারি।

কবি কুমুদরঞ্জনের অকপট সারল্য ও অনুভূতির, মমতা ও প্রীতির আশ্রয়স্থল যে কবিচিত্ত, তার এই শেষ কামনা আপন কাব্যসাধনাতেই পরম সার্থকতা লাভ করেছে।

সপ্তম অধ্যায়

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে রবীন্দ্র-প্রতিভার সৃজনী পর্বে একটিমাত্র কবিতার বই প্রকাশ করে যিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তিনি কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১)। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম 'নতুন খাতা' (প্রথম প্রকাশ : ১৯২৩)।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজে তিনি অন্যতম। কাব্যক্ষেত্রে তিনি দেখা দেন 'ভারতী' গোষ্ঠীর কবি হিসেবে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাব্যসংসারে তিনি প্রীতিভাজন সহমর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন এঁদের—কালিদাস রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, চারু রায়, গিরিজাকুমার বসু, সুনির্মল বসু। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে তিনি ভারতী, বঙ্গবাণী, বিজলী, মানসী ও মর্মবাণী, উত্তরা, মৌচাক ও যাদুঘর পত্রিকায় কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কবিতার সংখ্যা বেশি নয়—শতাবধি। তবু এর জোরেই তিনি কাব্যসংসারে স্থায়ী আসন পেয়েছেন।

কাব্যক্ষেত্রে তাঁর আগমন কতকটা আকস্মিক ও প্রস্তুতি-হীন। পত্নীবিয়োগ-আঘাতে কিরণধন কবিতা লিখতে সুরু করেন (১৯২০) এবং মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৩১) লেখা চালিয়ে যান। মাত্র দশ বছরের কাব্যসাধনায় শ' খানেক কবিতা তিনি বঙ্গবাণীর মন্দিরে উপস্থিত করেছেন, রসিক পাঠক তাতেই মুগ্ধ হয়েছেন, তার প্রমাণ 'নতুন খাতা'র তৃতীয় সংস্করণ (১৯৫২ ঃ সম্পাদনা—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র)।

কিরণধন রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্যতম কবি বটেন, কিন্তু তাঁর স্বতন্ত্র ভূমিকা অনস্বীকার্য। কালিদাস-কুমুদরঞ্জন-করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহন যে রকম পল্লীকবি, তিনি তা নন। তাঁর কাব্যপ্রেরণা উপরোক্ত কবি-চতুষ্টয়ের মত প্রাচীন কাব্য-সংস্কার ও পল্লীগ্রামকে ভিত্তি করেনি। তিনি মুখ্যত নাগরিক কবি। তৃতীয় দশকের কর্মমুখর কল্লোলিত কলকাতার কবি। বরং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। কয়েকটি কবিতায় শব্দচিত্রণে ও লঘু দ্রুতলয়ের ছন্দ প্রয়োগে কিরণধন নিশ্চিতভাবে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'স্মরণে' কবিতাটি। সত্যেন্দ্রনাথের লোকান্তর-প্রাপ্তি এই কবিতার উপলক্ষ্য। সেখানে কিরণধন সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে বলছেন ঃ

সত্যি, ওগো সত্যি তুমি ভেল্কি-বাজি লাগিয়ে দিলে,
শব্দ নিয়ে খেল্‌লে ছিনিমিনি,
কি বিচিত্র সুরে ছন্দে নাচিয়ে দিলে বাংলা ভাষায়!
তোমার কাছে রইল চির-ঋণী।

অবশ্য কিরণধন যে সমকালীন দেশ-জাতি-সমাজ-রাজনীতি নিয়ে কবিতা লেখেন নি, তা নয়। 'বেশ্যা', 'সভ্যতার প্রতি', 'দুনিয়াদারি', 'ডাকাতের গান,' 'বাহবা বেড়ে', 'ভিখিরি', 'বাংলায় খদ্দর', 'নতুন খাতা' কবিতাগুলি তার পরিচয়। কিন্তু কিরণধন সংগ্রামের, বিক্ষোভের, নৈরাশ্যের কবি নন। সমকালীন দেশ ও কালকে যে তিনি উপেক্ষা করেন নি, তার প্রমাণ হিসেবে এই কবিতাগুলি উপস্থিত করা যায়। এখানে তাঁর সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে, কবিস্বরূপটি প্রকাশিত হয় নি।

॥ ২ ॥

তবে কোথায় কিরণধনের যথার্থ পরিচয়?

কিরণধন প্রধানতঃ দাম্পত্য প্রণয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কবি। পত্নী বিয়োগের আঘাতে তিনি কবিতা লেখা সুরু করেন। বাঙালী গার্হস্থ্যজীবনের শান্ত ছবি কিরণধনের হাতে শৃঙ্গাররসরূপ লাভ করেছে। এখানেই কিরণধনের যথার্থ পরিচয়।

আটপৌরে ভাষায় ঘরোয়া মিষ্টি পরিবেশে সৃজনে কিরণধন দক্ষ ছিলেন। দ্রুতলয়ের ছড়ার ছন্দে গার্হস্থ্য-জীবনের মান অভিমান প্রকাশে তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। পত্নীবিয়োগবিধুর কবির এই রূপটি বড় মনোহর। কিন্তু কোথাও তিনি কাব্যোচিত সংযম ও সুরুচির গণ্ডী লঙ্ঘন করেন নি। এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বগামী হিসেবে তিন জনের নাম করতে পারি: অক্ষয়কুমার বড়াল,

গোবিন্দচন্দ্র দাস ও মোহিতলাল মজুমদার। গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'সারদা ও প্রেমদা' কবিতায় কবি সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' কাব্যে পত্নীবিয়োগ বেদনা অসহ্য হাহাকারে ও দার্শনিক অনুধ্যানে মুক্তি লাভ করেছে। আর মোহিতলালের 'বাঁধন' দাম্পত্যমিলন-প্রেমের গাঢ় সংহত রূপটিকে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যে যে বেদনা প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনা এখানে না করাই ভাল, কেননা সে সংযত কাব্যরূপ দুর্লভ। কিরণধন দাম্পত্যপ্রণয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কবি। দাম্পত্যমিলনসুখ ও বিচ্ছেদবেদনাকে কত মধুর, কত বিচিত্র, কত সুন্দর রূপে প্রকাশ করা যায় তার প্রমাণ কিরণধনের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি ('আব্দারের আধঘণ্টা', 'যদি সে', 'উড়ো চিঠি', 'আব্দারের বেড়ি', 'ব্যথার স্মৃতি', 'ব্যথার ভুল', 'ভারি নিষ্ঠুর', 'ভুলে গেছি প্রিয়া', 'বিরহে', 'চাঁদের আলোয়', 'ভাল লাগে বলে')।

দাম্পত্যপ্রণয়ভিত্তিক এই কবিতাগুলি বাংলা কাব্যসংসারে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। ব্যক্তিগত সুখস্মৃতি সর্বজনীন চরিত্র লাভ করেছে। মিলনস্মৃতি স্থায়ী বিচ্ছেদবেদনায় কারুণ্যসচেতন হয়ে উঠেছে। আত্মকথা বলতে গিয়ে কিরণধনের প্রায়ই আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে। তাঁর সাফল্যের রহস্য এখানেই। কল্পনা অপেক্ষা লঘু পরিহাস, গাঢ়বন্ধ প্রকাশ অপেক্ষা নিরলঙ্কার প্রকাশ, ধীর লয়ের ছন্দ অপেক্ষা দ্রুতলয়ের ছড়ার ছন্দের হালকা সুরের প্রাধান্য এখানে লক্ষ্য করা যায়। কতকগুলি

কবিতায় প্রণয়িণীর স্বগতোক্তি ভঙ্গিতে, কয়েকটিতে প্রৌঢ় প্রণয়ীর সংযত বেদনা-উচ্ছ্বাসে, অন্য কয়েকটি সখী-সান্নিধ্যে অকুণ্ঠ সুখস্মৃতি আলাপনে, আবার কখনো বা পতি-পত্নীর আলাপে দাম্পত্যপ্রেমরস কবি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কবিতানিচয়ের আবেদন সর্বজনীন বলেই আজো তা জনপ্রিয় হয়ে আছে। এই কবিতাগুলির আবেদন এতো আন্তরিক ও গভীর, অকপট ও মনোহারী যে তিরিশ বছর পরেও তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বস্তুত, কিরণধনের পরিচয় এখানেই। যে কবিতাটি জনপ্রিয়তম, তা 'আব্দারের আধঘণ্টা'। বিশ শতকের কাব্যপাঠক অবশ্যই এই চরণগুলির সংগে পরিচিত :

বেল-ফুল চাই না,
        জুঁই ফুল দাও!
ও গানটা গেও না,
        এই গানটা গাও!
কেন ভালবাসলে
        বল—বল না;
হাস্‌লে কেন তুমি?
        —কথা কব না!

*   *   *

চাঁপা-ফুল চাই না,
        দাও বেল-ফুল;
খোঁপা থেকে ঝরে পড়ে'
        গেল বিলকুল!

কুড়িয়ে সব কাঁটা
পরিয়ে দাও ;
আবার না ব'লে তুমি
গালে চুমা খাও !

আমি মরে গেলে তুমি
খুব কাঁদবে ?
তখন এ বাহু-ডোরে
কারে বাঁধবে ?

ওকি, ওকি, চোখ থেকে
পড়ে কেন জল ?
মরে কেন যাব আমি—
মিছে করি ছল !

জুঁই, বেল, চামেলি—
যা খুসি তা দাও,
ও-গালেতে চুমা খেলে
এ গালেতে খাও !

এই প্রণয়োল্লাস ক্ষণস্থায়ী ; এর পরই প্রৌঢ় বিরহীর চাপা বেদনা প্রকাশ পেয়েছে 'যদি সে' কবিতাটিতে ;

যদি সে ফিরে এসে   আবার ভালবেসে,
আমার মুখপানে চায়
পুরোনো দুটো কথা   গোপন মন-ব্যথা
আমার কানে কয়ে যায়।

কিন্তু না,—

বৃথা এ মনে আশা সে জন ফিরে আসা
পিপাসা পড়ে রবে খালি৽!
মলিন চিতা-ধূমে কঠিন মরুভূমে
কেবলি বালি আর বালি !
পাখি না গাহে গান চাঁদের আলো ম্লান
কুসুমে পরিমল নাই !
দখিনে বাতাসেতে আর না উঠি মেতে
উড়িছে ছাই আর ছাই !

প্রৌঢ় বিরহীর উদাস কণ্ঠ ধ্বনিত হয় ঃ

চিঠি-বিলি-করা ডাক-হরকরা চলে যায় সরাসর ঐ,—
উদ্বেগ-মাখা-পথ-চেয়ে থাকা বুকে-করে রাখা চিঠি কৈ ?
মরণের পর নেই ডাকঘর, নইলে খবর নিত সে ,
এটি-উটি-সেটি লিখে চার-পিঠই একখানা চিঠি দিত সে ;
সেই এক সুর—আমি নিঠুর, বিদেশী বঁধুর লাগিয়া,
তার মত কৈ ভেবে সারা হই, নিশি দিন রই জাগিয়া ?
একি জাল-বোনা হায় কল্পনা ! মনে আল্পনা আঁকা গো !
মরি কত ছলে স্মৃতিশতদলে ধুয়ে আঁখি জলে রাখা গো !

('ব্যথার স্মৃতি')

॥ ৩ ॥

কিরণধন কেবল এই বিরহ-আলাপেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নি ! দেশ-কাল-সমাজের প্রতি ফিরে তাকিয়েছেন, তীব্র কটাক্ষ ও ব্যঙ্গের চাবুক কষিয়েছেন ভণ্ড ও অত্যাচারীর উপর

বাঙালির আন্তরিকতার অভাবের প্রতি কবির কটাক্ষ উপভোগ্য ঃ

স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজী,
তোরা স্বধু তাই বক্তৃতা কর্‌ বাংলা এবং ইংরিজি। ('বাংলায় খদ্দর')

আবার, ইংরেজ-প্রদত্ত সুবিধার প্রতি তীব্র কটাক্ষ ঃ

খুসী হয়ে তাই যা পাও তা নাও,
সদা উহাদের জয়গান গাও,
দেখেছ কখনো ভিখিরি কোথাও
কাঁড়া কি আঁকাড়া বাছে?
মণ্টেগু তবু সরেশ বালাম
দিয়েছে মোদের ছাঁটা ও মোলাম
আমাদের মত নিমক-হারাম
আর কি কোথাও আছে? ('বাহবা বেড়ে')

মেকি সভ্যতার প্রতি ধিক্কার ঃ

দল বেঁধে আর কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে সবাই লাগো
দেশের কাজে সমাজ-হিতের ব্রতে,
ধর্মে বেজায় গ্লানির মাত্রা উঠচে বেড়ে দিনে দিনে,
রহিত করতে সেইটে কোনো মতে—
গলাবাজী কলমবাজী এই দুটো কাজ মিলে-মিশে
চালাও কসে আচ্ছা করে জোরে;
নেপথ্যে ও অন্তরালে যা প্রাণে চায় করে যেও
কে আর দেখছে আগল ঠেলে ঘরে! ('সভ্যতার প্রতি')

মাতাল, চাঁড়াল, জেল-খালাসী, পকেট-মার, খুনী ডাকাত, ফুর্তি-বাজ, মুর্গি-খোর, বিলেত-ফের্তা—সবাইকে কবি বুকে

টেনে নিয়েছেন; ভণ্ড বক-ধার্মিক ধনীদের বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে ডাক দিয়েছেন :—

আজকে আমার নতুন খাতা,
তোমাদের ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা। (নতুন খাতা)

॥ ৪ ॥

কিন্তু কিরণধনের কবিস্বরূপটি এখানে সত্যরূপে প্রকাশ লাভ করে নি। তার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হয় দাম্পত্য-প্রেমের ও বাৎসল্য রসের কবিতা-ক্ষেত্রে।

ছোটদের জন্য কিরণধন 'মৌচাকি', 'যাদুঘর', 'রংমশাল' প্রভৃতি পত্রিকায় নানা কবিতা লিখেছেন। 'নতুন খাতা'য় 'পারুল চাঁপা', 'মায়ের বিপদ', 'দস্যি', 'ভাইবোন', 'বোনে বোনে', 'খোকার ব্যথা', 'নাতির প্রেম', 'ঘুমপাড়ানি গান', 'কমলানেবুর দেশে', 'নামকাটা সেপাই' প্রভৃতি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলির তরল ক্ষিপ্র ছন্দে, কৈশোরের ভাবনা প্রকাশে কবি কিরণধন একটি শিশু-জগতের দ্বার খুলে দিয়েছেন।

মনে পড়ে সেই ''দস্যি' কবিতার পিয়ানো-সুরের চরণগুলি :

অস্থির চঞ্চল,
একটুতে চোখে জল,
মাধুরীর শতদল
বুক-জুড়ানো!

চুম্বন-উৎসুক
ঠোঁট লাল টুক্-টুক্,
দুষ্টুমি-মাখা মুখ
হাসি ছড়ানো !

এ-রকম দস্যিকে
সামলাবো কোন্ দিকে ?
লুটে নিলে মনটিকে
জোর্‌সে এসে !

তবু সেই মনচোরে
ভালবাসি অন্তরে,
জানিনে কি মন্তরে
ভোলালে যে সে !

আবার 'খোকার ব্যথা'র স্নেহকাতর সুর :

ঠাকুরমা তুই সত্যি করে বল—
মাকে কি মোর পরী এসে
উড়িয়ে নিল চাঁদের দেশে ?
একি কেন ফেলিস চোখে জল ?
আমি তখন ছোট ছিলেম,
ঘুমিয়ে ছিলেম ঘরে,
তুই গেছলি গঙ্গাস্নানে
দেখলি এসে পরে—
যেখানকার যা সবই আছে তাই
মা-টি আমার নাই !

এই সব কবিতায় কিরণধনের স্নেহকাতর পিতৃহৃদয়ের আন্তরিক পরিচয়টি ধরা পড়েছে।

কবি যে সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ও 'ভারতী'র মজলিসে আড্ডা জমিয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'দস্যি', 'কমলানেবুর দেশে', 'ঘুমপাড়ানি গান', 'সুখের সাহারা', 'নিদ্রাহীনের স্বপ্ন' কবিতাগুলিতে। ছোট ছোট শব্দচিত্র দিয়ে একটি সম্পূর্ণ ছবি কিরণধন এগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। সত্যেন্দ্রীয় দ্রুতলয়ের ছন্দে, টুং-টাং পিয়ানো-সুরে, lilting music সৃষ্টিতে কিরণধন দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম কবিতা 'নিদ্রাহীনের স্বপ্ন'-এ এই পরিচয় পরিস্ফুট। নিদ্রাহীন কবির জাগর স্বপ্ন—উষার বর্ণনা :

ও কাদের মেয়ে
গগন পরে
পা দুটি ছড়িয়ে
আল্‌তা পরে ?
—রক্ত কমল
চরণ ছুঁয়ে
জরির আঁচল
লোটায় ভুঁয়ে !
কে যায় অদূরে
সেঁকরা কালো !
মই ঘাড়ে উড়ে
নেবায় আলো।

মোড়ের মাথায়
জলের কল,
কান-মলা খায়
অনর্গল।

এই টুং-টাং সুরের ছন্দ স্বতই সত্যেন্দ্রনাথের 'পাল্কি-চলার গান' মনে পড়িয়ে দেয়। মিলের জন্য কিরণধনকে কখনো ভাবতে হয় নি। খাঁটি কথ্য ভাষার ঢঙে দ্রুত লয়ের চার মাত্রার ছন্দে তিনি হাল্‌কা ও চটুল, করুণ ও বিধুর, সরস ও মধুর—সব কথাই সহজ আন্তরিকতায় ধরে দিয়েছেন।

কিরণধন 'আঁখিজলে স্মৃতিশতদল'কে ধুয়ে নবীন করে উপস্থিত করেছেন, 'ব্যথার স্মৃতি চন্দনে মনের আল্‌পনা' এঁকেছেন, দাম্পত্য প্রেমের বিচিত্র লীলাকে মধুর ও গভীর করে দেখিয়েছেন। বাঙালি কাব্যপাঠক এই কারণেই কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়কে মনে রাখবে।

দাম্পত্যপ্রেম, বাৎসল্য—এই দুই রসের সমন্বয়ে রচিত ও রোমান্টিক বাতাবরণ-সমৃদ্ধ 'ঘুমপাড়ানি গান' কবিতাটিতে কবি কিরণধনের বৈশিষ্ট্য চমৎকার প্রকাশ লাভ করেছে। তার সঙ্গে ছড়ার ছন্দ ও পিয়ানো-সুরে কবির স্বাভাবিক দক্ষতাও প্রকাশ পেয়েছে। সবদিক বিচারে এটি কিরণধনের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা। কী অনায়াস নৈপুণ্যে কবি ফেলে-আসা শৈশবমোহে প্রত্যাবর্তন করেছেন ঃ

নীল আকাশে কাঁপন তুলে অলস সুরে ঐ
ডাক্‌ছে পাখী, 'ফটিক জল'—'ফটিকজল' কৈ ?

আতা-গাছে তোতা পাখী, ডালিম গাছে মউ ;
ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে লিখছে চিঠি বউ ;
মনের মতন হয় না চিঠি, দেড়টা বেজে যায়,
মা'র বুঝি ঐ খাওয়া হলো,—চম্‌কে ফিরে চায়।
ঘুম-পাড়ানে সুরের টানে যাচ্ছি কোথা ভেসে ;—
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে।

এই শৈশবস্বপ্নমোহে স্মৃতির ভেলা ভাসিয়ে কবি স্বচ্ছন্দে পৌঁছে গেছেন। বলেছেন ঃ

হারিয়ে গেছে কোথায় আমার হট্টমালার দেশ—
আদর স্নেহ শৈশবেরই স্বপ্ন-অবশেষ।......
নতুন করে লাগচে কানে পুরোনো সুর এসে,—
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে !

নিজের শৈশব থেকে কবি এবার সন্তানের শৈশবে পৌঁছেচেন.

এমনিতর দুপুর-বেলা গাইত যে মোর প্রিয়া
ঘুম-পাড়ানি হাজারো গান খোকায় কোলে নিয়া,
বাজ্‌তো দু'টি সোনার চুড়ি ঝিনিক্ ঝিনি ঝিন্—
তেমনিতর মিষ্টি গান শুনিনি কোনোদিন !
সে মোর প্রিয়া নাহিক আজ, নাহিক সেই গান ;
কাঁদচে দুটি আকুল শিশু—আকুল দুটি প্রাণ !
আর কে তাদের ঘুম পাড়াবে ভুলিয়ে ভালোবেসে ?
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে !

শেষে সন্তানের দুঃখ ও নিজের দুঃখ একত্র মিলেছে ঃ

ঘুমোয় ছেলে, জুড়োয় না'ত বুক—
পড়ছে মনে একশোবারি হারিয়ে যাওয়া মুখ !

আকাশ থেকে চাঁদকে ডেকে আর কে ধরে দেবে ?
দুধ খাইয়ে পরিয়ে কাজল আর কে কোলে নেবে ?
যৌবনেরও সোনার পুতুলখেলা না শেষ হতে
খোয়া গেল, শূন্য হৃদয় ফিরছি পথে-পথে !
আঁধার হেরি চার দিকেতে খুঁজি না পাই দিশে—
বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে, খাজ্‌না দেবো কিসে ?

বাঙালি গৃহস্থজীবনের এই সুখস্বর্গ থেকে বাংলা কাব্য-সংসার আজ সরে এসেছে। কবি কিরণধন সেই হৃত স্বর্গ-রাজ্যের কবি। সেই স্বর্গরাজ্যের কথা কি আর কখনো আমাদের মনে পড়বে না ?

কিরণধন অজস্র কবিতা লেখেন নি। এইজন্যে তাঁর কবিতার নোতুনত্ব ও বাক্‌ভঙ্গির মৌলিকতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। কিন্তু কাব্যক্ষেত্রে তাঁর একাধিক অনুসারক আছেন বলে আমার ধারণা। দাম্পত্য-জীবনের প্রেমোল্লাস প্রকাশে যে ঘরোয়া সুর ও রীতির আমদানি তিনি করেছিলেন, মহিলা-কবি অপরাজিতা দেবীর কবিতায় তার প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, কাব্যে রাজনীতি-বোধ ও সমাজচেতনার যে স্বাক্ষর রেখেছেন, উত্তরকালের একাধিক কবিকে তা প্রেরণা দিয়েছে কিনা, তাও বিচার্য।

অষ্টম অধ্যায়

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

॥ ১ ॥

সচেতন আত্মদ্রোহী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্যে, ঋজু দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং বক্র মন্তব্যে বিশিষ্ট। তাঁর কাব্যপাঠে প্রথমেই যে কথা মনে হয়, তা এই কথাই। তবে তাঁকে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্তর্ভুক্ত করার কি কারণ থাকতে পারে? সহজ সৌন্দর্যোপভোগের সরণিতে তিনি পদক্ষেপ করেন নি, মুগ্ধললিত গানে শ্রুতিকে ভরিয়ে তোলেন নি, প্রকৃতির রূপমোহে ধ্যানাবিষ্ট হন নি। তাই তাঁকে এই কবিসমাজের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কি না, এ প্রশ্ন বিচার্য।

যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-কালটি বিচার করলেই তাঁর প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, আত্মদ্রোহ, দুঃখ ও ব্যঙ্গপ্রবণতার মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে যতীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন। তখন রবীন্দ্র-প্রতিভা মধ্যাহ্ন-গগনে এবং রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাবে বাংলা কাব্যজগৎ আচ্ছন্ন। রবীন্দ্র-নেশায় বুঁদ হয়ে তখনকার কবিরা সৌন্দর্যসুধাকে তীব্র নেশার পানীয়ে পরিণত করে নিয়েছিলেন, এ সত্য সবাই জানেন। যতীন্দ্রনাথের

বিদ্রোহ তারই বিরুদ্ধে। মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযান, নিমীলিত নেত্রে সৌন্দর্যরতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ আঘাত এবং গণ-জীবনের মর্মমূলে কাব্যপ্রেরণাসন্ধান আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রথম যতীন্দ্রনাথের কবিতায় লক্ষ্য করা গেল। 'মরীচিকা'র 'মন-কবি' কবিতাটি এই বিদ্রূপের সুন্দর উদাহরণ। শাণিত বিদ্রূপ, স্পর্ধিত জিজ্ঞাসা, উজ্জ্বল নির্মম হাসি নিয়ে তিনি এসেছিলেন এবং তীক্ষ্ণ আঘাতে ঘুমঘোর ভেঙে দিয়েছিলেন। তাঁর বিদ্রূপমিশ্রিত জীবনজিজ্ঞাসা আসলে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, তা সচেতন আত্মদ্রোহ। কল্লোল যুগের তরুণ কবিরা যতীন্দ্রনাথের এই সব চরণ পড়ে ভারি খুশি হয়েছিলেন—

'চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?'
'তুমি শালগ্রাম শিলা
শোয়া-বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!'
'মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।'
'মিছে দিন যায় বয়ে
উপরে ও নীচে ঘুমের তুলসী—শুই শালগ্রাম হয়ে।'
'চারিদিক দেখে চারিদিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি ভাই,
নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।
ঝিম ঝিম নিশ্চিন্ত—
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন্ ত।'

('ঘুমের ঘোরে', মরীচিকা)

এই সব চরণই 'প্রথমা', 'বন্দীর বন্দনা', 'অমাবস্যা'র প্রাথমিক অনুপ্রেরণা।

জীবনে ও সাহিত্যে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের এই যে বিদ্রোহ, তা কেবল 'ফ্যাশন' নয়, মর্মের গভীরে এর অধিষ্ঠান। সেই অধিষ্ঠানভূমি যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ। এই দুঃখ বিলাস নয়, তা গভীর অনুভূতিরস। নেতিবাচক হলে এই দুঃখের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা ছিল না, জীবনের প্রতি গভীর পিপাসা ও আকর্ষণই তাঁকে বাহ্যতঃ জীবনোল্লাসবিরোধী করে তুলেছে, আসলে তিনি বাস্তবের মাঝে জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না পেয়ে হাহাকার করেছেন—আর তা-ই যতীন্দ্রনাথের দুঃখ। আর বেদনার্ত কণ্ঠে এই দুঃখের কারণ ও নিয়ামক ঈশ্বরের প্রতি তাঁর যত অভিযোগ, অভিমান। দুঃখকে স্বীকার করেছেন বলেই তিনি দুঃখ-দাতাকেও স্বীকার করেন। তাই নাস্তিকের শূন্য হাহাকার নয়, আস্তিকের গূঢ় অভিমান তাঁর কাব্যে ধরা পড়ে।

তাঁর কাব্যপাঠে ঈশ্বরের প্রতি অভিযোগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

ও ভাই কর্মকার,—
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম আর—
কোন্ ভোরে সেই ধরেছ হাতুড়ি, রাত্রি গভীর হোলো,
ঝিল্লিমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলো গো যন্ত্র তোলো।
ঠকা ঠাঁই-ঠাঁই কাঁপিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,

শ্রান্ত সাঁড়াশি ক্লান্ত ওষ্ঠে আল্‌গোছে ছেনি চুমে,
দেখ গো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি;
ক্লান্ত নিখিল, কর গো শিথিল, তোমার বজ্রমুঠি।
('লোহার ব্যথা', মরুশিখা)

এই অভিযোগের ভিত্তি যে দুঃখ, কবি তারও পরিচয় দিয়েছেন,

শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টিছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী।...

সৃষ্টির সুখে মহা খুশি যারা, তারা নর নহে জড়;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর।

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ!

সত্য দুখের আগুনে বন্ধু পরাণ যখন জ্বলে,
তোমার হাতের সুখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে।
('দুঃখবাদী', মরুশিখা)

আর এই দুঃখের মূল কবির একান্ত নিজস্ব জীবনদৃষ্টি ঃ

আমরা দু-জনে চলেছি বহিয়া,
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক খোঁজা!

তোমার মাথায় সুধার পশরা,
আমার মাথায় ক্ষুধার ডালা,
ক্ষুধায় সুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারিনে এ ওর জ্বালা। ('বোঝা', সায়ম্)

যতীন্দ্রনাথের এই গভীর আন্তরিক দুঃখবাদ তাই বাংলা কাব্য-সংসারে অভিনব স্বাদ এনেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের কালে। 'ভালো চেয়ে হেথা মন্দ যে বেশি নাহিক সন্দেহ'—এই বিশ্বাস, এই সচেতন আত্মদ্রোহ, এই বাস্তবমুখিতা যতীন্দ্র-কাব্যকে একটি বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে।

॥ ২ ॥

যতীন্দ্রনাথের কাব্যরচনাকাল পঁয়তাল্লিশ বছর (১৯১০-১৯৫৪) বিস্তৃত। কাব্যতালিকা এই: মরীচিকা (১৩৩০), মরুশিখা (১৩৩৪), মরুমায়া (১৩৩৭), সায়ম্ (১৩৪৮), ত্রিযামা (১৩৫৫), নিশান্তিকা (১৩৫৯)। এছাড়া তিনি কুমারসম্ভব, গীতা (১৩৩৫), ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলোর কাব্যানুবাদ (রথী ও সারথি ১৩৫৭) করেন, 'গান্ধীবাণী কণিকা' (১৩৫৫) কবিতায় রূপ দেন, ও 'কাব্যপরিমিতি' (১৩৩৮ বা ১৯৩৯) নামে কাব্য-বিচার-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোহিতলাল বলেছেন, "যতীন্দ্রনাথের কর্ম-জীবনে ও কবি-জীবনে সাক্ষাৎ বিরোধ আছে মনে করিয়া কৌতুক বোধ হয়। তিনি বি. ই. উপাধিধারী ইঞ্জিনীয়ার; আর কোনও বাঙালী বোধ

হয় ঐরূপ শিক্ষা ও ঐরূপ কর্ম-জীবন সত্ত্বেও এমন কবি-প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। কর্মকার যেমন অতি কঠিন লৌহ আগুনে কোমল করিয়া তাহার সেই অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ পিণ্ডকে হাতুড়ির আঘাতে, নানা আকারের গঠন দেয়—যতীন্দ্রনাথের কবিতায়, অগ্নিতপ্ত হৃৎপিণ্ডের উপরে সেই হাতুড়ির আঘাত এবং তাহার ফলে ভাব ও ভাষার জমাট দৃঢ়তা ও সুপরিচ্ছন্ন গঠন পরিলক্ষিত হয়।” (কাব্যমঞ্জুষা)। এই সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচয় অতিশয় সার্থক। শিল্পী যতীন্দ্রনাথের মূর্তিটি এখানে ফুটে উঠেছে। প্রকাশের ঋজুতা, রচনার বলিষ্ঠতা, বর্ণনার স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতা যতীন্দ্রনাথের পাঠক মাত্রকেই চমকিত করে। উপমার অসাধারণত্বে তিনি নিশ্চিন্ত পাঠকমনে একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত হানেন এবং তারই সুযোগে পাঠক-হৃদয়ে প্রবেশ করেন। যে স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য তাঁর কাব্যদর্শনে ধরা পড়ে, কলাকৃতিতে তা অতি-প্রত্যক্ষ। দুয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট। যেমন,

বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা।

অথবা

দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর পরে
ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যুশয়ন রক্তবমন করে।

অথবা

করি' নব নব ফন্দি,
ফুলের বাহির করিয়া গন্ধে করি তারে শিশি-বন্দী।

অরূপ-কোঠায় উঠিতে রূপের চোরাসিঁড়ি রাখি লাগায়ে ;
যৌবনমধু লেহিয়া লেহিয়া প্রেমতৃষা রাখি জাগায়ে।
('লীলাকীর্তন', মরুমায়া)

এখন পর্যন্ত যে ক'টি উদ্ধৃতি তুলেছি, আশা করি তা থেকেই সতর্ক মনোযোগী পাঠক যতীন্দ্রনাথের মনোধর্মের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করতে পারবেন। এই স্বাতন্ত্র্য-সন্ধানে কলাকৃতি ও ও কাব্যদেহনির্মাণকৌশল যতীন্দ্র-কাব্য-প্রসঙ্গে বিশেষ অর্থবহ। জগতে ও জীবনে চারিদিকে ছড়ানো নানা খুঁটিনাটি থেকে অবিচার ও অন্যায়ের এবং তজ্জনিত বেদনার উপাদান যতীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন। এই সজাগ কবিদৃষ্টি রোমান্টিক কবিদৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ফলে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে যথারূপে রেখেই তিনি কাব্যউপাদান আহরণ করেছিলেন। আর এখানেই যতীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির বিশিষ্টতা।

দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকেই এই বিশিষ্টতার পরিচয় পাই :

বৌবাজারের মোড়ে,—
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাইএ মাংস থোড়ে,—
('কেতকী', মরুমায়া)

আবার, দেয়ালে-ঝোলানো কেয়াফুলের ঝাড়ের বর্ণনা—

যার গন্ধের আনন্দে মোর নয়নে তন্দ্রা লাগে,—
না জানি কি দুখে সে তরুণ বুকে মরণের লোভ জাগে!
আধ ঘুমে চাহি' দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি।

নিষ্ঠুর চাষীর হাতে খেজুর-গাছের দুর্দশা ঃ

ফাঁস-করা রসি বাখুরায় কসি', কটিতে কাটারি গুঁজে,
বড় স্নেহে চাষা খেজুর-বৃক্ষ জড়াইল দুই ভুজে।
কাণ্ড বাহিয়া স্কন্ধে উঠিয়া, দাঁড়ায়ে ফাঁসের ভরে,
কাটারি খুলিয়া খেজুরের পালা ঝোরে চাষা থরে থরে!
কামাইয়া নির্মোক—
কত-না যতনে কাটারির হুলে কেটে আঁকে দুটি চোখ।
কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি,
খেজুর-পাতার ফাঁস করে ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি।
সেদিন হইতে খেজুর-বাগানে নীরবে অনর্গল
সারারাত ধরে খেজুর গাছের দুই চোখে ঝরে জল!

('খেজুর বাগান', মরুশিখা)

জীবনধারণের প্রয়োজনে সংসারে নির্দয় নিষ্ঠুরতা—

খেলিয়া বেড়াতে জলের দুলাল
ঢেউএর আঁচলে ঢাকা,
সন্ধ্যার মুখে পদ্মার বুকে
জালে জড়াইল পাখা।
এখনো যে দেহ রূপোর পাত্ রে,
হীরের টুক্‌রো আঁখি,—
মরণের শীত করে নিবারণ
বরফের কাঁথা ঢাকি'।

('হাটে', মরুমায়া)

জীবনের নিষ্ঠুর বিচারে সৌন্দর্যের কোন স্ব-তন্ত্র মূল্য নেই;
তারি ছবি নিত্য দেখে দেখে পীড়িত কবিচিত্তের হাহাকার

উপরি-ধৃত শ্লোকনিচয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি যতীন্দ্রনাথ এখানেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি সমস্ত জগৎব্যাপারের মূলে গভীব দুঃখকে আবিষ্কার করেছেন। প্রকৃতির প্রতি অচেতন আকর্ষণ কবি-মনে সচেতন বিরোধিতার সৃষ্টি করেছিল ; ফলে বিকর্ষণের তাপে কাব্যপরিবেশ উত্তপ্ত হয়েছিল। এখানেই দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের দেখা পাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গঙ্গার বন্দনা করে বলেছেন ঃ

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।
শ্যাম-বিটপি-ঘন-তট-বিপ্লাবিনী ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।

সেখানে যতীন্দ্রনাথ গঙ্গাকে দেখেছেন 'অনন্তজীবব্যথা প্রবাহ' রূপে—

চিরক্রন্দনময়ী গঙ্গে।
কুলু-কুলু কল-কল প্রবাহিত আঁখিজল
দেব-মানবের একসঙ্গে।

('গঙ্গাস্তোত্র', মরুশিখা)

রবীন্দ্রনাথ ভরা শ্রাবণ দিনের গান গেয়েছেন সোনার তরীর প্রত্যাশায়—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা-নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একটি রোমান্টিক স্বপ্নমোহের পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যেই এখানে ঘনিয়ে আসে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কাছে তা ঘনবর্ষার রোমান্টিক মূর্ছনা বহন করে আনে না। বিধবা পাঁচীর একমাত্র সন্তান ছাইগাদা থেকে মানকচু খুঁড়ে আনতে গিয়ে সর্পাঘাতে মারা পড়ে—

ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা উপর্ঝরণ,
গগন ধরণী মেঘে ধূসর বরণ ;
দাদুরী প্রভৃতি সব
নিভৃতে করিছে রব,
পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ !
এ বাদলে মরণের ছিল না মরণ ?

('দুঃখের পার', মরুমায়া)

অবিশ্বাসী আত্মদ্রোহী দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের এই পরিচয় অতিশয় বিশিষ্ট। বাংলা কাব্যসংসারে তিনি এই সুরের প্রথম গায়ক।

॥ ৩ ॥

দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের অপর পরিচয়, তিনি শিবের উপাসক। তাঁর উপাস্য দেবতা নটনাথ যোগারূঢ় যতীন্দ্র নন, তিনি লোকায়ত দেবতা, মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের দেবতা। "তাঁর বক্ষে নিখিল বিশ্বের বেদনা—তিনি দুঃখ-দুর্গত মানুষের প্রতিনিধি। প্রাচীন বাংলা দেশের চাষীরা শিবকে লাভ করেছিল একান্ত আত্মজনরূপে। তারা দেবাদিদেবকে প্রত্যক্ষ করে নি—উমাকান্তের শশাঙ্কমৌলি

ঐশ্বর্য-রূপের সন্ধান তারা জানত না। দীনের দেবতাকে ডাক দিয়ে তারা বলেছিল ঃ

'আমার বাক্য ধর গোসাঞি, তুহ্মি চস চাস,
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস—'

যতীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও তার বিস্ময়কর পুনরুক্তি হয়েছে। তিনিও জনগণের দেবতাকে, দরিদ্রের সহমর্মী ভোলানাথকে এই মন্ত্রে আহ্বান জানিয়েছেন, শঙ্করকে তিনি দেখতে চেয়েছেন 'সঙ্কর্ষণ' রূপে।" (শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক')। তাই তিনি বলেছেন ঃ

বহুদিন গত চৈতি গাজন,
মেঘে-মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট,
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়-শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধর লাঙলের মুঠ।
আমাদেরি সাথে চলগো ঠাকুর
ওই নাচে-পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল
পাথরও যেন গো ফাটে।—
শঙ্কর! হও সঙ্কর্ষণ,
মাটি-ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা। ('ভাঙাগড়া', ত্রিযামা)

মৃত্যুঞ্জয় দুঃখের রাজা শঙ্করের বন্দনা করে যতীন্দ্রনাথ বলেছেন,

সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুখময়,
সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর,—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
বিরাট বক্ষে চিরনিরুপায় বিশ্বের ব্যথা বহি ;
মাঝে মাঝে বুঝি ববম্ ববম্ জেগে ওঠে বিদ্রোহী !
পূজা পেয়ে হেসে আবার ঘুমাও আশুতোষ উদাসীন !
তোমার ব্যথার ম্লান সায়াহ্নে মিলায় দীনের দিন।
তবু শেষ হবে খেলা
এই চির অবহেলা—
প্রলয়-সন্ধ্যাবেলা
হবে—দুঃখ সিন্ধু ছাপায়ে উঠিবে তোমার ধৈর্য-বেলা।
তখন জাগিবে রাঙা কল্লোল ভীষণ বিষাণ রবে,
লণ্ডভণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড হবে শিব-তাণ্ডবে !
('শিবস্তোত্র', মরুশিখা)

এই দুঃখের রাজার জাগরণ যতীন্দ্রনাথের কাছে সর্বহারা দরিদ্রের জাগরণ। মোহাচ্ছন্ন সৌন্দর্যস্বপ্নময় জীবনের আত্মরতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদই তাঁর দুঃখবাদ—তাঁর শঙ্কর সেই দরিদ্র মানব সমাজেরই প্রতিনিধি। কবি তারই নান্দীপাঠ করেছেন। 'মরীচিকা' কাব্যের 'মন-কবি' কবিতা এই বিদ্রোহের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।

যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ তাহলে দুঃখবিলাস নয়, তা জীবন-সন্ধান। নব-জীবনের কর্ষণায় দরিদ্র-সহচর ভোলানাথ একদিন

অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবেন, তাঁর লাঙলের ফালে উপড়ে যাবে আগাছার জঞ্জাল—শোষণের পরগাছার দল নিঃশেষে দূর হবে —তারপর সমষ্টির চষা-প্রান্তরে ফলবে সমগ্রের ক্ষুধার অন্ন :

মাঠে মাঠে মোরা ফলাবো ফসল
ঘাটে ঘাটে তরী হবে চঞ্চল
আগ বাড় ভাই কাঁধে হল, শিরে
কাস্তে চাঁদের ফালা।

পরবর্তী নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় যতীন্দ্রনাথের এই স্বপ্ন-কামনারই প্রতিচ্ছবি দেখি। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে অনাগত ফসল-কামনা চরম রূপ লাভ করেছে 'সায়ম্' কাব্যের 'কচি ডাব' কবিতাটিতে। পরম আশ্বাসে আমরা এই কবিতাটিকে গ্রহণ করি—বঙ্গকাব্যভূমে এই কবিতাটি নিপীড়িত মানুষের আশার তরু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদা হিমরাত্রে কচি ডাবের পশরা নিয়ে শীতার্ত বৃদ্ধ রূপে সেই নীলকণ্ঠ শঙ্কর এসেছিলেন কবির কাছে। তাঁকে চিনতে কবির ভুল হয় নি—

দারুণ শীতের সাঁঝ হে আমার নটরাজ
কোন রূপে এসেছিলে দ্বারে ?
অশ্রুর সাগর মন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে !
যে-মোহিনী স্বর্ণ টাটে পাতে পাতে সুধা বাঁটে
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,
হে মোর বঞ্চিত রাজ, নিঃশেষে বুঝেছি আজ—
আমি যে তাদেরই একজনা !

তাই তুমি নানা ছলে আমার অন্তর তলে,
আমার দুয়ারে আঙিনায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসো কাঁদি বলে ভালোবাসো
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায়।

পীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি নিবিড়তম বেদনাবোধ, দুঃখহত জীবনের প্রতি আত্মীয়তার অনুভব, দীনদরিদ্রের স্বপক্ষে যতীন্দ্রনাথের এই দৃপ্ত বলিষ্ঠ ঘোষণা তাঁকে গণবাদী কবি বলে ইতিহাসের সম্মান দেবে।

যতীন্দ্রনাথের কবিধর্ম অচল অপরিবর্তনীয় ধর্ম নয়। তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম যুগে তীব্র রোমান্টিকতা-বিরোধী মনোবৃত্তি ও পরবর্তী যুগে—'সায়ম্' 'ত্রিযামা' কাব্যের কালে—নব-রোমান্টিক মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "কবি যতীন্দ্রনাথের রোমান্টিক-বিরোধিতা মুখ্যত এই রোমান্টিক প্রথার অনুবর্তনের বিরোধিতা। অবশ্য রহস্যবাদের কুয়াসাজালে জীবনকে আচ্ছন্ন করিবার বিরুদ্ধে, 'অজানার পিয়াসা'র বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার সহজাত অসমর্থন অদ্বিধায় প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু মন তাঁহার প্রতিক্রিয়ার দাহ প্রকাশ করিয়াছে সব চেয়ে বেশী সেইখানে যেখানে এই সকল 'ধরন-ধারণ' একটা প্রথাসিদ্ধ পথে অনুরণনবিহীন জটলারূপে দেখা দিয়াছে।" (ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'কবি যতীন্দ্রনাথ', ১ম সং, পৃ. ১৩২-৩৩)।

যতীন্দ্রনাথের প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম—মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া। কবি যে একদা মরুচারী দুঃখবাদী ছিলেন,

তা মেনে নিতে হয়। কিন্তু তাই তাঁর শেষ পরিচয় নয়। এই মরুচারণার কৈফিয়ৎ তিনি দিয়েছেন 'সায়ম্' কাব্যে—

বন্ধু জানো তো তুমি,—
বাংলার ছেলে ভালবেসেছিনু কেন আমি মরুভূমি।
শোনো গো বন্ধু, ঐ পশ্চিমে মামুলি মেঘের ডাক,—
দেহ ভেঙে দিল জোলো দুধ আর এই জোলো বৈশাখ।
মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ আজও জ্বলিছে যা ভাঙা বুকে।
শীকরসিক্ত ছাপ্টা লাগিয়া কখন সে যায় চুকে।
('চিরবৈশাখ', সায়ম্)

তাই কবির চিরবৈশাখ-সন্ধান—

মোর অন্তর-প্রান্তরে বসি কাঁকরে শুনেছি দিন।
কবে আসিবে সে চিরবৈশাখ কালবৈশাখী-হীন।
যার ঝঞ্ঝার মঞ্জীরে নাই মল্লার স্বর-কণা,
অঙ্গ বেড়িয়া প্রতপ্ত মেঘে ফুঁসে বিদ্যুৎ-ফণা!
জগৎ-কেন্দ্রে প্রাণধারা যার বহিছে অনল-স্রোতে,
যার দুর্বার অগ্নি-বারতা ছুটিছে আলোক-রথে। (ঐ)

এই বৈশাখ-সন্ধানে বেরিয়ে কবি আবার আত্মানুসন্ধান করেছেন। মরুচারণার পথ ত্যাগ করে কেন তিনি রোমান্টিক বসন্ত-চেতনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এই বলে,—

নবযৌবন সবে,
বসন্ত ছাড়ি' যোগ দিয়েছিনু নিদাঘ-মহোৎসবে।
বাংলায় বসে ভাল বেসেছিনু সুদূরের মরুভূমি,
ছিল না তো মোর ক্ষণিক খেয়াল সে কথা জানিতে তুমি।

আজও কি রাখিব আশা ?
যে মহামরুরে ভালবাসি আমি, পাব তার ভালবাসা ?
বন্ধু হাসিছ তুমি,—
ভালবাসা যদি ফিরে দেয় তবে কিসের সে মরুভূমি ?
('চিরবৈশাখ', সায়ম্)

এই পরিবর্তন আকস্মিক নয়। অনেকদিন ধরেই মরুচেতনায় বসন্ত-চেতনা আঘাত করছিল। তার প্রমাণ পূর্ববর্তী 'মরুমায়া' কাব্যের 'শাওনরাতি', 'কেতকী' প্রভৃতি কবিতা। বক্র কটাক্ষের তীব্র জ্বালা অনেকটা স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে এখানে। কবির দ্বিধা-বিচলিত কণ্ঠে শুনেছি ঃ

ওগো শাওনের রাতি, যেয়ো না !
তারাহারা, কুণ্ঠিত, কালো মেঘে গুণ্ঠিত,
নীল আঁখি মেলি' আর চেয়ো না !
('শাওনরাতি', মরুমায়া)

তারপরই 'সায়ম্' কাব্যে একতারার গান—'শাওনিয়া' (অধুনা রেকর্ডের কল্যাণে বহুশ্রুত) ঃ

শাওন এল ওই,
থৈ থৈ শাওন এল ওই,
পথহারা বৈরাগী রে তোর
একতারাটা কই ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

মরুচারণার পর এল গোধূলিচারণা ঃ 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া'র পর 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা'। রৌদ্র-পিপাসার

পর এল আপরাহ্নিক শ্রান্তি; তীব্র তীক্ষ্ণ সংশয়াকীর্ণ জীবন-জিজ্ঞাসার পর স্নিগ্ধ রোমান্টিক প্রৌঢ় বেদনা। প্রখর রৌদ্রালোক থেকে কবি চলে এলেন ছায়াচ্ছন্ন অপরাহ্নে। "আসল কথা, যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী-সত্তার আড়ালে একটি 'পরম-অনুরাগী' সত্তা ছিল। জীবনের মধ্যাহ্ন-লগ্নের বৈশাখী-দীপ্তিতে যে সুর আচ্ছন্নপ্রায় ছিল—জীবন-সায়াহ্নের প্রৌঢ় উপলব্ধির মুহূর্তে তাই অভিনব রূপে দেখা দিয়েছে মাত্র! যতীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্যের নামকরণগুলিও কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাঁর শেষ তিনখানি কাব্যের নামকরণ ব্যাপারে তিনি তাঁর জীবন-সায়াহ্নের ছায়া-গোধূলিকেই যেন স্মরণ করেছেন।" (শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়, 'সাহিত্য-বিচিত্রা', ১ম সং, পৃ ১০১)। তাই নিসর্গ-কবিতা, প্রেম-কবিতা, রবীন্দ্র-আনুগত্য, এক কথায় বাসন্তী-চেতনা। আর এখানেই রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের একজন হয়ে বসবার ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন যতীন্দ্রনাথ।

নিসর্গ-চিত্রণে ও প্রেমবেদনা-প্রকাশেই এই বাসন্তী-চেতনা মুক্তি পেয়েছে। প্রথম তিন কাব্যে নিসর্গ-প্রীতির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। ইঞ্জিনিয়ার-কবি চাকুরী উপলক্ষ্যে দ্বি-চক্র-যানে সারা বছর গ্রাম-বাংলা পরিক্রমার বারমাস্যা-কাহিনী বলেছেন 'পথের চাকরি' কবিতায়। সেখানে এই প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গ কী তীব্র ও সোচ্চার!

আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে জেয়াদা—
দাদন ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেয়াদা।

শহরে বরষা ঝরে
মেঘদূত ঘরে ঘরে,
গাঁয়ে মাঠে কাট ফাটে, এ বড় ধাঁধাঁ!
আমি কি করি?
ঘুরি 'বাইকে' চড়ি',
আল্-পথে টাল রেখে,
বেড়াই ইঁদারা দেখে,
যোগাই যে চায় তারে কলসী দড়ি।

('পথের চাকরি', মরীচিকা)

এখানে আষাঢ়ের রোমান্টিক বিরহবেদনার বাষ্প মাত্র নেই।

কিন্তু উত্তর-পর্বের শেষ তিন কাব্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। এই পর্বে জীবনকে তিনি সহজ প্রসন্ন রবীন্দ্রানুসারী দৃষ্টিতে দেখেছেন, পূর্ববর্তী বক্র তির্যক দৃষ্টি অপসৃত হয়েছে। ফলে শ্রাবণের ধারাবর্ষণে হৃদয়ের নিভৃত-বেদনাকে রূপ দিতে কবি দ্বিধা বোধ করেন নি:

হে বন্ধু, কহ গো মোরে
এ ঘন শ্রাবণ-ঘোরে কে কাঁদে আমার?
নিভাতে বুকের জ্বালা
কে ছিঁড়ে মুকুতামালা কবরী-সম্ভার?
শুনিয়া কাঁদন তার
বাঁধনের মালাকার গ্রন্থি যায় ভুলে,
মহাসন্ন্যাসীর শিরে
চির-জটিলতা ছিঁড়ে জটা পড়ে খুলে।

('কৃষ্ণা-চতুর্দশী', সায়ম্)

একদিন তিনি ঘন বর্ষায় কিনেছিলেন কেয়াফুলের ঝাড় 'বৌবাজারের মোড়ে, যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাইএর মাংস থোড়ে'; তারপর ঘরে ফিরে তন্দ্রাঘোরে—

আধ ঘুমে চাহি' দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি !

('কেতকী', মরুমায়া)

আর আজ প্রৌঢ় অপরাহ্ণে 'নিঃশশী' রাতে দেখেন—

দুলিয়া উঠিল রজনীগন্ধা,
বহিল পবন মন্দ,
অন্তরে যেন লাগিল আমার
নব মৃদু মধু গন্ধ।...
বিস্ময় ভরে সস্নেহ করে
টানিয়া নিলাম বুকে,
গন্ধ মেলিয়া মর্মের পানে,
চাহে সে ঊর্ধ্ব মুখে।

কিন্তু, হায়! সে যৌবন আজ অতিক্রান্ত; তাই প্রৌঢ়ের রোমান্টিক বেদনা গুঞ্জরিত হয়েছে কবিহৃদয়ে—

সাধ্য ত আর নাহি গাহিবার,
নীরবে যাবো তা জপি'
রাতের সুরভি প্রভাতের পায়ে
নিঃশেষে দিতে সঁপি'।
'রজনীগন্ধা—রজনীগন্ধা'
জপিছে রজনী ঝিল্লী-ছন্দা ;

ঝিকি ঝিকি ঝিকি জপে জপমালা

তারার আলোকে অলকনন্দা ;

'রজনীগন্ধা—রজনীগন্ধা'। ('রজনীগন্ধা', ত্রিযামা)

'ত্রিযামা' কাব্যে এই রোমান্টিক বেদনা বহু প্রকৃতি-কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে, মনোযোগী পাঠক তা সহজেই লক্ষ্য করতে পারবেন। 'ত্রিযামা' কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি-কবিতা 'বানপ্রস্থ' কবিতাটি কবি-হৃদয়ের নিবিড় বেদনাকে প্রকাশ করেছে। পার্বতী আরণ্যভূমিতে চিত্রিত এই কবিতাটির বিশেষ রসমূল্য আছে ; সুনির্বাচিত সুমিত সুন্দর শব্দ-বিন্যাসে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিলম্বিত লয়ে এবং যত্নকৃত কলাকৃতিতে এটি কবিহৃদয়ের প্রকৃতি-প্রেমকে নিঃশেষে প্রকাশ করেছে। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য। সে লোভ সংবরণ করে একটি মাত্র স্তবক তুলে দিচ্ছি ; এতেই উপর্যুক্ত গুণগুলির পরিচয় পাওয়া যায়—

দুর্যোগঘন রাত্রিযাপন
নির্জন বন বাংলায় ;
নিম্নে পাহাড়া নামহারা নদী
বাঁকে বাঁকে টাল্ সামলায়।
জল কেন হোথা ছল্‌কায় ?
বুঝি বাঘে বাইসনে জল খায় ?
সুদূরে তরুণী গারোণীর ডাকে
পথহারা গাভী হাম্‌লায় ?

'স্বপ্নশঙ্কামোহঘন' নির্জন বিভাবরী কবিচিত্তের রোমান্টিক বেদনাকে মুক্তি দিয়েছে।

পরবর্তী 'সায়ম্' কাব্যের রোমান্টিক কবিকল্পনার অন্যতম নিদর্শন 'বেদেনী' কবিতাটিতে বন্ধনমুক্ত জীবনের রোমাঞ্চিত আনন্দ ধরা পড়েছে। এটি বিশুদ্ধ রোমান্সের পরিচায়ক। কালবৈশাখীর যে বর্ণনা এখানে ছন্দের বিলাসে, শব্দের নিপুণ সংযোজনে ধরা পড়েছে, তা যতীন্দ্রনাথের নোতুন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছে :

শোন্ রে বেদিনী শোন্
সুরু হল ঐ অদূরে আঁধারে
গুরু গুরু গর্জন!
ঘরের মায়া সে থাকে তো এখনো
কেটে দে তাঁবুর রসি,
না হয় কাটাবো এ কালরাত্রি
খোলা মাঠে খাড়া বসি'।
আকাশ জুড়িয়া কোন সাপুড়িয়া
বাজায়ে চলেছে তূরী,
ঝাঁপির ভিতরে জাগিয়া সাপিনী
ভাঙিতেছে মোড়ামুড়ি।
ভেবেছে সে আজ এল নটরাজ,
নৃত্যের আহ্বান,
ডালার রসির ফাঁসে ওই দেখ্
ঘন ঘন পড়ে টান।
কেন উদাসীন আনমনা হেন
বেদিনী, বেদের মেয়ে?
দূরের বাঁশির সুরে তুইও কি রে
উঠিবি কাঁদুনি গেয়ে?

এই বিপুল সুদূরের বাঁশীর ডাকে বেদেনীর সঙ্গে কবিও ঘরছাড়া যাত্রাপথে উধাও হতে চেয়েছেন।

প্রেম-কবিতা-ক্ষেত্রেও অনুরূপ বসন্ত-সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। তবে তা প্রৌঢ় বসন্ত। যৌবনকালের প্রথম তিনটি কাব্যে প্রেম অনুপস্থিত ; প্রৌঢ় অপরাহ্লের শেষ তিন কাব্যে তা সংযত আবেগবিরল রূপে প্রকাশিত। দুঃখবেদনাভরা জীবনে তিনি প্রেমকে অস্বীকার করেছিলেন : আর আজ মরুচারণা শেষ করে যে রোমান্টিক কাব্যসংসারে প্রত্যাবর্তন করলেন, সেখানে যৌবনের উচ্ছ্বাস, চাঞ্চল্য, আবেগ নেই, আছে আপরাহ্লিক বিষাদ-মাখা শ্রান্ত প্রহরের অচঞ্চল সংযত স্মৃতিসুরভিত প্রেমের মৃদু বিষণ্ণ গুঞ্জরণ। এই স্মৃতি-বেদনাই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে ঃ

মোর যৌবনে ফাল্গুন-পবনে
নবমঞ্জরী জাগালো যারা,
কত কুহরণ কত গুঞ্জন
কত রঙনে রাঙালো, তারা
একে একে গেছে চলিয়া, তবু
যায় নি কেবল, ছলিয়া গো! ('অদ্বয়', ত্রিযামা)

এই প্রৌঢ় অপরাহ্লের বিদায়-লগ্নটি প্রেমের অভ্যর্থনাকে দ্বিধাগ্রস্ত ও বেদনার্ত করে তুলেছে। শবরীর জীবন-সন্ধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র যখন এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সাজানো যৌবন শুকিয়ে গেছে। কবির জীবনে যখন

রোমান্টিক প্রেম-প্রেরণা এসে পৌঁছল, তখন শবরীর মতো কবিচিত্তও শ্রান্ত বেদনাহত, তাই শবরীর বেদনা কবিচিত্তেরই বেদনা ঃ

আজি মোর রিক্ত তপোবনে
শেষ ফল হতেছে নিষ্ফল ;
কখন যে আসো, ভাবি তাই—
যে আঁখি কখনো মুদি নাই
নিবে-আসা সে-আঁখির জলে
ফুটে ওঠো নব নীলোৎপল !
তুলে নাও রক্তকরতলে
আমার বনের শেষ ফল। ('শবরী', ত্রিযামা)

যৌবন-নির্বাসিত প্রেম-প্রিয়ার জন্য ব্যথার অঞ্জলি দিয়ে কবি আজ তার অভ্যর্থনা করেছেন। 'ত্রিযামা' কাব্যের প্রেমকবিতা-গুলির মূল কথা এখানেই পাই। এই ব্যথার অঞ্জলি-দান চমৎকার রূপ লাভ করেছে 'মনোরমা' কবিতায় ; শূন্য হৃদয়-দেউলে সন্ন্যাসিনী প্রেম 'মনোরমা'কে বেদনার অঞ্জলি দিয়ে কবি শেষ আরতি করেছেন ঃ

দাঁড়ানু তাই দেউলমূলে অকূল যেথা কল্লোলিছে।
পাঁজর-ভাঙা পাষাণ ঘাটে ভাঙিছে ঢেউ ঢেউএর পিছে ;
সন্ন্যাসিনি, তোমারে ঘেরি সন্ধ্যা উঠে পিঙ্গলিয়া,—

লুপ্তকারু অভ্রভেদী
দেউল,—সে কি শূন্য বেদী ?

দুয়ার খোলো প্রদীপ জ্বালো দেখিবে কবি কবির প্রিয়া—
তোমারি মাঝে তোমারে, আর
হারানো মনোরমারে তার।
('মনোরমা', ত্রিযামা)

'শপথভঙ্গ' কবিতায় এই মনোরমার কাছে কবি চোখের জলে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

প্রৌঢ় বিষণ্ণ অপরাহ্ণে এই প্রকৃতি ও প্রেমের আরতি যতীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনকে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা দান করেছে। 'ত্রিযামা' কাব্যের অন্তর্গত তিনটি কবিতায় ('বাইশে শ্রাবণ ১৩৪৮', 'বাইশে শ্রাবণ ১৩৪৯', 'পঁচিশে বৈশাখ') রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন যতীন্দ্রনাথ। একদিন রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবি উচ্চারণ করেছিলেন কৌতুক-শাণিত জিজ্ঞাসা :

তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক
শুধাই তোমায়—কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ ?
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে ?
('ঘুমের ঘোরে', ১ম ঝোঁক, মরীচিকা)

আজ জীবন-অপরাহ্ণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি :—

তুমিই ত এ নিখিলে দিকে দিকে লিখে দিলে
রসের মুরতি,
তোমারি চঞ্চল সুরে স্থিরতার অন্তঃপুরে
বাণী মূর্তিমতি।......

অবিচ্ছিন্ন রবিহারা বাইশে শ্রাবণধারা
নিত্য হল সেই ;—
তারি স্রোতে অশ্রুমান পঁচিশে বৈশাখী গান
অঞ্জলিয়া দেই।

('পঁচিশে বৈশাখ', ত্রিযামা)

॥ ৫ ॥

বিশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যদিনে কবিতা রচনা করে যতীন্দ্রনাথ যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মতো মুগ্ধ আত্মসমর্পণ তিনি করেন নি, আবার রবীন্দ্রনাথের উদ্ধত প্রতিবাদ করে দায়িত্ব শেষ করেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রানুসারিতার নামে যে অন্ধ রোমান্টিক অনুস্মৃতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল, যতীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন; জগৎ ও জীবনকে এক নোতুন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, আর সেই দেখার পিছনে ছিল গভীর বেদনাময় আন্তরিকতা। যতীন্দ্র-কাব্য বাঙালি কাব্যপাঠকের বিশেষ কৌতূহল দাবী করে এই জন্য যে, এই কবির জীবনে যৌবনের প্রবল অস্বীকৃতি প্রৌঢ়ত্বের নম্র সমর্পণে পরিণত হয়েছে। প্রথম তিন কাব্যে যার অস্বীকৃতি, শেষ তিন কাব্যে তারই বিনীত স্বীকৃতি। তবে কি এই পরিবর্তন আকস্মিক? অথবা, যতীন্দ্রনাথের কবিধর্ম কি উত্তর-কাব্যেই নিজেকে প্রকাশ করেছে? বা, প্রথম ও শেষ পর্বের মাঝে কিছু মিল আছে? এই প্রশ্নের

উত্তর পাঠকের মনে। এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি তাতে এই প্রশ্নের সকল উত্তর বিশ্লেষণ করেছি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার যতীন্দ্র-কাব্যের অনুরাগী পাঠককেই নিতে হবে। তবে এই ক্ষেত্রে সাহায্য করবে 'ত্রিযামা' কাব্যের দুটি কবিতা— 'সমাধান' ও 'কবিজাতক কথা'।

যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী কবিসত্তা একদিন চেতনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জড়ের উপাসক হয়েছিল। সেদিনের সার্থক পরিচয় বিধৃত হয়েছে মরীচিকা কাব্যের 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায়; সেখানে তিনি বলেছিলেন :

'আমি বেশ জানি—সুখ ও দুঃখ জীবনে দু'টাই শ্লেষ।'
'এ ধরা গোরস্তান,
মরণের ভিতে স্মরণের ঢিপি দু'দিনে ভুমি-সমান!'
'প্রেম বলে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।'

'ওগো অক্ষয় বট!
যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।
তাই কাঁদাকাটি মাথা কোটাকুটি সকল জগৎময়,
দুঃখ হইতে জনম এদের দুঃখেই পরিচয়!'

('ঘুমের ঘোরে', মরীচিকা)

জীবনের দুঃখময় রূপটি কবির কাছে কেবল প্রধান নয়, একমাত্র বিচার্য হয়েছে। কবির দুঃখবাদের মূলে আছে এই জড়বাদ-স্বীকৃতি।

কিন্তু জীবনের প্রৌঢ় পরিণতিতে পৌঁছে কবি এই সিদ্ধান্ত বদলিয়েছেন। খুব সোজাভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে এই দৃষ্টি-পরিবর্তন স্বীকার করেছেন :

যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা
'প্রেম বলে কিছু নাই,
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।'
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্ চেতনার ঝাঁজ ?
('সমাধান', ত্রিযামা)

একদা-অস্বীকৃত যৌবন, বৈশাখী চেতনা, নির্বাসিত প্রেম আজ শোধ নিয়েছে ; কবি আজ একে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন :

আজ মনে হয় এ দগ্ধ ভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে বলেছিনু—নাই,
চেতনার কূলে বসি' চিতামূলে গায়ে মাখি তারি ছাই।
('সমাধান', ত্রিযামা)

আজ তাই কবিকণ্ঠে আর্ত হাহাকার :

আজ চেতনার কুজ্‌ঝটি-কূলে
নির্বাপিত এ তব চিতামূলে
যৌবন-বেচা জরা বিনিময়ে জড়ত্ব করিয়াছি।...
তুমি নাই তুমি নাই তুমি নাই,—
উঠে ঢেউ পড়ে ঢেউ,—
চেতনে ও জড়ে কাঁদে গলা ধরে,
দরদী নাহিকো কেউ। ('সমাধান', ত্রিযামা)

দীর্ঘ মরুপথ পরিক্রমার শেষে যখন প্রেমের প্রসন্ন ভূমিতে কবি পৌঁছলেন, তখন তাঁর হাতে সময় নেই। যৌবনকে বেচে দিয়ে কবি জড়ত্বকে বরণ করার ভুল স্বীকারের আর্ত ক্রন্দনে আপরাহ্নিক কাব্যাকাশ মুখরিত করে তুলেছেন। এই আর্ত ক্রন্দনে গভীর আন্তরিকতার পরিচয় পাই—যা সকল মহৎ কবিকর্মের লক্ষণ। যতীন্দ্রনাথ আজ তাই 'মরমীয়া বন্ধু'র আলেয়া-সন্ধানের ব্যর্থতা স্বীকার করে করুণাময়ী পৃথিবীর কাছে শান্তি ভিক্ষা করেছেন ঃ

> গঙ্গে যমুনে গোদাবরী হে সরস্বতী
> তোমাদেরি স্রোতে পূত করো এ স্রোতস্বতী,
> সিন্ধু কাবেরী ও নর্মদা তাপ্তী,
> স্নাতকে দেহ গো আজি স্নিগ্ধ সমাপ্তি।
>
> ('সমাপ্তি', ত্রিযামা)

আশা করি, কাব্যলক্ষ্মী তাঁর এই বিদ্রোহী সন্তানটির শেষ প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নি।

নবম অধ্যায়

মোহিতলাল মজুমদার

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের শ্রেষ্ঠ কবি মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)। তাঁর সম্পর্কে প্রশংসাও অপরিমিত, নিন্দাও সুপ্রচুর। কিন্তু যথার্থ মূল্যায়নের সৎ প্রয়াস আজ পর্যন্ত বিশেষ দেখা যায় নি। অথচ আধুনিক বাংলা কাব্যান্দোলনে কবি মোহিতলালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কাব্যে নোতুন ধ্যান-ধারণা-চিন্তা যাঁরা এনেছেন, তাঁদের পুরোধা মোহিতলাল। একথা আধুনিকেরা স্বীকার করেন, তথাপি আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ, এমন কি বিরোধিতা ঘটেছে। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-উত্তরাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে মোড় ফেরার ঘণ্টা বেজেছিল ১৯৩০-এর কাছাকাছি। সেই 'কল্লোল যুগের' ইতিহাসকার শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, "মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায়, তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কাররাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়। তিনি জানতেন না আমরা তাঁর কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম, তাঁর কত কবিতার লাইন আমাদের মুখস্থ

ছিল।....'পান্থ' বেরিয়েছিল 'কল্লোলে'র তেরোশ বত্রিশের ভাদ্র সংখ্যায়। সেই কবিতা 'আধুনিকতায়' দেদীপ্যমান।.... অবিস্মরণীয় কবিতা। বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব ঐশ্বর্য। তারপর তাঁর 'প্রেতপুরী' বেরোয় অগ্রহায়ণের 'কল্লোলে'।" ('কল্লোল-যুগ', ১ম সং, পৃ ১৩৩-৩৬)। " 'কালি-কলম' বেরুল—তেরশ তেত্রিশের বৈশাখে।....আর প্রথম সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা মোহিতলালের 'নাগার্জুন'।" (তদেব, পৃ ২১৩)। অথচ এই গোষ্ঠীর সঙ্গে মোহিতলালের বিচ্ছেদ ঘটেছে, তা দুঃখকর কিন্তু অনিবার্য। অচিন্ত্যকুমার এর ব্যাখ্যা খুঁজে পান নি, দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মোহিতলালের কাব্যচর্চা শুরু 'ভারতী' পত্রিকায়, তার অর্থ নিঃসংশয় রবীন্দ্রানুগত্য ; শেষ জীবনেও মোহিতলাল 'ভারতী' ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে ভুলতে পারেন নি, 'হেমন্তগোধূলি' কাব্যের উৎসর্গ-পত্র তারই প্রমাণ ; মণিলালকে এই কাব্য উৎসর্গ করে সেই পুরনো দিনগুলির কথা স্মরণ করেছেন। অথচ পরবর্তী জীবনে তিনি 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কাব্যাদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। কবি মোহিতলাল সম্পর্কে এ দুটি সমস্যা মোচন অত্যাবশ্যক। তা না হলে কবির জীবনবোধ ও কাব্যবোধকে বোঝা যাবে না।

১৯১১ থেকে ১৯৪১ ঃ মোটামুটি এই তিরিশ বছর মোহিত-লাল কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু এই দীর্ঘ তিরিশ বছরের ফল সংগ্রহ করেছেন মাত্র চারটি কাব্যগ্রন্থে ; 'স্বপন-পসারী'

(১৯২১), 'বিস্মরণী' (১৯২৬), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্ত-গোধূলি' (১৯৪১)। এর পর 'ছন্দচতুর্দশী' গ্রন্থে তাঁর সনেট-সমূহ একত্র করে প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারতী' পত্রিকা থেকে 'শনিবারের চিঠি' এবং সেখান থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ঃ এই দীর্ঘ যাত্রাপথে মোহিতলাল সাহিত্য সম্পর্কে নানা আলোচনা করেছেন। মনস্বী প্রবন্ধকার সমালোচক সাহিত্যব্যাখ্যাতা অধ্যাপক মোহিতলালের পরিচয় সেদিনের 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় পাতায় বিধৃত আছে। কিন্তু কবি মোহিতলালের পরিচয় সেখানে খুঁজলে ব্যর্থ হবো বলেই আমার বিশ্বাস। উপরোক্ত চারটি কাব্যগ্রন্থেই মোহিতলালের কবিমানসের স্বরূপ-সন্ধান করতে হবে। অন্যথায় যে মোহিতলাল কবি নন, তাঁর পরিচয় কবি মোহিতলালের পরিচয় গ্রহণে প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেবে। এবং এই আশংকা অমূলক নয়।

॥ ২ ॥

'স্বপন-পসারী' কাব্যগ্রন্থ মোহিতলালের নিজের কথাতেই 'ভারতী' পত্রিকার রোমান্টিক যৌবন-মদগন্ধোচ্ছল কাব্যধর্মের অনুসারী। এই কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "স্বপন-পসারীর অধিকাংশ 'ভারতী'-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে 'ভারতী'রই স্নেহচ্ছায়ায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।" এই কাব্যে সত্যেন্দ্রীয় মৌতাতে আচ্ছন্ন কবিমনের পরিচয় পাই। 'চোখের দেখা', 'দিলদার', 'রূপতান্ত্রিক', 'শ্রাবণরজনী', 'চুড়ির

আওয়াজ', 'ক্ষ্যাপা', 'কলস-ভরা', কবিতাই তার প্রমাণ। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চরণেই তার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

কনক-কমল রূপে প্রেম যদি ফুটে উঠে—
তবেই আমার মানস-মরাল অলস-পক্ষ-পুটে
চকিতে জাগিয়া উঠে!
ফুলের হিয়ার মধু, চাহিনা চাহিনা বঁধু!
রেশমী রঙীন্ পাপ্‌ড়ি যদি না
চারিধারে পড়ে লুটে! ('রূপতান্ত্রিক')

গুল্‌নার-বাগে ফুল বিল্‌কুল্, নাশ্‌পাতি
গালে গাল দিয়ে লালে-লাল হ'ল বোস্‌তানে!
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের আবছায়া,
সরাইখানায় মেতেছে মাতাল খোশ্‌গানে!
কহিল সহেলি, 'আজ যে গানের নওরোজা!
ফুল দলে' চল, কেন গো ফলের বও বোঝা?'
সে কোন্ শরাবে করিলি বেহোঁশ-মস্তানা—
নার্গিসাক্ষি! কি কথা আমার কো'স্ কাণে! (গজল-গান)

অবাক হয়ে দেখ্‌নু চেয়ে চেয়ে চোরের চতুরালি,
দুষ্ট চুড়ির দুষ্টামি সে, নূতন দূতিয়ালী!
চুড়ির আওয়াজ—আর কিছু নয়, একটু রুনিঝুনি!
কতই সুরে কতবার সে বাজে তাহাই শুনি।

('চুড়ির আওয়াজ')

ঠোঁটের রাঙা—চোখের হাসি কালো—
নিশীথ-সাগর-সাঁতার-দেওয়া
বাঁকা চাঁদের আলো—

চাই না আমার—চাই না অধিক আর,
ওই টুকুতেই নেই যে অধিকার !
ভিক্ষা বলে যেটুকু পাই ভাল—
ঠোঁটের ঈষৎ রাঙা হাসি, চোখের হাসি কালো !
('চোখের দেখা'

এই ক'টি উদাহরণই যথেষ্ট। সত্যেন্দ্রীয় মৌতাত ও ধ্বনিরোলে, বেলোয়ারি চুড়ি আর নূপুরের রুনিঝুনিতে শ্রুতিমুগ্ধ কবিমনের সাক্ষাৎ এখানে পাই। কিন্তু মোহিতলাল রোমান্টিক নেশাতেই বুঁদ হয়ে থাকলেন না। 'স্বপনপসারী' কাব্যেরই দুটি কবিতায় পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল—'অঘোরপন্থী' আর 'পাপ'। এই প্রথম ভোগবাদী কবির সাক্ষাৎ পাই। কবির উদাত্ত কণ্ঠে শুনি জীবনের বন্দনা :

কাচের পেয়ালা ভেঙে ফেল্ তোরা, লওরে অধরে তুলি'
শ্মশানের মাটি লাগিয়াছে যা'য়—মড়ার মাথার খুলি !
ভাবে বুঁদ হয়ে, বুদ্‌বুদে ভরা
বাসনার রঙে রাঙা-রঙ্-করা,
নীর নাহি যা'য়—বহ্নির প্রায় সুরায় পড়গো ঢুলি'
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, লও মড়ার মাথার খুলি—
চুমুকে চুমুক দাও বারবার
পড় গো সবাই ঢুলি'।

আমরা ডরি না মৃত্যুরে কেউ—শব-শিব একাকার !
জীবন-সুরায় নিঃশেষ করি দেখি যে তলানি সার !

('অঘোরপন্থী')

আর জীবনোপভোগের তীব্র ব্যাকুলতা :

ভুল করিবারে পাবে অধিকার, পাপ সে জানিত যারে—
একটি মধুর চুম্বনে দিবে সারা প্রাণ একেবারে !
শতবার করি' পুড়িয়া মরিবে বাসনা-বহ্নি-মুখে—
মরি' মরি' শেষে অমর হইবে প্রেমের স্বর্গসুখে।
পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান !
গাহিয়াছে, আলো বায়ু নদী জল তরুতল মধুমান্ !
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে যজ্ঞের সোমরস !
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু—হতে পারে অপযশ !

('পাপ')

এইখানে মোহিতলালের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেল। এই জীবনবোধ তাঁকে সরিয়ে নিয়েছে রবীন্দ্রপথ থেকে, তাঁকে আকর্ষণ করেছে কল্লোল-পন্থীদের কাছে, পুনর্বার সরিয়ে নিয়ে গেছে বিরলপথিক কাব্যপথে। সেখানে মোহিতলাল নিঃসঙ্গ পথিক। যাত্রাপথ দুর্গম, তবু পথিক কখনো লক্ষ্যচ্যুত হন নি। 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরলে' এই জীবনবোধই প্রাধান্য লাভ করেছে। 'দেহের মাঝারে দেহাতীত আত্মার ক্রন্দন' এবং জীবন-সম্ভোগের ব্যাকুল বাসনায় কবিচিত্ত দোলায়িত হয়েছে ; এই দ্বন্দ্বে যে অমৃত ও বিষ উঠেছে, কবি তা-ই নীলকণ্ঠের মতো পান

করেছেন, এই দুই কাব্যে তারই স্বাক্ষর রয়ে গেছে। কবি উচ্চকণ্ঠে বলেছেন ঃ

> ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি, যেইজন বলীয়ান্,
> নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে এত বড় যার প্রাণ!
> যেজন নিঃস্ব পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণ-ধন,
> জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ! ('পাপ')

॥ ৩ ॥

বাঙালি পাঠকের পক্ষে মোহিতলালের কাব্যরস-আস্বাদনে সর্বপ্রধান বাধা এখানেই ঃ এই ভোগবাদ—জীবনকে শক্তিমানের মত ভোগ করার যে মন্ত্র, তা-ই মোহিতলালের বলিষ্ঠ জীবনবাদ ওবফে ভোগবাদ। 'স্মরগরল' কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন ঃ "স্মরগরলের কবিতাগুলিতে যে একটা সুর বেশি করিয়া বাজিয়াছে, তাহাও এই বাংলার জলমাটিতে নিহিত আছে—সে সুর 'বৈষ্ণব' নয়, অপর সাধনার সুর।" কবি এখানে স্পষ্টই বলেছেন, তাঁর কাব্যে বৈষ্ণবভাবপ্রেরণার পরিবর্তে শাক্তভাবের বিকাশই অধিক হয়েছে। এই 'শাক্ত' ভাবই বলিষ্ঠ জীবনবাদ। ব্রাউনিং ও লরেন্সের ভোগবাদ অনেকটা এই জাতীয়। 'অঘোরপন্থী' ও 'পাপ' কবিতায় এর সূচনা, 'স্মরগরল'-এ বহুবিস্তার। এই শাক্তধর্মের প্রেরণা কি? এ বৈষ্ণবের আদর্শবাদ নয়, জগৎ ও জীবনকে একটি স্বপ্নের আবেশে সুন্দর করে ভোগ করা নয়—পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চোপচারে দেহ ও আত্মার জন্য নৈবেদ্য আহরণই ওই 'শাক্ত'ধর্মের প্রেরণা। কিন্তু

এই শাক্তসাধক ভোগী হলেও জ্ঞানমার্গী। তাই মোহিতলালের কবিতায় যে ইন্দ্রিয়াশ্রয় (sensuousness) আছে, তা পুরুষোচিত ; ইন্দ্রিয়কে দমন করা তাঁর লক্ষ্য নয়। ইন্দ্রিয়ের দাসত্বও তাঁর অনভিপ্রেত। মোহিতলালের ভোগবাদ একটি অতিদৃঢ় বিবেকবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, ভোগব্যাকুলতা সংযমের প্রস্তরকঠিন তটে আবদ্ধ। যে গভীর তত্ত্ব এই কাব্যবোধের মূলে সংহত আছে, তা-ই মোহিতলালের কাব্যকে এক অসাধারণ লাবণ্যে মণ্ডিত করেছে।

কবিতার বহিরঙ্গ বিচারেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 'স্মরগরলে'র ভূমিকায় কবি বলেছেন, এই কাব্যে তাঁর নিজস্ব স্টাইল আরও স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে ; তিনি কবিতার 'form' আয়ত্ত করতে পেরেছেন। এখানে তিনি বলেছেন ঃ "প্রত্যেক কবিতা—ছোট বা বড় কাব্য—যে কারণে একটি রস-রূপ ধারণ করে, তাহা ঐ—'form' ; সমগ্রতার এই সুষমা যেমন তাহার গঠনে, তেমনই তাহার প্রত্যেকটি শব্দযোজনায় যুগপৎ ফুটিয়া ওঠে ঃ কবির প্রকৃতি ও কাব্য-প্রেরণার প্রকারভেদে তাহা অজ্ঞান বা সজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু তাহাই খাঁটি রসসৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। যাঁহারা আবেগময় ভাববস্তুকেই কাব্যে অধিক মূল্য দেন, তাঁহারাও যদি সত্যই রসাস্বাদ করিয়া থাকেন,—তবে ভুলিয়া যান যে, ঐ নিছক আবেগটাই মুগ্ধ করে না—মুগ্ধ করে তাহার ঐ 'form', এবং স্টাইলের অব্যর্থতা।" উঁচু কাব্যকল্পনাকে সুলাবণ্যবতী

কাব্যদেহে না ধরা পর্যন্ত কবির ক্ষান্তি ছিল না। Emotion-এর ভিত্তিভূমি Intellect—একথা মোহিতলালের কাব্যপাঠে মেনে নিতে হয়। কাব্যের বহিরঙ্গপ্রসাধনে তারই পরোক্ষ পরিচয় পাই।

ফলতঃ মোহিতলালের কাব্যমন্ত্রের মতো কাব্যের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গিটিও কবিকৃত। তা অপরের অনুস্মৃতি নয়। মোহিতলালের কাব্যসাধনায় রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল—এই দুই কল্পনাভূমিই মিলিত হয়েছে। কবিতার গঠন যেমন ভাস্কর-শিল্পের অনুকারী, আবেগের দুর্দমনীয়তাও তেমনি সেই সংযম-শাসনেই এক অনন্য লাবণ্যদীপ্তি পেয়েছে। কবিতার কাব্যকল্পনা যতই রোমান্টিক, কাব্যদেহ তেমনিই ক্লাসিকাল রীতিসম্মত। 'স্বপনপসারী'র 'পুরূরবা', 'নাদির শাহ', 'বেদূঈন', 'নূরজহান' নাট্যকবিতায় রোমান্টিক গীতিপ্রাণতার চূড়ান্ত হয়েছে, অথচ তা ক্লাসিকাল-নিগড়ে বাঁধা পড়েছে। 'বিস্মরণী'র 'মোহমুদ্গর' এবং 'মৃত্যু ও নচিকেতা', 'স্মরগরলে'র 'নারীস্তোত্র' এবং সনেটগুচ্ছ—এই দুই ধারার যুগ্মলীলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গীতিকবিতার মধ্যে নাট্যধর্ম এনেছে এই ক্লাসিকাল-রীতি; এরই বাঁধন থেকে দুর্দমনীয় রোমান্টিক কল্পনা নিজেকে প্রকাশ করেছে। কবিকল্পনার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে, গীতিপ্রাণতা ও ক্লাসিকাল সংহতিকে মোহিতলাল অবলীলাক্রমে পরিক্রমণ করেছেন 'বেদূঈন', 'শেষশয্যায় নূরজহান', 'মৃত্যু ও নচিকেতা', 'পান্থ', 'নারীস্তোত্র',

'নাগার্জুন' প্রভৃতি নাট্য কবিতায়। কবিকল্পনাকে স্বচ্ছন্দবিহারিণী করেছেন মোহিতলাল ; কাব্যসংসারের সকল ক্ষেত্রে দ্রুত স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে গেছেন, তাই তাঁর স্ব-কৃত বিশিষ্ট স্ব-তন্ত্র কাব্যরীতি বা স্টাইল এত গভীর অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

॥ ৪ ॥

অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, 'মোহিতলাল ছিলেন আধুনিকোত্তম'। তবে কেন তাঁর সঙ্গে আধুনিকদের বিরোধ ও বিচ্ছেদ ? আমার মনে হয়, কল্লোল-গোষ্ঠীর জীবনমুখিতা, বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা ও সংস্কাররাহিত্য মোহিতলালকে আকর্ষণ করেছিল, আর বস্তুজীবন ও যৌনজীবনের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব-আরোপ, সংযমহীনতা ও যৌনসর্বস্বতা দূরে ঠেলেছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্পর্কে অখণ্ডতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বের দিব্যানুভূতি, অবিনশ্বর আত্মার চিরানন্দে শিববিশ্বাস আধুনিকের মনে দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের জন্ম দিল, অহংগত বিশ্বের স্থূল বাস্তবতাই যখন একমাত্র সত্য বলে স্বীকৃত ও গৃহীত হল, প্রেমকে যখন 'ফাঁকা প্রলাপ' বলে মনে হল, দৈহিক প্রয়োজনের আনন্দ ছাড়া প্রেমের আর কোন অর্থ বা তাৎপর্য নেই বলে প্রতিভাত হল—এই যখন আধুনিকদের শক্তিমান কবিরা স্বীকার করে নিলেন, মোহিতলাল তখন আধুনিকদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে দিলেন। তবে কি ভাবে মোহিতলাল আধুনিকদের পুরোধা ? মোহিতলালের সংগ্রাম অতিস্থূলতা,

বাস্তবতা ও যৌনসর্বস্বতার বিরুদ্ধে, অশ্লীলতা ও অসংযমের বিরুদ্ধে, দেহাতীত আত্মার অপমানের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে মোহিতলালের দীক্ষা, অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব তিনি স্বীকার করেন না। আধুনিকদের তিনি একদা সহযাত্রী, অথচ তাঁদের তিনি কঠিনতম ভর্ৎসনা করেছেন। তা কিসের জন্য? সত্যের জন্য। তিনি 'সত্যসুন্দরদাস' এই ছদ্মনামে 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় যে সাহিত্যচিন্তা প্রকাশ করেছেন, তারই কাব্যরূপ বিধৃত হয়েছে 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরল' কাব্যে।

রবীন্দ্রকাব্যে যেমন প্রবৃত্তির প্রশ্রয় আছে, মোহিতলালের বলিষ্ঠ জীবনবাদেও তেমনি প্রশ্রয় আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে আত্মার সন্ধানই অমৃতসন্ধান, মোহিতলালের কাছে 'দেহই অমৃতঘট,—আত্মা তার ফেন-অভিমান'। রবীন্দ্রকাব্যে প্রবৃত্তি বৃহতের প্রতি, আত্মানুসন্ধানের প্রতি, বস্তুকে অতিক্রম করার প্রতি। বস্তুময় স্থূল ভোগসর্বস্ব জগৎকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন। মোহিতলালের প্রতিবাদ এইখানে: কল্পিত সত্যের জন্য তিনি বাস্তব সত্যকে ত্যাগ করতে রাজি নন। মোহিতলাল বলেন, প্রবৃত্তি সত্য, ইন্দ্রিয় সত্য, দেহ সত্য —দেহটাই যাতনা। দেহের মধ্যেই আছে সহস্র সুখ, অজস্র স্বপ্ন, অযুত বসন্ত। এই দেহকে অস্বীকার করে আত্মার ধ্যানে বসতে তিনি রাজি নন, পরন্তু 'দেহ আছে' এই সত্যকে স্বীকার করেই তিনি এগোতে চান। প্রাণান্তে দেহের মূল্য তিনি

কখনো অস্বীকার করতে চান না। তাঁর কাছে দেহ শুধু ভোগের বস্তু নয়, পূজার বস্তুও বটে। আধুনিকদের কাছে দেহ ভোগের আধার ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁরা দেহতত্ত্বের সূত্র ধরে আরো নীচে নেমে গেলেন। এখানেই মোহিতলালের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ। মোহিতলালের কাছে, দেহ আত্মার দেহলি। সেই জন্যই দেহোপাসনায় তাঁর অমিত আগ্রহ। দেহকে কেন্দ্র করেই তাঁর তত্ত্বস্থাপনা, তর্ক, প্রতিবাদ। আর এখানেই তাঁর আন্তর-দ্বন্দ্ব। দেহের মাঝে, ভোগায়তনের পীঠ-স্থানে তিনি আত্মার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করেছেন।

একবার তিনি বলেন ঃ

> সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার!
> যূপবদ্ধ পশু আমি?—ভবিয়েছি মৃত্যুর খর্পর
> তপ্ত শোণিতের ধারে?—না! না! সে যে মধুর উৎসার!
> দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার!
>
> (পান্থ, বিস্মরণী)

নারী-নিন্দুক বেদনাবাদী দার্শনিক শোপেনহাওয়েরের প্রতিবাদে তিনি নারীবন্দনা করলেন। কিন্তু তারপরই কবি 'ভিরেট' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করলেন 'প্রেতপুরী' কবিতা। সেখানে কামনার পীঠভূমি দেহশ্মশানে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত কবিকণ্ঠের আর্ত হাহাকার ঃ

> আমারও মিটেছে সাধ,
> চিত্তে মোর নামিয়াছে বহুজন-তৃপ্তি-অবসাদ!

তাই যবে চাই তোমাপানে—
দেখি, ওই অনাবৃত দেহের শ্মশানে
প্রতি ঠাঁই আছে কোনো কামনার সদ্য-বলিদান !
—চুম্বকের চিতাভস্ম, অনঙ্গের অঙ্গার-নিশান !
যবে তোমা বাঁধিবারে যাই বাহুপাশে—
অমনি নয়নে মোর কত মৌনী ছায়ামূর্তি ভাসে !

(হেমন্ত গোধূলি)

এই আন্তর-দ্বন্দ্বে কবি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। এখানেই কবিজীবনের সত্য পরিচয়টি নিহিত আছে।

মোহিতলালের সমগ্র কাব্যসাধনায় এই আন্তর-দ্বন্দ্বের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। মহৎ অতৃপ্তি ও ক্ষুধা, মহৎ অসন্তোষ ও বেদনা সকল উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার উৎসভূমি। মোহিতলালের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাঁর কবিহৃদয়ের হাহাকার —রূপ-পিপাসা ও প্রেম-পিপাসার দ্বন্দ্বোত্থিত একটি বেদনার গীতধ্বনি, বাংলা কাব্যে এই ধ্বনিই একটি স্বতন্ত্র সুর সৃষ্টি করেছে। রূপলালসার মধ্যেই প্রেমের পরমতৃষা। তারই কারণে মোহিতলালের কবিতা এমন ভাবগভীর ও বেদনামুখরিত হয়ে উঠেছে। তাই মোহিতলালের কাব্যরস মননজাত (Intellectual) না হয়ে পারে না। এই অধ্যাত্ম-পিপাসাই মোহিতলালের কাব্যজীবনের ক্রন্দন। এখানেই তিনি মহৎ কবি।

বেদনার এই গীতধ্বনি সার্থক বাণীরূপ লাভ করেছে 'স্মরগরল' কাব্যের 'স্মরগরল' ও 'দেবদাসী' কবিতা দুটিতে।

'স্মরগরল' কবিতায় তাই কবিকণ্ঠে বেদনার্ত বিলাপধ্বনি বেজে উঠেছে :

ওগো দুখহীন সুখ-লম্পট ! সুরতের কৌতুক
তোমাদেরি বটে, সে লীলারভসে নহি আমি উৎসুক।
মোর কামকলা—কেলি-উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন-বিলাস—
আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ !.........
আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ !
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না—
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত !

'দেহ-লাবণ্যের হোমানল' জ্বালিয়ে কবি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সাধনায় বসেছেন। ভোগীর মতো সংসারকে ভোগ করা যাবে না, অথচ যোগীর ন্যায় তাকে ভুলে যাওয়া যাবে না : সাধনার এই নির্মমতম দুরূহতম তপশ্চর্যায় বসে কবিপ্রাণের তাই আর্ত-ক্রন্দন ! সংশয়ের সকল আনন্দ-বেদনার অনুভূতিকে হৃদয়ে বহন করে কেবল সঙ্গীতের আনন্দধারা সৃষ্টি করতে হবে। সুখাবেশে কণ্ঠ যেন না গদগদ হয় ; দুঃখজ্বালায় যেন না স্বর কাঁপে ; অন্যথায় তালভঙ্গ হবে, হৃদয়-বাসী সুন্দর-দেবতা বিমুখ হবেন। এই 'অসিধারা'-ব্রতই কবির সারা প্রাণকে দুঃসহ দুঃখে মূর্ছিত করে। এ যেন দেবদাসী। 'মমতার মোহ, প্রণয়ের পাপ' যেন না তাকে স্পর্শ করে, পাষাণ-দেবতার

সামনে নৃত্যের মাধ্যমে প্রেমকে রূপায়িত করে তুলতে হবে। সেই দুরূহ তপশ্চর্যা দেবদাসীর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। তাই দেবদাসীর কণ্ঠে বেজে ওঠে ঃ

ওগো দেব ! তুমি চাহ না আমারে
চাহ মোর বরতনু ?…
তব দেউলের দ্বারে বন্দিনী
উৎসব-দাসী আমি।

আমি সে নটিনী, তুমি নটনাথ,
তোমার নয়নে অসি খর-ঘাত—
ছন্দে ও লয়ে তাল কাটে কিনা
নেহারিছ দিন-যামি !…

নাট-দেউলের নটিনী যে আমি,
তোমারি দুয়ারে বাঁধা !
মমতার মোহ, প্রণয়ের পাপ
হানিবে আমারে সুকঠিন শাপ,
কটির মেখলা মূক হয়ে যাবে,
নূপুরে বাজিবে বাধা !

যবে সে ক্ষণিক ধূপের ধোঁয়ায়
তোমারে আড়াল করে,—
পলকে লুটাই আপনার পা'য়
নয়নেরি কূলে কুহেলি ঘনায় !
প্রাণের ভিতরে হাহা করে প্রাণ
ধরণীর ধূলি-তরে ! (দেবদাসী, স্মরগরল)

দেবদাসীর হাহাকারধ্বনির অন্তরালে কবি আপন কাব্যজীবনের কাহিনীকেই রূপ দিয়েছেন।

॥ ৫ ॥

বোধ করি এখন নির্ভয়ে বলা যায় কবি মোহিতলাল জীবনরসিক। বলিষ্ঠ জীবনবাদই তাঁর কাব্যের মূল সুর। তাই তিনি দেহ-বন্দনা ও নারী-বন্দনায় সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। বুদ্ধ, শংকরাচার্য ও শোপেনহাওয়ের-এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। 'মৃত্যু-শোক' কবিতায় মোহিতলাল যে দেহ-বন্দনা করেছেন, বাংলা কাব্যসংসারে তার একক অবিচল প্রতিষ্ঠা। এই কবিতায় মোহিতলাল দেহকে বলেছেন আনন্দদেহলি, দেবতারও ঊর্ধ্বলোকে তার স্থান।

গভীর বিশ্বাসে কবি বলেছেন ঃ

তোমারেই চিনি, হে দেহ-দেবতা!—প্রলয়ের একাকার
তুমিই রুধিছ বহুবিধ রূপে তোমারে নমস্কার!
দেহে-দেহে তুমি, এত অভিনব!
দেহের বাহিরে কোথা বাস তব?
হাসি-ক্রন্দন—তব উৎসব! পিরীতির পারাবার!
অধরে, উরসে, চরণ সরোজে আরতি যে অনিবার!···
যার সাথে দেখা শুধু একবার, অসীমের সীমানায়,
জন্ম-নদীর জল-বুদ্বুদ মৃত্যুর মোহানায়!—

চল-তরঙ্গ তটের কিনারে
আছাড়ি পড়িয়া গড়িছে যাহারে,
তার সে ভঙ্গি ধরিতে কে পারে স্রোতোমুখে পুনরায় ?
তাই জীব যে গো শিবেরও অধিক দুর্লভ-কামনায় !

(বিস্মরণী)

দেহকে এই দুর্লভ সম্মান আর কোনো বাঙালি কবি দিয়েছেন বলে জানি না। এই দেহের পূর্ণ আস্বাদনই কবির সাধনা। আর এই দেহ প্রকটিত হয়েছে অর্ধনারীশ্বর সত্তায়, এক দিকে যোগনিমগ্ন পুরুষ—অপর দিকে লীলাচঞ্চলা প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে যাঁরা অস্বীকার করেছেন, মোহিতলালের কাছে তাঁরা লাভ করেছেন তীব্র ভর্ৎসনা ও ধিক্কার, তার প্রমাণ 'মোহমুদ্গর' ও 'বুদ্ধ' কবিতা। 'নারীস্তোত্র' কবিতায় ('স্মরগরল') এই প্রকৃতিরূপিণী নারীকে মোহিতলাল বন্দনা করেছেন। কবি জেনেছেন, এই নারী সমগ্র সৃষ্টিপ্রবাহকে ধারণ করে আছে, পুরুষের কামনা নারীতেই রূপলাভ করে। 'ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড তাই বাম করে', সেই 'নরবধূ' নারীর উদ্দেশ করে কবি বলেছেন :

নমি সেই মানবীরে—দেবী নহে, নহে সে অপ্সরা ;
চিনেছি তোমারে, নারী, অয়ি মুগ্ধা মর্ত-মায়াবিনী !
বহিতেছ হাসিমুখে পুরুষের পাপের পসরা—
তোমারে নরকে সঁপি' হতভাগ্য স্বর্গ লবে জিনি' !
মানসমোহিনী অয়ি, মানবের দেহ-প্রসবিনী,
কবে স্বর্গ ঘুচে যাবে ?—ঘুচে যাবে আত্মার প্রমাদ ?

'তোমারি মাঝারে হেরি নিখিলের প্রাণ-প্রবাহিণী
লভিবে নিবৃত্তি নর, ফুরাইবে নিত্য-বিসম্বাদ—
মৃত্যু-মুক্তি হবে কবে ?—ঘুচে যাবে চিরতরে অমৃতের সাধ ?

কবি আরও বলেছেন ঃ

প্রকৃতির প্রাণরূপা, স্বতঃস্ফূর্ত আহ্লাদিনী রতি—
স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী ও যে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী, নহে সে অসতী।
('নারীস্তোত্র', স্মরগরল)

কিন্তু এই 'নারীস্তোত্র' কবিতাতেই মোহিতলাল নারী সম্পর্কে বিরূপতাও প্রকাশ করেছেন, বলেছেন ঃ

দেহই অমৃত-ঘট, আত্মা তার ফেন-অভিমান !
সেই দেহ তুচ্ছ করি' আত্মা-ভয়-বন্ধন-জর্জর
ভ্রমিছে প্রলয়-পথে, অভিশপ্ত প্রেতের সমান—
আত্মার নির্বাণ-তীর্থ নারী-দেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান !

জীবনের দেহলিতে নারীই প্রতিমা ; আর সেই নারীদেহেই 'আত্মার নির্বাণতীর্থ' ! কোন্ Divine Discontent এখানে কবিকে বিচলিত করেছে, তার সন্ধানেই এর সমস্যার সমাধান রয়েছে। 'স্মরগরল' কবিতায় বোধ করি এরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে ঃ

'আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ !'

এই ক্রন্দন কিসের জন্য ? 'আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত।' কবি ব্যর্থ অনুসন্ধান করেছেন, শুনেছেন 'দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত !' এই মহৎ ব্যাকুলতাই মোহিতলালের কাব্যকে অমরতা দান

করেছে। এখানেই তিনি বীরাচারী, তান্ত্রিক। নারী ও কামনাকে জীবনসাধনার উপকরণ রূপে কবি ব্যবহার করেছেন, চেয়েছিলেন মর্ত্যজীবনেই দেহের দেহলিতে আত্মার অধিষ্ঠান। কিন্তু হায়! সে দেহলির প্রতিমাই সেই সিদ্ধির অন্তরায়। তাই বীরাচারী পুরুষ-কবির ক্রন্দন, আর তা থেকেই মহৎ কবিতার জন্ম। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই ক্রন্দন একক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। নারী-নিন্দুক দার্শনিক সন্ন্যাসী শোপেনহাওয়েরের উদ্দেশে রচিত দীর্ঘ 'পান্থ' কবিতাটিতে ('বিস্মরণী' কাব্যে) মোহিতলালের এই জীবনদর্শনেব পূর্ণ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি।

কবিজীবনের যে ব্যর্থ সাধনখানি কবি বহন করে চলেছিলেন, দার্শনিক সন্ন্যাসী শোপেনহাওয়েরের কাছে বুঝি বা সে ব্যর্থতার সমাপ্তি ঘটেছে। কবি স্বীকার করেছেন :

> সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী।
> সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা।—

তবু কবি দেহারতি করেন :

> জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে।
> ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি' কামানল!—
> এ দেহ ইন্ধন তায়—সেই সুখ!—নেত্রে মোর নাচে
> উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা!—পাত্রে ঢালি লোহিত গরল!
> মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি' ভয়ে ভয়ে পরসাদ যাচে!
> মুহূর্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি হৃদ্‌পদ্ম-দল।
> যামিনীর ডাকিনীরা তাই হেরি' এক সাথে হাসে খল খল!

শোপেনহাওয়েরের perpetual drudgery মোহিতলালের কাছে উগ্র সোমরসে পরিণত হয়েছে। শেষে কবির স্বীকৃতি ঃ

জীবনের দুঃখ-সুখ বার-বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো!

পরাভবের বেদনা এবং শান্ত স্বীকৃতির আনন্দ—দুই-ই বিধৃত হয়েছে এখানে ঃ

নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি গুমরি!
উমা সে গিয়েছে ফিরে। অশ্রু চোখ ম্লান ছল-ছল—
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন-উপরি ;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ—পক্ক বিম্বফল!
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
বধ্বর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা মরি মরি!

এইখানেই ব্যর্থতার উপরে জয়লাভ করেছে সৃষ্টির আনন্দবোধ। তাই পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বে পুরুষের পরাজয়ে কবি আর ক্ষুব্ধ নন, গম্ভীর কণ্ঠে শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন ঃ

সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা!—
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ-স্বপন!
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা—
ফিরে ফিরে আসি তাই, ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ!
এই জন্ম মালিকার—মৃত্যু সূচী, ডোর ভালবাসা—
প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন—
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত-নয়ন!

কবিচিত্তে এই সত্যদর্শন হয়েছে বলেই মোহিতলাল ভারতীয় কবি। তিনি শোপেনহাওয়েরের নৈরাশ্য ও ডি এইচ লরেন্সের খণ্ডিত জীবনবোধ অতিক্রম করে পূর্ণ জীবনবোধে পৌঁছতে পেরেছেন। 'বিস্মরণী'র 'পান্থ' কবিতা থেকে 'স্মরগরলে'র 'নারীস্তোত্র' কবিতায় মোহিতলাল পৌঁছতে পেরেছেন এই 'ভালবাসার ডোর'কে মেনে নিয়েই। নারী-আরতি থেকে নারী-অস্বীকৃতি, পুনশ্চ স্বীকৃতিদানের মধ্যেই মোহিতলালের কাব্যবোধ পূর্ণতা লাভ করেছে।

'ভারতী' পত্রিকার অতীন্দ্রিয় শুচিবাদ থেকে একদা মোহিতলাল যাত্রা শুরু করেছিলেন। দেহসম্ভোগের উত্তাপ ও বহ্নিজ্বালা এনেছিলেন 'কল্লোল'-পর্বে—'পান্থ', 'প্রেতপুরী', 'নাগার্জুন' কবিতায় যে মোহিতলাল, শান্ত বাংলা কাব্যকুঞ্জে সে অচেনা আগন্তুক। কিন্তু দেহসম্ভোগের ঘুরপথে গিয়ে মোহিতলাল মুক্তি পান নি, তাই বলেছেন 'আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি যত হেরি তার মুখ।' রোমান্টিক বলেই কবি দেহভোগকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেন নি, শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক বেদনা-সরণিতে রবীন্দ্রতীর্থের প্রতি চলেছেন। সংসার ও জীবনকে তিনি দুহাতে সম্ভোগ করতে চেয়েছিলেন। তারই বিপুল আনন্দ তিনি কাব্যপথে রেখে গেছেন। 'কল্লোলে'র নেতিবাদ ও রিক্ততাকে তিনি সমর্থন করেন নি, বলিষ্ঠতা ও সংস্কাররাহিত্যকে মাত্র সমর্থন করেছিলেন। জীবনরসিক মোহিতলাল লালসা ও কামনাকে বিকৃত না করে

সহজ স্বভাবধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন। 'স্বপনপসারী'র 'পাপ' কবিতায় তাই লালসার শুচিশুভ্র স্বীকৃতি।

॥ ৬ ॥

কবি মোহিতলাল যে জীবনদর্শন তাঁর কাব্যে উপস্থিত করেছেন, তা মর্ত্যজীবনসম্ভোগের দর্শন। তাই মোহিতলালের প্রেমচিন্তায় এই জীবনানুরক্তি ও ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রবল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা সহজেই অনুমেয়। নারীকে অবলম্বন করেই মোহিতলালের প্রেমদর্শন গড়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বারোটি কবিতা একত্র পাঠে সম্পূর্ণ ধারণা গড়ে তোলা যায়, একথা বলেছেন অধ্যাপক শ্রীতারাচরণ বসু তাঁর 'মোহিতলালের স্মরগরল' গ্রন্থে : 'স্বপনপসারী' কাব্যের 'পাপ', 'মৃত্যু' ও 'অঘোরপন্থী' ; 'বিস্মরণী' কাব্যের 'পান্থ', 'স্পর্শরসিক' ও 'মোহমুদ্গর' ; 'স্মরগরল' কাব্যের 'নারীস্তোত্র', 'বুদ্ধ' ও 'প্রেম ও জীবন' ; এবং 'হেমন্ত-গোধূলি'র 'প্রশ্ন', 'অশান্ত' ও 'দুঃখের কবি'। এই বারোটি কবিতা মোহিতলালের প্রেমদর্শনের 'দ্বাদশ স্কন্ধ' রূপে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য। আবার এই কবিতাগুলির মাধ্যমে মোহিতলালের কবিমানসের একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভ করাও সুসাধ্য।

এই জীবনদর্শনকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা কঠিন। তথাপি একথা ভরসা করে বলতে পারি, মোহিতলালের দেহাত্মবাদ নাস্তিকতা নয়। আত্মার অস্তিত্ব কবি অস্বীকার করেন নি, তিনি

দেহকেই আত্মা বলেছেন, অর্থাৎ দেহদ্বারেই আত্মা এই প্রত্যক্ষ জগৎ ও মরজীবনে যে আনন্দরস আস্বাদন করে, তার বেশি কোনো অপ্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় ভূমানন্দের শূন্য সুখ কবি স্বীকার করেন না। জীবনের ওই আনন্দরস এমনই মহিমময় যে ওর বাইরে আর কোনো মোক্ষ সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, এমন কি তাকেই বার বার নব নব জন্মে নব নব রূপে আস্বাদনের অতৃপ্ত কামনাও থাকবে না। জগৎ ও জীবনের যে আনন্দমেলায় মানবাত্মার ভোগ ও মোক্ষ এমন একাকার হয়ে আছে, প্রকৃতিই তার অধিষ্ঠাত্রী, একেশ্বরী; পুরুষ তারই আমন্ত্রিত অতিথিরূপে বিশ্বপ্রপঞ্চের এই প্রাণপ্রবাহে ধরা দিয়ে তারই প্রদত্ত পীযূষ-পায়স-পানে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়ে। প্রকৃতির এই আনন্দমেলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী নারী; মোহিতলালের কাব্যে তাই নারীর বন্দনা। প্রকৃতির দেহধারিণী প্রতিমা নারীর বন্দনায় কবি সমস্ত অনুরাগ ও আবেগ ঢেলে দিয়েছেন, 'বিস্মরণী'র 'পান্থ' ও 'স্মরগরলে'র 'নারীস্তোত্র' তার প্রমাণ। এখানেই মোহিতলালের কবিপ্রতিভা বক্তব্যের স্বাতন্ত্র্যে বঙ্গকাব্যভূমে বিরাজমান।

খরধার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দীর্ঘ তানে, দৃঢ়বদ্ধ কঠিন কাব্যদেহ নির্মাণে, শব্দপ্রয়োগে সচেতন সংযমে, ধ্রুপদী ক্লাসিকাল রীতির প্রতি আনুগত্যে কবি মোহিতলালের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। আবেগকে তিনি বুদ্ধির বাঁধনে বেঁধেছেন, কল্পনাকে ক্লাসিকাল-সংহতি-নিগড়ে আবদ্ধ করেছেন, মননবৃত্তির দ্বারা

আবেগের পতনকে রোধ করেছেন। তার ফলে প্রতি স্তবকের গ্রন্থন-সৌষ্ঠবে গান্ধার ভাস্কর্যের কঠিন সংহতি ও য়ুনানী স্থাপত্যের কঠিন মসৃণতার ছাপ পড়েছে। বাংলাদেশের জোলো কাব্যভূমিতে এই প্রস্তর-কঠিন সংহতি বিরল ব্যতিক্রমরূপেই বর্তমান থাকবে বলে আশা করি।

'পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে' কবিতায় মোহিতলাল আশা প্রকাশ করেছিলেন ঃ

> যা পেয়েছি আর যা দিয়েছি আমি, সে স্মৃতির মঞ্জুষা
> রতনে-হিরণে বাঁধিয়া রাখিনু গানের গাঁথনি দিয়া ;
> ব্যথা নাই কোথা', ক্ষোভ নাই মোর—গড়েছি বুকের ভূষা,
> কালফণী-শিরে আছিল যে মণি তাহাই মাজিয়া নিয়া।
>
> (হেমন্ত-গোধূলি)

কবির এই আশার মর্যাদা বাঙালি কাব্যপাঠক রাখবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

দশম অধ্যায়

কালিদাস রায়

॥ ১ ॥

প্রতি কবির জীবনেই একটি সমস্যা একবার না একবার রেখাপাত করে। সে সমস্যা দুই বিপরীত কোটির আকর্ষণ—যুগপ্রেম ও ঐতিহ্যপ্রেম। যাঁরা যুগপ্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁরা বর্তমানের দ্বারা অভিনন্দিত হন। আর যাঁরা ঐতিহ্যপ্রেমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, তাঁরা বর্তমানের উপেক্ষার দ্বারাই স্বীকৃত হন। রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজে যে ক'জন কবি ঐতিহ্যপ্রেমী, তাঁদের ভাগ্যে এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, পরিমলকুমার ঘোষ, রমণীমোহন ঘোষ প্রমুখ কবিরা বর্তমান শতকের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু বর্তমানের নৈরাশ্য-অশান্তি-ভাঙন-উত্তেজনা-অবসাদ-কোলাহলের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। এঁদের মূল আকর্ষণ বাংলা দেশের গ্রামজীবন। এঁদের কাব্যজীবনে কখনো সংশয় দেখা দেয় নি, বর্তমানের অশান্তি ছায়াপাত করে নি, বস্তুতঃ এঁদের কাব্যপথ ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ পল্লীপথ, তার দুপাশে বনতুলসী ও বনমল্লিকার শোভা।

বোধ করি এই পটভূমির কথা স্মরণে রেখেই রবীন্দ্রনাথ কবিশেখর কালিদাস রায়ের (জন্ম ১৮৮৯ খৃঃ) কবিতা সম্পর্কে

মন্তব্য করেছিলেন, "তোমার কবিতা বাংলাদেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।" কালিদাস রায় বাংলা দেশের সেই গত জীবনের pastoral কবি।

কালিদাস রায়ের কাব্যজীবন দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী ধরে প্রসারিত। যে মনোভাব ও কাব্যানুভূতি নিয়ে তিনি এই শতকের সূচনায় যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখেই তিনি আজো চলেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের তালিকা এই : কুন্দ (১৯০৭), কিসলয় (১৯১১), পর্ণপুট ১ম (১৯১৪), ব্রজবেণু (১৯১৫), বল্লরী (১৯১৬), ঋতুমঙ্গল (১৯২০), পর্ণপুট ২য় (১৯২১), ক্ষুদকুঁড়া (১৯২২), লাজাঞ্জলি (১৯২৪), রসকদম্ব (১৯২৫), চিত্তচিতা (১৯২৫), আহরণী (সংকলন : ১৯৩২), হৈমন্তী (১৯৩৬), বৈকালী (১৯৩৮), ব্রজবাঁশরী (১৯৪৫), আহরণ (সংকলন : ১৯৫০), গাথাঞ্জলি (১৯৫৭), সন্ধ্যামণি (১৯৫৮)। তা ছাড়া পাঁচটি অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন : গীতগোবিন্দ (১৯৩০), গীতালহরী (১৯৩২), শকুন্তলা (১৯৪৪), কুমারসম্ভব (১৯৫২), মেঘদূত (১৯৫৫)। গত পঞ্চাশ বছরে তিনি বাংলাদেশের প্রায় সকল সাহিত্য পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখে

আসছেন। এবং খুবই স্বাভাবিক যে, অজস্র কবিতার ধারায় উৎকৃষ্ট সার্থক কবিতার সঙ্গে বহু অপকৃষ্ট কবিতাও এসেছে। কবি নিজেই বলেছেন, 'বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয় দশকেই আমার কবিতার ক্ষেতে প্রচুর ফসল হয়েছিল—তাতে পরবর্তী দশ-পনেরো বছর মাসিকপত্রের রসদের যোগান দিতে পেরেছিলাম। অবিরত মাসিকপত্রে গল্পের তলায় কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় নামটি দেশে পরিচিত হয়ে গেল।" ('সংবর্ধিতের ভাষণ', শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৬৪)। এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমাণ ধারা প্রমাণ করে তাঁর নিষ্ঠা, সাধনা ও একাগ্রতা—আর তাই তাঁকে দিয়েছে বিশিষ্টতা।

বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে রাঢ়ী বৈদ্যবংশে—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুরের বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যজীবনে দুটি বস্তু প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথমত, পল্লীগ্রামের পরিবেশ, দ্বিতীয়ত বৈষ্ণব কাব্যসংস্কার। প্রথমটির কথা গোড়ায় বলেছি, দ্বিতীয়টির ভূমিকা রচিত হয়েছে তাঁর বংশধারায়, পরিপুষ্টি ঘটেছে তাঁর কাব্যজীবনে। একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন (দ্রষ্টব্য 'সংবর্ধিতের ভাষণ', তদেব)। ১৯২০ সালে তিনি রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ থেকে 'কবিশেখর' উপাধি লাভ করেন। এই উপাধিতেই কবি আজ সুপরিচিত। 'মানসী', 'বঙ্গবাণী' থেকে সুরু করে আজকের 'কথাসাহিত্য', 'শনিবারের চিঠি', 'সংহতি', 'ভারতবর্ষে' তিনি কবিতা লিখেছেন অশ্রান্ত বেগে।

॥ ২ ॥

কার্লাইল প্রতিভার লক্ষণ আবিষ্কার করতে গিয়ে বলেছিলেন, প্রতিভা হল সেই বস্তু যার আছে 'capacity of taking infinite pains'। এই যদি প্রতিভার একমাত্র লক্ষণ হয়, তাহলে কালিদাস রায় অবশ্যই প্রতিভার অধিকারী। তাঁর কবিতাপাঠে এর প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। কি কবিতার বিষয়বস্তু, কি কবিতার দেহনির্মাণ, কি কবিতার উপাদান সংগ্রহ—সর্বত্রই সযত্ন পরিশ্রমের পরিচয় রয়েছে। লিরিক, সনেট, এপিগ্রামাটিক পোয়েম, গাথা, নাট্যকবিতা, প্রশস্তিমূলক কবিতা, রঙ্গব্যঙ্গের কবিতা, শিশুরঞ্জন কবিতা, গান—সবই তিনি লিখেছেন। তাঁর কবিতার উপাদান প্রধানত পল্লীজীবন; সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্বদেশ-প্রেম, বীরগণের শৌর্যাবদান, মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা, বাৎসল্যমাধুর্য, দাম্পত্য প্রেম, ভগবদ্‌ভক্তি, নারীর সতীত্ব-গৌরব ও গৃহ-লক্ষ্মীত্ব, বীরাঙ্গনাদের আত্মাহুতি, গার্হস্থ্যজীবনের সুখদুঃখ, বাঙালির উৎসব আমোদ পূজাপার্বণ, বাংলা ও ভারতের সংস্কৃতি, শিক্ষক-জীবন। তাঁর মনের ভূমিতে বৈষ্ণব কবিতা, ইংরেজি রোমান্টিক কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা—এই তিনের ভাল চাষ হয়েছিল। অবশ্য প্রথমটির কর্ষণ ও ফলনই বেশি সার্থকতা লাভ করেছে। বৈষ্ণব ভাবজীবনের বেদনা ও ভাবাকুলতা কালিদাসের কবিতায় আছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তার সঙ্গে একটি শাণিত যুক্তিবোধাশ্রিত তীক্ষ্ণাগ্র তথ্যসমন্বিত

সচেতন কবিমনেরও দেখা পাই—যা একান্তই আধুনিক, অবৈষ্ণবোচিত, কতকটা ড্রাইডেন-অনুসারী। প্রশ্ন এই, তথ্যের গুরুভার কি কাব্যের ভাবোচ্ছ্বাসকে মুক্তি দিয়েছে, না, পিষে মেরেছে? এই প্রশ্নের উত্তর পাঠকরা কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাব্যপাঠে সহজেই পাবেন।

কবিতা রচনায় কালিদাস যে কী পরিমাণে আয়াস স্বীকার করেন, তার একটি প্রমাণ গ্রহণ করা যাক্। এই কবিতা থেকেই তাঁর ছন্দোনৈপুণ্য, চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য এবং তথ্যসমাহরণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। 'ঋতুমঙ্গল' কাব্যের প্রথম কবিতাটি, 'ঋতুলক্ষ্মী'—এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছিঃ

নিদাঘে তোমার রুদ্রাণীরূপ, ইন্দ্রাণী বরষায়,
শরতে শুভ্রা বাগ্‌দেবী তুমি, ভাস্বর তব কায়।
শ্যাম হেমন্তে কল্যাণী রমা, অন্নপূর্ণা শীতে,
প্রেম-বসন্তে ফুলধনু রচ' রতিরূপে অটবীতে।
এক চোখে হাসি, আর চোখে ধারা, মেঘে-রচা তব বেণী,
অশেষ শ্যামল বাসবিস্তারে শ্যামলা যাজ্ঞসেনী।
"পদাঘাত তব, শুষ্কশাখায় অশোকের বিকাশক,
সীধু-গণ্ডূষে বকুল বিলসে, আশ্লেষে কুরবক।
পরশে তোমার ফুটে প্রিয়ঙ্গু, মন্দার মধুভাষে,
বদনমারুতে চূতমঞ্জরী, চম্পক মৃদু হাসে;
সঙ্গীতরসে নমেরু বিকসে—নটনে কর্ণিকার,
তিলক কুসুম পুলক শিহরে—দৃষ্টির উপহার
হস্তে তোমার লীলারবিন্দ, কুন্দ অলক 'পরে,

লোধ্র-পরাগে গণ্ড তোমার পাণ্ডুর শোভা ধরে,
চূড়াপাশে তব নব কুরবক, শ্রবণে শিরীষ-ফুল,
চারু সীমন্তে পুলকাঞ্চিত শোভে কদম্ব ফুল।"
ষট্পদরুত ষড়্‌রাগে তব লীলাহিন্দোলা দোলে,
মৃত্তিকা 'পরে কৃত্তিকা তুমি ষড়ানন তব কোলে॥

এই কবিতায় কবি অশেষ নৈপুণ্যে ঋতুলক্ষ্মীর প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। কুরুসভায় দ্রৌপদীর অফুরন্ত বসনের সঙ্গে প্রকৃতির অশেষ শ্যামলতার তুলনা করে কার্ত্তিকধাত্রী কৃত্তিকা প্রমুখ ছয় ভগিনীর সঙ্গে প্রকৃতি লক্ষ্মীর কোলে ছয়ঋতুর সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন। এই কবিতার ৭ থেকে ১২ পংক্তি সাহিত্যদর্পণের কবিপ্রসিদ্ধির অনুবাদ, ১৩ থেকে ১৬ পংক্তি মেঘদূত থেকে গৃহীত, বাকিটা কবির নিজস্ব। এই সব উপাদান নিয়ে কবি ঋতুলক্ষ্মীর প্রতিমা নির্মাণ করেছেন।

এই নৈপুণ্য ও পরিশ্রম কালিদাসের কাব্যসাধনার পিছনে বর্তমান। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যসাধনায় তিনি এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন। তার প্রমাণ দীর্ঘ গাথা-কবিতা ও ভারত-সংস্কৃতি-ভিত্তিক কবিতাগুলিতে আছে। দেশ ও কালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভারত-সংস্কৃতি-ধারাকেই কবি 'গঙ্গা' কবিতায় রূপ দিয়েছেন। এখানেও ঐ সমাহরণ-নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। এই দীর্ঘ কবিতার একটি স্তবকই কবির ভক্তি ও সমাহরণ-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচায়ক ঃ

কণ্ঠে তোমার বলাকার হার, অলকের ভূষা তুষারমোতি,
হংসমিথুন অঞ্চলে আঁকা, নয়নে তোমার উষার জ্যোতিঃ।

কর্ণে তোমার মণিকর্ণিকা, কেশে তব হৃষীকেশের পাণি,
কটিতে পীঠের মেখলা, শীর্ষে গঙ্গোত্তরী গুণ্ঠাখানি।
বঙ্গে তোমার দুই কূলে হরিকীর্তনে প্রেম-অশ্রু গলে,
অঙ্গে তোমার হরিনামাবলী প্রসাদী-পুষ্প-তুলসীদলে।
আরতি তোমার মুক্তজীবের চিতার শিখায় রাত্রিদিবা,
ভারতী নিত্য নবীন সূক্তে বন্দনা গায় নতগ্রীবা।
চর্মলোচনে তুমি পার্বতী নদীরূপা অতিবৃষ্টিধারা,
মর্মনয়নে ত্রিযুগবাহিনী এই ভারতের কৃষ্টিধারা। (আহরণ)

ষড়্‌মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দোলায় যুক্তাক্ষরের ধাক্কায় পাঠক-মনে বেগ সঞ্চার করে কবি ভারত-সংস্কৃতির বন্দনা গেয়েছেন। এখানে সত্যেন্দ্রীয় ছন্দোনৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়।

॥ ৩ ॥

বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুরের বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণব সাধনার ধারা কবি জন্মসূত্রে ও কাব্যসূত্রে গ্রহণ করেছেন। জীর্ণ পদাবলী-চয়ন-পুঁথি পড়তে গিয়ে কবি ভক্তি-বিহ্বল হয়ে বলেছেন,

ওসব কলঙ্ক নয়,—অশ্রুচিহ্ন ; ভক্ত ছিল তারা,
ঢালিয়াছে যুগে যুগে এর 'পরে প্রেমঅশ্রুধারা।
মুকুতা ছিদ্রিত বটে, সুর-সূত্র পরাইয়া তায়
তাহারা গেঁথেছে হার, তায় রাধাশ্যামের গলায়,
দুলিতেছে ঝলিতেছে। অভক্তই ছিদ্র তার খুঁজে,
কৃতজ্ঞতা-ভরে মোর এ চিন্তায় আঁখি আসে বুজে॥

('পদাবলী', আহরণ)

কালিদাসের কাব্যজীবনকে গড়ে তুলেছে যে বৈষ্ণব-সংস্কার, তার প্রতি কবির আনুগত্যের প্রমাণ এই পদ। বাঙালিসুলভ ভাবাকুলতা ও বৈষ্ণবসুলভ দীনতা, উভয়ের রমণীয় পরিণয় সাধিত হয়েছে 'পর্ণপুট', 'ব্রজবেণু', 'ব্রজবাঁশরী' কাব্যগ্রন্থে। বিশ শতকের মধ্যদিনে ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব ভাববিহ্বলতাকে অকৃত্রিমরূপে আন্তরিক বেদনায় উপস্থিত করার দুঃসাহসিক নৈপুণ্য এই কাব্যগ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। কবি যে ঐতিহ্যপ্রেমী, বাংলাদেশের চিরন্তন হৃদয়াবেদনের রসধারাই যে তাঁর কাব্য-জীবনের মূল উপজীব্য, তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। কবি অশেষ বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণের কথা আমি আকৈশোর অনেক লিখেছি, কিন্তু তা শুধু ছন্দশিল্পের নৈবেদ্য রচনা, তাতে ভক্তির তুলসীপত্রটি ছিল না। তবু ভগবান করুণা করে তাঁর চরণপদ্মদলে আমাকে দীর্ঘকাল ধরে আশ্রয় দিয়েছেন।" ('সংবর্ধিতের ভাষণ')। কেবল ভক্তি ও বিনয় সম্বল করে তিনি এই শ্রেণীর কবিতা রচনা করেন নি, রবীন্দ্র-যুগের ছন্দোনৈপুণ্য ও সংস্কৃতের বাগবৈদগ্ধ্য এবং অলঙ্কার-প্রীতিও আয়ত্ত করেছেন। বস্তুত কবি কালিদাস রায়ের লোক-প্রিয়তার অনেকটাই এই শ্রেণীর বৈষ্ণবকবিতার উপর নির্ভরশীল।

কালিদাসের জনপ্রিয়তম কবিতাটির উপজীব্য শ্রীকৃষ্ণ ; এই 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটি সুপরিচিত ও বহুশ্রুত :

নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।

জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥ (পর্ণপুট, ১ম)

কবি যে বৈষ্ণব কাব্যধারাকে বিশ্বস্তভাবে বহন করে চলেছেন, তা তাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনার সিংহাবলোকন করলেই বোঝা যায়। কেবল ছন্দে নয়, গদ্যেও এই কাব্যানুভূতি প্রাধান্য লাভ করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'লীলা-বক্তৃতা'য় কবি 'পদাবলী-সাহিত্যের' আলোচনায় তাঁর এই মনোধর্মটিকে প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলারূপের চিত্রণে ও আস্বাদনে কবির সমান উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। বিশ শতকের প্রখর রৌদ্রালোকে দাঁড়িয়ে যখন কবি 'রাখালরাজ'-এর বন্দনা করেন, তখন একটু বিস্ময় লাগে বৈকি! 'রাখালরাজ' কবিতায় কবির আকুল আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে ঃ

অবুঝ কানু কার মায়াতে ভুলে
গোকুল ছেড়ে চলে গেলি ভাই?
সেথায় কেবল হাতী ঘোড়ার মেলা,
তোর ত সেথা খেলার সাথী নাই।
কোথায় সেথা দূর্বাশ্যামল গোঠ,
রাখাল দলে খেলার হেন জোট,
ননীর মত কোমল ধবলদেহ
কোথায় সেথা এমন দুধল গাই!
এমন রাখাল-রাজ্যখানি ফেলে
কেমন করে' আছিস্ কানাই ভাই? (পর্ণপুট, ১ম)

এই ব্যাকুলতার গভীরতা ও আন্তরিকতাই কবি কালিদাসের প্রতিষ্ঠাভূমি।

॥ ৪ ॥

কবি কালিদাস ছায়াঘেরা শ্যামলস্নিগ্ধ পল্লীবাংলার কবি কেবল মমতা নয়, প্রকৃতিরূপচিত্রণে দক্ষতার পরিচয়ও এখানে পাই। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-ধৃত অভিমতের সমর্থনে এই শ্রেণীর কবিতা উল্লেখ করতে পারি। বাংলার পল্লীজীবনের অন্তর ও বাহিরের রূপমাধুরী কবিকে সমান আকর্ষণ করেছে। পল্লী-মায়ের কাছে কবির ব্যাকুল আত্মসমর্পণের কারুণ্য ও বেদনা 'প্রত্যাবর্তন' কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে ঃ

ভাঙা বাঁশী জোড়া দিয়ে বীণা ফেলে তাই নিয়ে ফিরিয়া এলাম,
বহু অপরাধ জমা, স্নেহভরে কর ক্ষমা, লও মা প্রণাম।
তিরিশ বছর পরে চিনিতে পারিবে তারে ? দ্বিধা জাগে তাই ;
মা কি কভু ছেলে ভোলে যতদূরই যাক চলে ?—বৃথাই শুধাই।
এ দগ্ধ ললাটতট স্নিগ্ধ করি দিক্ বটচ্ছায়ার প্রসাদ,
পাখীর ডানার ঘায়ে বকুল ঝরায়ে গায়ে কর আশীর্বাদ। (হৈমন্তী)

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার নাগরিক পবিবেশে আর কোনোদিন এই শান্ত নিভৃত গ্রামপথ ও ছায়াসুনিবিড় বটতলা ফিরে আসবে না ; কবির মতো প্রত্যাবর্তনের সৌভাগ্য আমাদের হয়ত হবে না। তাই এই কবিতানিচয়ের সাহচর্যে সেই অতীত ছায়াঘেরা গ্রামজীবনে আমরা ফিরে যেতে পারি। এখানেই এদের সার্থকতা।

বস্তুত কালিদাসের কবি-প্রতিভা এই বাংলামায়ের স্নেহ বর্ণনায় যে স্ফূর্তি লাভ করেছে, তা অন্যত্র দুর্লভ। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি 'ছায়া' কবিতাটি :

ছেড়ে যেতে চাহি পিছু পানে।
পথপাশে ছায়াখানি দিয়া যেন হাতছানি
স্নেহভরে দেহ মোর টানে।......
স্নেহের অঞ্চলখানি মাটিতে বিছানো জানি
অইখানে দুপুর বেলায়,
মায়ের সকল ছেলে সব কাজ খেলা ফেলে
ছুটে শ্রান্ত শরীর এলায়! (বৈকালী)

বাংলামায়ের প্রতি গভীর অনুরাগের অপর প্রকাশ 'বাংলার দীঘি', 'শরতের গ্রামপথে', 'পল্লীশ্রী', 'ষষ্ঠীতলা' প্রভৃতি কবিতা ('আহরণ' দ্রষ্টব্য)। সর্বত্রই কবি সুগভীর মমতাময়ী মাতৃহৃদয়কে আবিষ্কার করেছেন। 'বাংলার দীঘি' কবিতার প্রথম স্তবকটিতেই তার প্রমাণ পাই :

বাংলার দীঘি গভীর শীতল কবির স্বপ্নে গড়া
ছলছল কল-জলচঞ্চল মাতৃমমতা ভরা।
তব মাধুরীর নাহি পাই সীমা,
কভু বা বারুণী কভু তুমি ভীমা,
তুমি গ্রামান্তে স্বাগত-ভাষিকা দিনান্তদাহ-হরা,
গভীর স্বচ্ছ রবির মুকুর কবির স্বপ্নে গড়া। (আহরণ)

এই প্রীতির অপর দিক বাঙালি সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার কাব্যরূপায়ণ। প্রাচীন বাংলা সংস্কৃতি-সাহিত্য-ধর্ম-দিনচর্যার

উপরে লিখিত কবিতাচয়ে এর প্রমাণ আছে। 'চাঁদ সদাগর' কবিতাটি ('বৈকালী') এই অনুরক্তির সার্থক উদাহরণ।

॥ ৫ ॥

কবির বৃত্তি ছিল শিক্ষকতা। তাঁর কবিতায় এই বৃত্তির ছায়াপাত হয়েছে। সুপরিচিত 'ছাত্রধারা' কবিতাটি তারই প্রমাণ। 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে' যে নোতুন নোতুন ছাত্রদল আসে, তারা শিক্ষকের ঊষর জীবন-ভূমিকে শ্যামল ও সরস করে দিয়ে যায়; শিক্ষক-জীবনের সহস্র গ্লানি থেকে শিক্ষক-কবি এখানেই মুক্তি পেয়েছেন। গভীর আন্তরিকতার আলোকে 'ছাত্রধারা' কবিতাটি ভাস্বর হয়েছে। এই শ্রেণীর কবিতা বাংলা কাব্যে অতি বিরল। সমাজজীবনের একটি অবহেলিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ অংশে অভিনয় করার জন্য যাঁদের ডাক পড়ে, তাঁদের জীবনের ট্রাজেডি কালিদাস এই শ্রেণীর কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন (দ্রষ্টব্য—'শিক্ষক-জীবন', 'শিক্ষকের সান্ত্বনা', 'ছাত্রধারা' ঃ আহরণী)।

কবিশেখর আর একটি দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন—তা বাংলার গার্হস্থ্যজীবন। এক্ষেত্রে তিনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রজনীকান্ত সেন, মানকুমারী বসু, কামিনী রায় এবং সমসাময়িক কিরণধন, রমণীমোহন, পরিমলকুমারের সহযোগী। 'বৈকালী',

'লাজাঞ্জলি', 'পর্ণপুট', 'হৈমন্তী', 'ক্ষুদকুঁড়া' কাব্যে গার্হস্থ্যজীবনের কবিতা আছে। বাঙালি গৃহস্থঘরের সকল বেদনা, মাধুরী, আনন্দ, উল্লাস, দুঃখ, শোক এই কবিতানিচয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার প্রকৃতি এবং তারই পরিপূরক বাঙালি গৃহস্থজীবনের আলেখ্য—এদের প্রতি কবির যে গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধানুরাগ ছিল, তা কালিদাসের কাব্যসাধনায় স্বতঃপ্রমাণিত। কন্যাদায়, পুত্রশোক, গৃহবিবাদ, স্নেহস্মৃতি, বন্ধ্যার খেদ, শিশুর দুরন্তপনা, জননীর বেদনা, কিশোরীর বিস্ময়, বৌদিদির স্নেহ, কন্যার অভিমান, পিতার স্নেহ, অরক্ষণীয়ার ব্যথা, গৃহলক্ষ্মী স্ত্রীর শান্ত শ্রী—সব কিছুই কবিকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। অনুপম বাৎসল্য-চিত্র অঙ্কনে কালিদাস যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা বিরলদর্শন ; তারই সামান্য উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি ঃ

> সুধার চেয়েও মধুর তোদের হাসি
> সংকেতে তারি সংসারধারা চলে।
> তোদের মুখের তালপাতে রচা বাঁশী
> বাজিছে ভুবনে ভেদি' সব কোলাহলে।
> তোদেরি পালনে পিতা খাটে মাঠে ঘাটে,
> তোদেরি লালনে মায়ের জীবন কাটে,
> মর্জি না হলে পায় না অন্নজল,
> আর্জি তাদের তোদেরি ভুরুর তলে।
> খোসখেয়ালিয়া শাহান শাহের দল,
> তোদেরি হুকুমে সকল হাকিমই টলে।

শেষ পর্যন্ত কবি নওল-কিশোরের সঙ্গে বাঙালি ঘরের দুরন্ত শিশুকে এক করে দেখে বলেছেন,

তোদের স্বস্তি কল্যাণ অভিলাষ
সারাদেশ জুড়ে তীর্থ হইয়া রাজে।
মন-মুলুকের মালিক দুলালদল
নন্দদুলালও বিরাজে তোদের মাঝে ॥
('শিশু', পর্ণপুট)

॥ ৬ ॥

কবিশেখর কেবল গার্হস্থ্যজীবনের ও পল্লীজীবনের আনন্দ-বেদনার কবি নন, তিনি প্রেমের কবিও বটেন। সে প্রেম অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈষ্ণব কবিতার ঢঙে রচিত, কিন্তু তার সবই রাধাকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত নয়। কিছু কিছু কবিতা এই মর্তভূমির মানবীর উদ্দেশে রচিত। কেবল দাম্পত্য প্রণয় নয়, যে প্রেম শাসন-নাশন মানে না, যে প্রেম ঘর ভাঙে, যে প্রেম আপনাতে আপনি উন্মত্ত, সে প্রেমের কথাও কালিদাসের কাব্যে আছে, তবে তা প্রত্যক্ষ রূপে নয়, বেনামীতে। 'ব্রজবেণু' কাব্যের কবিতাগুলি প্রকৃত বৈষ্ণব কবিতা নয়—ভানুসিংহ ঠাকুরেরই অনুস্মৃতি, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির অনুস্মৃতি নয়। নিচের কবিতাটি পড়লে আশা করি পাঠকরা স্বীকার করবেন, আধুনিক প্রেমকবিতার বীণায় কালিদাস ঝংকার দিতে জানেন :

তব মনোবন মাঝে কার বীণাবেণু বাজে ? বলগো প্রিয়া,
কে তোমারে চুপে চুপে রাখে নব নব রূপে সঞ্জীবিয়া ?

কোন চিরসুন্দরী নিতি তুলে মঞ্জরি' প্রতিমা তব ?
অবিরত মধু ক্ষরে আলসে এলায়ে পড়ে অলি যে পিয়া।
সেই মুখে হাসিরাশি সেই ভালবাসাবাসি, মানসহরা,
একই সেই তনুমন একই কথা অনুখন আকুতিভরা,
তবু যা যখন লভি, মনে হয় যেন সবি সরস নব,
কে রহি ও-অন্তরে সদা ফুল-খেলা করে তোমা নিয়া ?

('চিরতরুণী', পর্ণপুট)

'পর্ণপুট, ১ম' ও 'ক্ষুদকুঁড়া'য় এই শ্রেণীর রোমান্টিক প্রেম কবিতা অবিরল। যেমন, 'পর্ণপুটের' 'মিলনোৎকণ্ঠিতা', 'ব্যর্থ বিলাস', 'প্রিয়ার কৈশোর', 'সম্পূর্ণতা', 'ভূষণ', 'চোখের জল', 'পূর্বরাগ', 'সমস্যা', 'অপরাধ কার', 'প্রথম বিরহ' এবং 'ক্ষুদকুঁড়া'র 'বাসর-স্মৃতি', 'প্রেমের গান' প্রভৃতি।

কিন্তু কবিশেখর কালিদাস রায়ের সার্থক পরিচয় এখানে নয়। আগেই বলেছি, পল্লীজীবন ও বৈষ্ণব-বাতাবরণে রচিত কবিতায় তাঁর প্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করেছে। এক কথায় বলতে গেলে, তিনি বাংলার কবি ; সেক্ষেত্রে তিনি কুমুদরঞ্জন, পরিমলকুমার, যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধানের সহযাত্রী। পল্লী-বাংলার রূপমুগ্ধ স্নেহমুগ্ধ এই কবি তাঁর জীবনের Last testament দিয়েছেন 'শেষ কথা' কবিতায় :

আমি বাঙ্গালীর কবি ; বাঙ্গালীর অন্তরের কথা,
বাঙ্গালার আশা-তৃষা, স্মৃতিস্বপ্ন, চিরন্তন ব্যথা
ছন্দে গেয়ে যাই আমি। অভ্রভেদী নহে তার তান,
দেশদেশান্তর লাগি নহে মোর কুলায়ের গান।

যুগযুগান্তর-পথে যাত্রা তার নহে কোনো দিন,
কুণ্ঠিত তাহার কণ্ঠ, বক্ষ ভীরু, পক্ষ তার ক্ষীণ।
আমি বাঙ্গালীর কবি। (বৈকালী)

ভালবাসার গৌরবে কবি বাঙালিজীবনের সকল দৈন্য গ্লানি-বেদনাকে অগ্রাহ্য করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, তিনি বাঙালির কবি। এই প্রেম তাঁর কাব্যজীবনকে সমৃদ্ধি দিয়েছে। এখানেই বোধ করি তাঁর কবি-প্রতিভা বর্তমানের অনাদর-উপেক্ষার সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে।

কাব্যজীবনের সত্যটি কবি প্রকাশ করেছেন গত শারদীয়া সংখ্যা 'বেতারজগৎ' (১৮৭৯ শকাব্দ) পত্রিকায়। আমার ধারণা, কালিদাসের কবি-মানসিকতার পূর্ণ পরিচায়ক হচ্ছে 'কবির বিদায়' কবিতার প্রথম ও শেষ স্তবকটি। সে দুটি এখানে তুলে দিয়ে আলোচনা শেষ করছি:

বিদায় নিল লুকোচুরি শিউলি যূঁইএর বনে
বিদায় নিল সজল চোখে ন'বছরের ক'নে।
বিদায় নিল কাঁচপোকা টিপ, নয়নে কাজল
নাকটি হ'তে নোলক মোতি, চরণ হ'তে মল।
বিদায় নিল লাল পেড়ে আধ ঘোমটাটি বধূর
সরল সভয় তরল চোখের চাউনি সুমধুর।
সুবাসভরা টেকা খোঁপার চারু চিকন ছবি,
তাদের সাথে বিদায় নিল কবি।......

ধনপতি সাধুর পায়ের উদ্ধত দাপট
ভেঙে দিল খুল্লনা মার চণ্ডীপূজার ঘট।

ধানদূর্বার আশিস গেল, মায়ের হাতের কৌঁটা,
হৃৎকমলের পাঁপড়ি ঝরে রইল শুধু বোঁটা।
যুগের হাওয়া বদ্‌লে গেল, নিভিয়ে দিল ঝড়
বঙ্গমাতার আঁচল আড়ের দীপটি মনোহর।
কবির যত পুঁজি পাটা বিদায় নিল সবি
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।

একাদশ অধ্যায়

পরিমলকুমার ঘোষ

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের কাব্যসাধনায় কয়েকটি সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা-অনুরাগ-ভক্তিই শেষ কথা নয়। শুভবুদ্ধি ও শান্তির এষণা, আস্তিক্যবোধ, সত্য-সুন্দরের প্রতি আগ্রহ প্রভৃতি মোটা রকমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্টই প্রতীয়মান। কিন্তু তা ছাড়াও আরো কয়েকটি লক্ষণ ধরা পড়ে। বাঙালি-জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং তারই সঙ্গে পল্লীপ্রীতি, সহজ সৌন্দর্য-প্রীতি ও অনুভূতি-কাতরতা জড়িয়ে আছে। বাঙলাদেশের জল-হাওয়ায় পরিপুষ্টি লাভ করে, এদেশের শ্যামল ভূমি থেকে প্রাণরস আহরণ করে কাব্যলতা বেড়ে উঠেছে, তা এঁদের কাব্য সম্পর্কে বলা চলে। এই লক্ষণগুলি যাঁদের কাব্যে বিশেষ ভাবে প্রকটিত হয়েছে, তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস, পরিমলকুমার ও সাবিত্রী-প্রসন্ন। সমকালীন দেশ-কালের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ, কালিদাস, সাবিত্রীপ্রসন্ন সাড়া দিতেছেন, কিন্তু বাকি তিনজনের ক্ষেত্রে সমকালের রাজনীতি-সমাজনীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। বস্তুত করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন ও পরিমলকুমারের

কাব্যসাধনায় বঙ্গভূমির প্রেমমুগ্ধ কবিচিত্তের পরিচয় পাই। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি ত্রয়ীর কাব্যালোচনা করা যায়, তাহলে এঁদের কবিধর্মের স্বরূপ সন্ধানে আমরা ব্যর্থ হব না বলেই আমার বিশ্বাস। এঁদের পাঠকসমাজকে অতি অবশ্যই বাঙালি-জীবনের রসমাধুর্যে চিত্ত অভিষিক্ত করে নিতে হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে বাংলাদেশে যে রবীন্দ্রভক্ত-সমাজের উদ্ভব হয়, তাঁরা কয়েকটি বিশেষ সাহিত্যপত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা করেন। এই সব পত্রিকাগোষ্ঠীতে প্রবেশাধিকারের অন্যতম অলিখিত শর্ত ছিল এই, রবীন্দ্রনাথের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন। সুতরাং এই সব পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন, তাঁদের জাতিকুল বিচার সহজেই করা যায়। প্রধান পত্রিকাগুলি হচ্ছে: 'ভারতী', 'পরিচারিকা', 'প্রতিভা', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'প্রবাসী'। এই সব পত্রিকার অন্যতম প্রধান কবি ছিলেন শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ (জন্ম: ১৮৯২)। আজ তাঁর কাব্যজীবন সমাপ্ত! ১৯১৪ থেকে ১৯২৮: এই পনের বৎসর তিনি অশ্রান্তভাবে উপরি-উক্ত পত্রিকাগুলিতে এবং 'ভারতবর্ষ', 'ঢাকা রিভিউ', 'নারায়ণ', 'পল্লীশ্রী', 'প্রাচী', 'বঙ্গবাসী', 'দীপিকা', 'রবি', 'বিজলী', 'সুহৃৎ' 'মালঞ্চ', 'বিজয়া', 'বীণা', 'বিকাশ', 'তরুণ', 'ভারত মহিলা', 'বিক্রমপুর', 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন। ঢাকা থেকে তিনি 'দীপিকা' ও 'প্রাচী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর একখানি মাত্র কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি: 'নারীমঙ্গল' (১৯২৬)। পরিমলকুমারের কবিতা

প্রধানতঃ 'পরিচারিকা', 'ভারতবর্ষ', 'উপাসনা', 'মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি একত্র করে পড়বার সুযোগ হয়েছিল। ফলে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজে পরিমলকুমারের বিশিষ্ট স্থান আছে, সে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। কাব্যধর্মে তিনি যে কুমুদরঞ্জন-করুণানিধানের সহগামী, তা এই কবিতাগুচ্ছ পাঠে জানা যায়।

পরিমলকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে নাম করতে পারি: নাটোরের মহারাজা 'মানসী ও মর্মবাণী'র পরিচালক জগদিন্দ্রনাথ রায়, মণিলাল, প্রভাতকুমার, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, কালিদাস, সাবিত্রীপ্রসন্ন, নরেন্দ্র দেব, শরৎচন্দ্র, জলধর সেন, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি।

॥ ২ ॥

পরিমলকুমারের কাব্যপাঠে যে কথা প্রথম উল্লেখ করতে ইচ্ছা করে, তা হল কবিতার বাণীমূর্তি। কবিতার প্রসাধনে যে নৈপুণ্য, যে অনায়াসদক্ষতা, যে আনন্দ লক্ষ্য করা যায়, তা পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করে।

পয়ার ছন্দের ধীর লয়ে ও মাত্রাবৃত্তের বিলম্বিত লয়ে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের নিপুণ বিন্যাসে কবিতার বাণীমূর্তি পরিমলকুমার সযত্নে গড়ে তুলেছেন। আবার প্রয়োজন মত শ্বাসাঘাত-প্রধান

ছন্দেরও আশ্রয় নিয়েছেন। একত্র উদাহরণ দিলেই এই ছন্দকৌশল ও শব্দসম্পদের পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রণাম করি, প্রণাম করি !
জগন্মাতা ব্রহ্মময়ী, চিরন্তনী মহেশ্বরী !
প্রণাম করি, প্রণাম করি !
খণ্ডহীন মণ্ডলে যাঁর ব্যাপ্তি চরাচরে
তাঁহার চরণ-কমল মাগো দেখাও মর্ম-নয়ন 'পরে ;
জ্ঞানের আলোক-অঞ্জনে মা, অন্ধজনের ফুটাও আঁখি,
সুধাস্যন্দী বাক্যে হর সংসারের এই মোহের ফাঁকি,
ইষ্টদেবী সারাৎসারা, সুমঙ্গলা শুভঙ্করী !
প্রণাম করি, প্রণাম করি ! (প্রণাম করি)

দ্রুতলয়ের ছন্দের উল্লাস সহজেই শ্রবণকে আকৃষ্ট করে। আবার দেখুন, ধীর লয়ে গম্ভীর ছন্দঃস্পন্দন :

হেমন্তের হিম-বায়ে ঝরে-পড়া শেফালীর দলে
নিঃশ্বসিত কাশবনে শিশিরের অশ্রুমুক্তা ফলে
মূর্ছিত কানন-কুঞ্জে শীর্ণদেহা তটিনী-ধারায়
কি কথা জাগিছে আজ অনিবার মৌন বেদনায়
নির্মম রহস্যবাণী। কহে যায় উত্তর পবন,
'নহে আর হাস্যময় জীবনের নব মুঞ্জরণ,
যৌবন সার্থক হল, ফুটিবার পালা হল শেষ
এবার ঝরিতে হবে সুদূরের এসেছে আদেশ।' (হেমন্ত-শেষে)

আবার ছয় মাত্রার ছন্দে বিলম্বিত লয়ের ঠাটে শুনুন :

আনমিত চারু অরুণ-বয়ানে
কালো আঁখি ছল ছল

গোলাপ-গুচ্ছে অপরাজিতায়
উষার শিশির জল,
পান্নায় ঘিরি মুকুতার পাঁতি
আকাশের নীলে তারপর ভাতি
কালো ভ্রমরীর ধূসর পাখায়
কমলের পরিমল।
নীল সাগরে কি শীকর-কণার
কুহেলির আবরণ
কনক-পাত্রে বনতুলসীর
চন্দন-আলেপন,
অন্তর বুঝি গলিয়া গলিয়া
অশ্রুধারায় এল উছলিয়া
আঁখি সে কি নীল-পর্দা-আড়ালে
মর্মের বাতায়ন? ('কালো-আঁখি')

এই তিনটি উদাহরণই যথেষ্ট। পরিমলকুমারের কবিতার বাণীশ্রী, ছন্দোমাধুর্য ও ভাব-সংহতির পরিচয় এখানে বর্তমান। কাব্যভাবনা ও তার বহিরঙ্গ সাধনায় যে রমণীয় পরিণয় প্রয়োজন, তা এখানে অনপেক্ষিত। হৃদয়ানুভূতির বাহ্যরূপদানে কবি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা কবিহৃদয়ের গভীরতা ও আন্তরিকতার পরিচায়ক।

॥ ৩ ॥

পরিমলকুমারের কাব্যে এই যে বাণী-লাবণ্যের পরিচয় আমরা প্রথমেই নিয়েছি, তা নিরর্থক নয়। কাব্যদেহনির্মাণে যে আনন্দ ও প্রসন্নতা, অনায়াসসাধনা ও সাবলীলতা লক্ষ্য করা

যায়, তা কবিহৃদয়ের গভীর প্রশান্তি ও আনন্দ থেকে উত্থিত। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবর্তে কবি নিজেকে সমর্পণ করেন নি, তার কারণ এই প্রশান্তি ও আনন্দ। সহজ সৌন্দর্য-প্রীতি এবং বঙ্গভূমির প্রতি প্রেম থেকে এই প্রশান্তি ও আনন্দের জন্ম হয়েছে।

প্রথমেই এই বঙ্গভূমি-প্রীতির পরিচয় গ্রহণ করা যাক। কবি যেখানে ধরণীর বন্দনা গেয়েছেন, সেখানেই তিনি বঙ্গভূমির আরতি করেছেন। তাঁর কাছে ধরণী আসলে শ্যামল স্নিগ্ধ বঙ্গভূমি। 'ধরণীর প্রেম', 'ধরণীর আকর্ষণ', 'আগমনী', 'বৈশাখী-বর্ষা', 'হৈমন্তী', 'নববর্ষা', 'শ্রাবণসন্ধ্যা', 'ফটিক জল' প্রভৃতি কবিতায় তিনি যে নিসর্গ-চিত্র এঁকেছেন, তা বঙ্গপ্রকৃতি। এর অনুরাগে কবি বিভোর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'ধরণীর আকর্ষণ' কবিতাটি :

> তোমার অতল স্নিগ্ধ নিবিড় আঁধার
> করুণায় বিগলিত নয়নের জল
> উৎসারিত স্নেহবক্ষে স্তন্যসুধাধার
> সুখ-দুঃখ-হাসি-অশ্রুলীলা অবিরল
> —এরা যে কাঁদায় মোরে চিরদিন তাই
> তোমার কোমল বুকে ফিরে ফিরে যাই।

এই স্নেহময়ী মাতা বঙ্গমাতা। 'হৈমন্তী' কবিতায় বঙ্গমাতার প্রত্যক্ষ বন্দনা :

> বন্দি অনিন্দিতা কবিকুলবন্দিতা
> হেমন্ত-নন্দিতা বঙ্গ!

নির্মল নভতল স্বচ্ছ তটিনীজল
স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চল অঙ্গ।
কাশফুলপুঞ্জিতা অলিকুলগুঞ্জিতা
শস্প-সুরঞ্জিতা রম্যা,
শিশির-মুক্তাফল কুন্তলে ঝলমল
নিখিল মানবদল নম্যা।...
হরিত ধান্যে নব নবান্ন-কলরব
মুখরিত উৎসব-শঙ্খ
ক্ষুধিতে মাতৃসমা অন্ন বিলাও রমা
অন্নপূর্ণা ও মা, বন্দি !
পিয়াও নিখিলহারা নিঃস্বে জননী পারা
বক্ষপীযূষধারাস্যন্দী।

হেমন্ত-লক্ষ্মীর বন্দনায় পরিমলকুমারের যে আন্তরিক প্রীতিস্নিগ্ধ কবিচিত্তের পরিচয় পাই, তা বাঙালিজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান কবিহৃদয়ের পরিচয়কেই প্রতিষ্ঠিত করে। 'হেমন্তশেষে' ও 'হৈমন্তী' কবিতা দুটিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

॥ ৪ ॥

পরিমলকুমারের এই বাঙালিজীবনপ্রীতির অপর দিক গ্রামীণ সমাজের চিত্রণ। এই চিত্রাঙ্কনে যে অনুরাগ ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা সুলভ নয়। এই পর্যায়ে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় বহুশ্রুত প্রসিদ্ধ 'দরবেশ'

কবিতাটি। দুয়ার হতে দুয়ারে দরবেশের সেই আকুল ডাক :

দ্বার খোলো ওগো, দ্বার খোলো ওগো,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে দরবেশ,
ঘরছাড়া মোরে যে করিল ওরে,
তারি ঘর খুঁজি দেশ দেশ,
গিরিদরী বন ভ্রমিয়া বেড়াই
মনের মানুষ মিলিল না ভাই,
আলেয়ার প্রায় লুকাল কোথায়
সন্ধান নাহি হল শেষ।......
ঘর হল পর, নিকট সুদূর
মিলিল না তবু অবকাশ,
পথ চলি' হায়, পথ না ফুরায়
বৃথা খুঁজে মরা বারো মাস,
পায়ে ছিঁড়ে এনু স্নেহের বাঁধন
তেয়াগিয়া গেহ প্রিয় পরিজন,
তবু শেষ ঠাঁই মিলিল না ভাই,
এ কি গো নিঠুর পরিহাস!

পরিমলকুমারের অপর যে কবিতাটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা বাঙালি সংসারের নিপুণ আলেখ্য। কবিতাটির নাম 'কালো মেয়ে'। পিতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ এই কবিতায় উৎসারিত হয়েছে।

কালো এত কুরূপ এত, তবু কেন ভালবাসি
কেমন করে বলব আমি তাই,

ঐটুকু ওর কোমল দেহ জড়িয়ে যখন বক্ষে ধরি
জানিনে গো কেমন হয়ে যাই।
পরশে ওর শিরায় শিরায় আবেশ যেন ঘনিয়ে আসে
সুখের মোহে জড়িয়ে আসে আঁখি,
ঐ দুখানি হাসিমাখা কচি ঠোঁটের চুমায় চুমায়
কেমনধারা বিভোর হয়ে থাকি।...
নীল আকাশের কানায় কানায় জড়িয়ে গেছে হাসির আভা
উথ্‌লে ওঠে নীল সাগরের দোলে,
ঐ হাসি যে শ্যামল হয়ে জড়িয়ে আছে ভুবন-ভরা
বাংলামেয়ের শ্যামল স্নেহের কোলে।
তাই তো এত তৃপ্তি আমার তাই তো এমন ভালবাসি
সবার চোখে হোক সে কুরূপ কালো,
ওযে আমার স্বপন-ছবি ওযে আমার আঁখির তারা
ওযে আমার আঁধার বুকের আলো।

কালো মেয়েকে বাংলা মায়ের শ্যামল অঙ্গে স্থাপনা করে কবি ক্ষান্ত হয়েছেন। বঙ্গভূমির প্রতি প্রেম ও কন্যার প্রতি বাৎসল্য, এ দুয়ের মিলনে কবিতাটি সর্বজনীন উপভোগ্যতা অর্জন করেছে।

বাঙালি-জীবনের সমস্ত বেদনা যে দিনটিকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়েছে, তাকে উপলক্ষ্য করে পরিমলকুমার লিখেছেন 'বিজয়া' কবিতাটি :

হে বন্ধু, বিজয়া আজি, মাতৃহারা প্রাণ
কাঁদে হের আকুল অধীর,

দাও দাও আলিঙ্গন, স্নেহের আঁচলে
মুছে দাও নয়নের নীর,
আজি এ মিলন-দিনে মুক্ত প্রাণে
প্রীতি-ভক্তি স্নেহের নির্ঝর,
অনন্ত জীবন তব আনন্দ-মধুর
হোক প্রাণ সার্থক সুন্দর।

গত শতকের গার্হস্থ্যজীবন-চিত্রণে বাঙালি কবিরা যে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তারই দূরাগত প্রতিচ্ছবি পরিমলকুমারের এই শ্রেণীর কবিতায় লক্ষ্য করি। নবজাগরণের বিস্ময় ও আনন্দে গত শতকের কবিরা উদ্বোধিত হয়েছিলেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সেই আনন্দকে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। গার্হস্থ্যজীবন সুখ ও শান্তির, পবিত্রতা ও আনন্দের নীড় বলে তাঁদের চোখে ধরা পড়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মানকুমারী বসু, রমণীমোহন বসু, কামিনী রায় প্রভৃতির কাব্যে এই গার্হস্থ্যজীবনপ্রীতি শতধারায় উৎসারিত হয়েছিল। পরিমলকুমারের কবিতায় এই সুরের অনুরণন শোনা যায়।

॥ ৫ ॥

পরিমলকুমারের 'নারীমঙ্গল' (১৯২৬) কাব্যে যে কবিতাগুলি বিধৃত হয়েছে, তা নারীবন্দনামূলক। এই কাব্য-গ্রন্থের সূচনায় যে সংস্কৃত পংক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে, তা

নারীপ্রশস্তি : 'যত্র নার্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। গত শতকের নবজাগরণের প্রথম প্রহরে যে আদর্শায়িত প্রেমকবিতা বাংলাকাব্যে দেখা গিয়েছিল, তার অন্যতম ধারা হল নারীবন্দনা। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য, সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কাব্য, দেবেন্দ্রনাথের 'নারীমঙ্গল' কবিতা, অক্ষয় বড়ালের 'এষা' কাব্যে বাঙালি সংসারের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উৎসারিত হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে নারীকে কেন্দ্র করে মাধুর্য ও শান্তি বিকীর্ণ হয়, সেই মহাভাগা গৃহলক্ষ্মীর বন্দনায় এই শ্রেণীর কবিতা মুখরিত। পরিমলকুমারের 'নারীমঙ্গল' কাব্যে এই ধারার অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। কল্যাণী সেবাময়ী অনুরাগিণী শান্তিদায়িনী গৃহলক্ষ্মীর প্রতি অনুরাগে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'নারীমঙ্গল'-প্রশস্তি রচনা করেছিলেন :

> শব্দঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা,
> তুমি সখি অর্থময়ী ভাবময়ী গীতা।

পরিমলকুমারের 'নারীমঙ্গল' কাব্যে তারই নির্ভুল প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'নাম' কবিতায় সেই শ্রদ্ধার প্রকাশ :

> জাগো, নারী-গৌরব-মঙ্গলে জাগো,
> বাংলার ভগিনী, বাংলার মাগো!
> গৃহকারা-বন্দিনী, স্বার্থের পণ্যা
> প্রমোদের সঙ্গিনী, আভরণ-গণ্যা ;
> অধিকার-বঞ্চিতা লাঞ্ছিতা জাগো—
> বাংলার ভগিনী, বাংলার মাগো!...

জাগো দেবী বিশ্বের গৌরব-তীর্থে,
দীনহীন নিঃস্বের অবসিত চিত্তে ;
নিখিলে নন্দিতা বন্দিতা জাগো—
বাংলার ভগিনী, বাংলার মাগো !
('পরিচারিকা', অগ্রহায়ণ ১৩২৭-এ প্রকাশিত)

এই নারীপ্রশস্তিটি একদিন বাংলাদেশে সর্বত্র গীত ও প্রচারিত হয়েছিল। শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তা এই গানটিতে সুর দিয়েছিলেন। এই শ্রদ্ধানুরাগের প্রবলতর প্রকাশ 'বঙ্গনারী' কবিতাটি ঃ

পুণ্যে তোমার ধন্য গেহ, বিত্ত তোমার চিত্তহারী,
কর্ম তোমার মর্মবীণা, শান্তিময়ী বঙ্গনারী !
হাস্যে তোমার প্রাণ ফোটে গো, অশ্রু স্নেহের মন্দাকিনী,
তৃপ্তি সদা আত্মদানে, ধন্যা অয়ি সন্ন্যাসিনী !
শুষ্ক মরু মুঞ্জরিল পুণ্য প্রেমের গঙ্গাবারি,
চরণ-তলে বিশ্ব নত, শান্তিময়ী বঙ্গনারী !

এই নারীবন্দনার অপর দিক পৌরাণিক নারীচরিত্রের নবরূপায়ণ। এই কাব্যের 'সীতা', 'সতী', 'সাবিত্রী', 'গান্ধারী' কবিতা-নিচয়ে এর পরিচয় রয়েছে। 'গান্ধারী' কবিতায় নবপরিণীতা ধৃতরাষ্ট্র-মহিষীর স্বেচ্ছা-নিপীড়ন

ধরার মাধুরী বড় ভালবাসি,
তারো চেয়ে প্রিয় দেবতা মম,
ভুলাইবে তাঁর মরম-মাধুরী
ধরণীর রূপ হৃদয়-রম।

যে শোভা তাঁহার নয়নের দ্বারে
আঘাতিয়া ফিরে যায় বারেবারে,
কোন্ প্রাণে সখি দিব আপনারে
সে শোভার স্বাদ, পাষাণী-সম?

দে সখি নয়নে বাঁধিয়া বসন,
বাহিরের আলো হারাবে যবে,
আঁখির আঁধার হরিয়া তখন
অন্তর-দীপ উজল হবে;
পথ দেখাইবে সে আলোক-ভাতি
চিরজ্যোৎস্নায় উজলিয়া রাতি,
আঁধার বাসরে রব চিরসাথী
প্রেম-অমরায় সগৌরবে।

বাঙালি গার্হস্থ্যজীবনের সহৃদয় আলেখ্যচিত্রণে এবং বঙ্গনারীর বন্দনায় কবি পরিমলকুমার গত শতকের আদর্শায়িত প্রেমকবিতার ধারাটিকে অনুসরণ করেছেন। এই অনুসৃতি ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। তাই একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, পরিমলকুমার ঐতিহ্য-অনুসারী কবি। বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য অস্বীকারে নয়, স্বীকৃতিতেই তাঁর কাব্যসাধনা সার্থকতা লাভ করেছে।

॥ ॥

প্রেমকবিতায় পরিমলকুমার প্রেমের আদর্শায়িত রূপে বিশ্বাসী। প্রেমের সর্ব-ধ্বংসী মোহরূপে তাঁর অনাসক্তিই

এখানে প্রমাণিত হয়েছে। সামান্য উদাহরণেই এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে।

কেমনে বোঝাব তোরে কত ভালবাসি
অয়ি মোর পরাণের প্রিয়া!
কত শোভা কত গান কত সুধারাশি—
কত প্রেম ধরে এই হিয়া!...
বাহিরে এমন করি দেখোনা প্রেয়সী
বাহিরে কি খুঁজিছ আমায়?
যে শোভা হিয়ার মাঝে উঠিছে বিকশি'
আঁখি দিয়া কি হেরিবে তায়?...
এ যে গো নিতল তলে নীল বারিরাশি
অচঞ্চল শান্ত সুগভীর,
ভাষাহীন মহিমায় উঠিছে আভাসি'
সমাহিত সাধনা নিবিড়। ('গুপ্ত প্রেম')

এখানে আদর্শায়িত (idealised) প্রেমেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। এই প্রেমে সম্ভোগের উল্লাস অপেক্ষা দূরত্বের বেদনা তীব্রতর। 'প্রেমের ব্যথা' কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করি। এতেই এই বেদনা চমৎকার বাণীরূপ লাভ করেছে।

'ভাল কি বাস না মোরে?'
—'কেমনে বুঝাই?'
'ঘৃণা কর?'
—'কি কহিছ?'
—'তাই ওগো তাই,

তাই এত অবহেলা, এত অভিমান,
প্রণয়ের বিনিময়ে সহি' অপমান !'
—কহিল না কোন কথা, শুধু আঁখি তুলি'
চাহিল মুখের পানে ; গেনু সব ভুলি',
নীরবে রহিনু চাহি মুখপানে তা'র।
ব্যথায় উঠিল কাঁদি পরাণ আমার।—
'ক্ষমা কর, ক্ষমা কর'—কহিলাম ধীরে,
হেরিনু করুণ দুটি নয়নের নীরে
হিয়া তা'র গলি' এল মুকুতা-ধারায়,—
আবেগে লইনু টানি' বেপথু হিয়ায়।
মিশিল নয়ন-জলে নয়নের জল,
জাগিল বিপুল তৃপ্তি শান্ত অচপল।

প্রেমের অকলঙ্ক মহিমা ঘোষণাতেই কবি কাব্যসাধনার সার্থকতা খুঁজেছেন। তাই দেহসৌন্দর্য কবিকে আকৃষ্ট করে নি, প্রেমরহস্যই কবিকে আকর্ষণ করেছে। তার প্রমাণস্বরূপ 'চোখের মোহ' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করি ঃ

বুঝিতে পার না সখি, কেন মুখপানে
নীরবে চাহিয়া থাকি পলকবিহীন ?
কোন্ সে রহস্য মাঝে কিসের ধেয়ানে
মুগ্ধ এই আঁখি দুটি রহে গো বিলীন ?
তুমি কি ভাবিছ মনে ও মূরতি মাঝে
আমি শুধু হেরিতেছি রমণী তোমায় ?
শুধু মৌন কামনার ব্যথা প্রাণে বাজে !
তাই শুধু চেয়ে থাকি আকুল তৃষায় ?

তুমি কি বুঝিবে নারি! ওই আঁখি দিয়া
কি কথা কয়েছ চুপে পরাণে আমার।
কোন্ সে অমৃতলোকে জেগেছে এ হিয়া,
কোন্ স্বপ্ন-অমরার নন্দন মাঝার!
আঁখিতে স্বপন ভরি খুঁজি তোমা তাই,
তোমারি মাঝারে পুনঃ তোমারে হারাই!

রোমান্টিক প্রেমসাধনার চরম বিকাশ হয় সেই স্তরে যেখানে কবির বিরহবেদনা বহিঃপ্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয়। তখন আর প্রেম ব্যক্তিজীবনে আবদ্ধ থাকে না, তা সর্ববিশ্বে সঞ্চারিত হয়। প্রেমের এই দুর্গম তীর্থমন্দিরে উত্তীর্ণ হয়ে পরিমলকুমার তাঁর প্রেমসাধনা শেষ করেছেন। তার পরিচয় উদ্ধার করে এই কাব্যপাঠ সমাপ্ত করছি। যে কবিতায় প্রেমসাধনার এই বিশেষ রূপটি পাই, তা হ'ল 'শ্রাবণ-স্বপ্ন'। এ কবিতায় প্রকৃতি প্রেমের অনুগামিনী, বিরহের বেদনা প্রকাশেই তার সার্থকতা :

তোমার কাজল আঁখি ম্লান ভাষাহীন
বরষার সন্ধ্যাকাশে অশ্রু-ভারাতুর
তোমার নীরব বাণী মরম-নিলীন
মূরছিত সমীরণে বেদনা-বিধুর
শিথিল কবরী তব মেঘবলাকায়
এলায়িত স্তরে স্তরে নীলিম গগনে
তেমনি চাহিয়া থাকা পথের সীমায়
ছলছল আঁখি দুটি দূর বাতায়নে

পিয়াসী কেয়ার বুকে উঠে আকুলিয়া
তোমারি বেদনা-ভরা সুরভি নিশ্বাস
আধ-ফোটা যূথিকায় অধর তুলিয়া
তোমারি কাঁদন, কাঁপা মিনতি-আভাষ
তোমারে ঘিরিয়া আজি বিরহী শ্রাবণ
ব্যথার মাধুরী দিয়া বিরচে স্বপন !

সাম্প্রতিক বাংলা গীতিকবিতা প্রকৃতি-বন্দনা ও প্রেমসাধনার এই রোমান্টিক সরণি ত্যাগ করে' দুরূহ জটিল পথে যাত্রা করেছে। পরিমলকুমারের কাব্যসাধনা সেই বিগত যাত্রার অক্ষয় স্মৃতিরূপে কাব্য পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পর্বে—'বলাকা' কাব্যের পর্বে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে কবি-পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম গ্রহ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। গত চল্লিশ বছর যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সেবা করে আসছেন। এই একনিষ্ঠতা, এই আন্তরিকতা, এই দীর্ঘকালের সাধনা কবি সাবিত্রীপ্রসন্নকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অধুনা এই নিষ্ঠা ও সাধনা বিরলদর্শন বলেই সাবিত্রীপ্রসন্নের কাব্যজীবনের এই পটভূমি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। তাঁর শৈশব কাটে গ্রামে ও চুয়াডাঙা, মাজদিয়ায়, যৌবন বহরমপুর ও কলকাতায়। অসহযোগ আন্দোলনে এম. এ. ক্লাসের ছাত্র সাবিত্রীপ্রসন্ন যোগ দেন এবং আর কোনোদিন বিদ্যাতীর্থে প্রত্যাবর্তন করেন নি। তারপর থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ফলস্বরূপ নির্যাতনের মধ্য দিয়ে চলেছেন। এর মধ্যে তাঁর কাব্যসাধনায় কোনোদিন ছেদ পড়েনি। কি কলিকাতা বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক রূপে, কি দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের অগ্রণী নেতারূপে, কি সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী রূপে সাবিত্রীপ্রসন্নের যে বিচিত্র কর্মমুখর রাজনৈতিক জীবন, তা কাব্যপাঠকের প্রয়োজনীয়

এইজন্য যে, তাঁর কাব্যধারায় এর স্বাক্ষর রয়ে গেছে সাবিত্রীপ্রসন্নের সাহিত্যসাধনা উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর পিতার কাছ থেকে এসেছে। তাঁর কাব্যের প্রত্যক্ষ উৎসভূমি বাংলার গ্রামজীবন। কৃষককুলের প্রতি সহৃদয় সহানুভূতি তাঁকে কাব্য-রচনায় উদ্বোধিত করেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে বেঁধে রাখেন নি। জীবনের বহু বিচিত্র তরঙ্গপ্রবাহে তিনি ডুব দিয়েছেন, ঘট ভরেছেন ও আনন্দ বিতরণ করেছেন। তাই বিষয়-পরিবর্তন ও আঙ্গিকের নব নব পরীক্ষায় সাবিত্রীপ্রসন্নের অশ্রান্ত কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়। আর এই কৌতূহলই তাঁকে রবীন্দ্রপন্থী ও সাম্প্রতিক কবিকুলের মধ্যে সেতু রচনায় সাহায্য করেছে। বস্তুত উদার মানবিকতা ও অশ্রান্ত জীবনজিজ্ঞাসা সাবিত্রীপ্রসন্নকে নিয়ত তাড়না করে ফিরেছে। সেই জন্যেই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি থেকে তিনি মুক্ত। এখানেই তিনি সতত নবীন।

আজ পর্যন্ত সাবিত্রীপ্রসন্নের দশটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে : 'পল্লীব্যথা' (১৯২০), 'মধুমালতী' (১৯২৪), 'রক্তরেখা' (১৯২৪ ; প্রকাশমাত্র ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), 'আহিতাগ্নি' (১৯৩২), 'মনোমুকুর' (১৯৩৬), 'মডার্ণ কবিতা' (১৯৪১), 'অনুরাধা' (১৯৪৪), 'অতসী' (১৯৪৫), 'জ্বলন্ত তলোয়ার' (১৯৫০), 'কাব্য সঞ্চয়' (সংকলন : ১৯৫৮)। এর পরও তিনি বহু সমিল কবিতা ও গদ্য কবিতা রচনা করেছেন ও করছেন এবং আরো গোটা সাতেক কাব্যগ্রন্থের উপযোগী উপাদান

রয়েছে। আশা করা যায়, অচিরে এইগুলি প্রকাশিত হবে। তা হলে সাবিত্রীপ্রসন্নের কাব্যসাধনার একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভ করা সহজতর হবে। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সাবিত্রীপ্রসন্ন একদা খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তিনি চারটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন: 'উপাসনা' (মাসিক), 'বিজলী' (সাপ্তাহিক), 'স্বায়ত্তশাসন' (পাক্ষিক), 'অভ্যুদয়' (মাসিক)।

॥ ২ ॥

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন যে মূলতঃ রবীন্দ্রানুসারী কবি, একথা অবশ্যস্বীকার্য। এর প্রমাণ তাঁর কাব্যদর্শন, তা রবীন্দ্রবোধে সম্পৃক্ত। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের যা সামান্য লক্ষণ, তা সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় স্পষ্ট প্রতিভাত। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উদার মানবিক কৌতূহল, গ্রামবাংলার প্রতি গভীর আকর্ষণ, নগরজীবনের কৃত্রিমতার তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ সমালোচনা, আস্তিক্যবোধ এবং সর্বোপরি রোমান্টিক জীবনবোধ ও তদনুষঙ্গী রোমান্টিক প্রেমসাধনার প্রতি অনুরাগ—এ সবই সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় সহজেই আবিষ্কার করা যায় কিন্তু এখানেই সাবিত্রীপ্রসন্ন ক্ষান্ত হন নি। তীব্র স্বদেশানুরাগ—যার পটভূমি তাঁর রাজনৈতিক জীবন—তা তাঁর কাব্যে গভীর ছাপ ফেলেছে। বস্তুত এই একটি ক্ষেত্রে সাবিত্রীপ্রসন্নের জীবনবোধ ও কাব্যবোধ অঙ্গীভূত হয়েছে। তা ছাড়া আরো একটি ক্ষেত্রে

সাবিত্রীপ্রসন্নের বিশিষ্টতা রয়েছে, এই বিশিষ্টতা তাঁকে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ থেকে খানিকটা সরিয়ে এনেছে ও স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। সাম্প্রতিক কাব্যান্দোলনের যে তির্যক, ঈষৎ ব্যংগপ্রবণ, রোমান্স-বিরোধী জীবনবোধ, তার চকিত পরিচয় সাবিত্রীপ্রসন্নের সাম্প্রতিক কবিতায় মাঝেমাঝে পাই। কাব্যবোধের এই পরিবর্তন এ কথাই প্রমাণ করে যে সাবিত্রীপ্রসন্ন মূলতঃ জীবনে বিশ্বাসী, সেইজন্য অশ্রান্ত কৌতূহল ও নব নব রূপসন্ধানে তাঁর বিমুখতা নেই, বরং আগ্রহই আছে। এইক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সহযাত্রীদের থেকে সরে গেছেন।

॥ ৩ ॥

সাবিত্রীপ্রসন্নের কাব্যের প্রত্যক্ষ উৎসভূমি বাংলাদেশের গ্রামজীবন। তার প্রমাণ, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পল্লীব্যথা'। যে আন্তরিকতা, অনাড়ম্বর, ও বেদনার প্রকাশ এতে লক্ষ্য করা যায়, তা স্বতোৎসারিত এবং এই স্বতোৎসারই সাবিত্রীপ্রসন্নের কাব্যসাধনার ভিত্তি। গোবিন্দচন্দ্র দাসের পল্লীকবিতায় যে অসংস্কৃত দুর্মদ সারল্য, তা সাবিত্রীপ্রসন্নে সংস্কৃত সারল্য। করুণানিধান ও দুর্গামোহন কুশারীর পল্লীকবিতায় যে পল্লীমায়ের স্নেহপ্রতিমার দেখা পাই, সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় তার বেদনাবিধুর রূপ দেখি। যতীন্দ্রমোহনের পল্লীকবিতায় যে নিশ্চিন্ত শৈশবসারল্য, সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় তা কৃষকজীবনের মর্মান্তিক বেদনার গীতোচ্ছ্বাস। 'পল্লীব্যথা'য়

সাবিত্রীপ্রসন্ন যে গ্রামলক্ষ্মীর আরতি করেছেন, তিনি অশেষ দৈন্য ও বেদনার পদ্মদলে আশার প্রতিমা রূপে দেখা দিয়েছেন। তাই কবি মৃত্যুঞ্জয় আশার বাণী শুনিয়েছেন ঃ

> সর্বহারা মহাপ্রাণ তাহারে কে রাখে বন্ধ করে'
> আলোর ইসারা আসে প্রতিদিন তারই অন্ধ ঘরে!
> মৃতদেহ আগুলিয়া সেই আছে নিশিদিনমান
> কে জানে আসিবে কবে এক বিন্দু অমৃতের দান!
>
> (ঘরের মায়া)

পল্লীগ্রামের রোমান্টিক অবাস্তব প্রতিমা কল্পনা করে কবি তৃপ্ত হতে চান নি, বাস্তবের নিষ্ঠুর জীবনচিত্র অংকনে তাঁর আগ্রহ, তাই অশেষ দুঃখে বলেছেন ঃ

> পল্লীমা তোর মল্লী-শোভা
> থাক লুকান বনে,
> তোমার মধু-পল্লী-মায়া
> তাও রেখে দাও মনে,
> মনের মাঝে আজকে পাগল
> ফেলছে ভেঙ্গে সকল আগল
> তোমার ঘরে আগুন-খেলা
> করব ছারেখার,
> পল্লীমা তোর চরণ তলে
> হাজার নমস্কার! (পল্লীবিদায়)

পল্লীজীবন সম্পর্কে এই বাস্তবদৃষ্টি ও কল্পনার প্রবল অস্বীকৃতি ইংরেজ কবি বার্ণস্, কোলাম ও ক্যাম্পবেলের কথা মনে করিয়ে

দেয়। এই বাস্তবচেতনা সাবিত্রীপ্রসন্নের প্রথম কাব্যেই দেখা গেছে, এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী জীবনে এই সচেতনতাই কবিকে নগরজীবনের উপর কবিতা ('মডার্ণ কবিতা') রচনায় প্ররোচনা দিয়েছে। একথা স্বীকার করতেই হবে সাবিত্রীপ্রসন্নের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এই কাব্যে স্পষ্ট হয় নি, তা হয়েছে পরবর্তী প্রেমকবিতা ও স্বদেশকবিতাগুচ্ছে। সাবিত্রীপ্রসন্নের কাব্যবোধে নৈরাশ্য কখনোই শেষ কথা নয়, তার প্রমাণ উপবি-ধৃত 'পল্লীবিদায়ে'র তুলনায় 'পল্লীবাণী' কবিতাটি। সেখানে অমৃতসন্ধানী কবির আশা :

আমার পল্লী-রাণী,
তোমার পুণ্য-চরণ পরশে কেটে যাবে সব গ্লানি।
এসো দেবী তুমি শক্তি-স্বরূপা,
গুণ গরিমায় অতুল অনুপা,
নূতন করিয়া গড় তুমি দেবী মোদের পল্লীভূমি ;
চেতনা-শক্তি বরাভয় দানে,
সুখ-সম্পদে ধনে জনে মানে,
শূন্য পল্লী-ভবন মোদের পূর্ণ কর মা তুমি !
আমার পল্লী রাণী,
তোমার চরণ পরশে ঘুচিবে সকল দৈন্য গ্লানি ! (পল্লীবাণী)

'পল্লীব্যথা' কল্পনাজীবির শৌখিন ব্যথা নয়, দরদীর অশ্রুজল এই কাব্যের সরল আন্তরিক বর্ণনাকৌশল প্রশংসনীয়। শুধু কৃষকের সুখদুঃখের স্নিগ্ধ সজল আলেখ্য নয়, কৃষকের সংসারের অবিকল চিত্র ও পল্লীপ্রকৃতির চিত্র অংকনেও কবির নৈপুণ্য

প্রকাশ পেয়েছে। এগুলি যে আলোকচিত্র নয়, কবিহৃদয়ের সহৃদয়তা ও বেদনার প্রলেপে স্নিগ্ধ রমণীয় পল্লীচিত্র তা-ই এই কাব্যের গৌরব।

॥ ৪ ॥

পল্লীচিত্র অংকনে সাবিত্রীপ্রসন্ন যে নৈপুণ্য ও সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, তার পূর্ণতর প্রকাশ লক্ষ্য করি পরবর্তী কাব্যগ্রন্থনিচয়ে। 'মধুমালতী', 'মনোমুকুর', 'অনুরাধা' এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ মূলতঃ প্রেমকবিতার সংকলন। এগুলিতে সাবিত্রীপ্রসন্নের রোমান্টিক প্রেমবোধের সুন্দর পরিচয় পাই। প্রেমের পরম ক্ষুধা ও তৃষাকে কাব্যের বন্ধনে রূপ দিতে গিয়ে কবি তাঁর প্রেমবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রেমকবিতা মূলতঃ দেহধর্মী, কিন্তু দেহসর্বস্ব নয়। তিনি দেহনিরপেক্ষ প্লেটোনিক প্রেমেও বিশ্বাসী নন। দেহ ও মনের বিচিত্র খেলার প্রকাশই সার্থক প্রেমকবিতা, এই-ই সাবিত্রীপ্রসন্নের বিশ্বাস। মিলনসম্ভোগের প্রতপ্ত কামনাকে তিনি অসহ্য বহ্নিজ্বালায় মুক্তি দিয়ে ক্ষান্ত হন নি, তাকে তৃপ্তীর পূর্ণ আস্বাদে স্থূল বসন্তকামনার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। আর এই প্রেমকবিতার ত্রুটিহীন আঙ্গিক, সুমিত ছন্দ এবং নিপুণ শব্দপ্রয়োগ কবিমনের উল্লাসকেই ব্যক্ত করেছে। নৈর্ব্যক্তিক নিরাবলম্ব প্রেমচিন্তা নয়, সুস্থ দেহোপভোগের পথে তৃপ্ত কবিমনের আনন্দই এখানে কাব্যরূপ লাভ করেছে।

তৃষিত জীবনে দয়িতার আগমনকে কবি অভ্যর্থনা করেছেন এই কথা বলে ঃ

তাই মোর মর্ম মাঝে এই কথা বাজে বারম্বার
সুগভীর বেদনার সুরে, অনাঘ্রাত কুসুম সম্ভার
হেলায় গিয়েছি পায়ে দলে, পাছে পায়ে লাগে মোর ব্যথা,
শঙ্কা তব কম্প্র বক্ষে, নয়নের স্নিগ্ধ কাতরতা
অশ্রু হয়ে ঝরিল ধরায়, সে কথা যে ভুলিতে পারিনি
নিজেরে বিলায়ে তুমি করিয়াছ মোরে চিরঋণী।

(চিরঋণী, 'মধুমালতী')

বেদনাকম্পিত কণ্ঠে প্রেমপ্রতিমার প্রতি কবিহৃদয়ের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ আন্তরিকতায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। সংসারের নিষ্ঠুর সংঘাতে প্রেমকোরকটি যে অক্ষত থাকে না, কবি তারই বেদনাস্নিগ্ধ পরিচয় দিয়েছেন এই বলে ঃ

তুমি এলে উৎসবের আনন্দ-মুখর এক রঙীন সন্ধ্যায়
সন্ধ্যামণি রজনীগন্ধায়
আবরিয়া তনুখানি ; লীলায়িত আনন্দের খনি,
আমার নয়ন-আগে দাঁড়ালে যখনি
ভরিয়া সুবর্ণ ঝাঁপি কল্যাণের পঞ্চশস্য দিয়া,
তখনি কাঁপিল মোর হিয়া
অজানিত আশঙ্কায় ;
মর্মের সহস্র তন্ত্রী ব্যথিয়া উঠিল বেদনায় !

তুমি এলে, তারি সাথে এল প্রিয়ে, সংসারের নিষ্ঠুর সংঘাত !
তরুণ অরুণ-দীপ্ত যৌবনের নির্মল প্রভাত

দীর্ঘশ্বাসে হয়ে এল ম্লান ;
আমার সমস্ত প্রাণ
বক্ষ পঞ্জরের দ্বারে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গম সম
তোমারি সকাশে প্রিয়তম,
ছুটে যেতে লুটে প'ল বারবার,
দেখা তবু পেল না তোমার !

(ভাগ্যলক্ষ্মী, 'মধুমালতী')

এই প্রেম পরে পাত্রান্তরিত হয়েছে 'মনোমুকুর' কাব্যে। সেখানে প্রিয়ার ঠাঁই নিয়েছে প্রকৃতি। এর চমৎকার পরিচয় পাই 'বিপ্রলব্ধা' সনেটটিতে :

শারদ জ্যোৎস্নার মুখে পড়িয়াছে রাত্রির কালিমা,
উৎসারিত আলোকের শেষ রশ্মি জ্বলে আঁখি কোণে,
শ্যাম-সমারোহে গাঢ় ছল ছল জলভরা মায়া,
ইন্দ্রধনু ফুটাইল ভ্রূভঙ্গিমা কখন গোপনে।
মূক যুগান্তের কথা নয়নে মিনতি হয়ে ফুটে,
ব্যথার কুণ্ঠিত বাণী অধরোষ্ঠে আধ-বিকম্পিত,
স্মরণ-পথের প্রান্তে ধূলিলিপ্ত জীর্ণ পর্ণপুটে,
মঞ্জরিত বসন্তের স্তব্ধ গান হতেছে ধ্বনিত।
তাহারে ঘিরিয়া মোর স্বপ্নসৌধ করেছি রচনা,
অনামিকা প্রিয়া মোর, উৎকীর্ণ সে স্মৃতির ফলকে,
মর্মের গেহিণী হয়ে সংসারে যে করিল বঞ্চনা
আমার অর্ঘ্যের ফুল সে কেমনে পরিল অলকে ?
বিপ্রলব্ধা সে আমার নিরুদ্দেশে তার অভিসার,
অবলুপ্ত পদচিহ্ন আমারে যে টানে অনিবার।

এখানে রবীন্দ্র-অনুস্মৃতি অতিস্পষ্ট, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। রোমান্টিক কবিকল্পনার চরম প্রকাশ ঘটেচে 'মনোমুকুর' কাব্যের 'কৌতুকময়ী', 'স্বপ্নসহচরী', 'শ্রাবণ-শর্বরী', 'স্মৃতিছায়া', 'হৃদয়-মাল্য', 'সুন্দরী রমা', 'বিরহিণী', 'প্রস্থায়িনী', 'মায়াবিনী', 'লীলাময়ী', 'চিরন্তনী', প্রভৃতি কবিতায়। উপরোক্ত কবিতানিচয়ের প্রথম দুটি ও শেষ পাঁচটি কবিতায় 'মহুয়া' কাব্যের 'নাম্নী' কবিতাধারায় অনুস্মৃতি অনতিস্পষ্ট। সাবিত্রীপ্রসন্নের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি ব্যক্তিক হৃদয়াবেগকে স্বচ্ছন্দে প্রকৃতিতে আরোপ করেছেন এবং যে সহজ নৈপুণ্য এখানে প্রকাশ পেয়েছে, তা সাবিত্রীপ্রসন্নের কাব্যাধিকারকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রকৃতি-প্রেম ও মানবী-প্রেম এখানে এক বৃন্তে বিধৃত হয়েছে, তার কারণ কবি এখানে প্রকৃতিতে মানবিক আবেগ ও অনুভূতি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। তার প্রমাণ 'স্বপ্ন-সহচরী' সনেট ; এটি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য ঃ

> জাগ্রতের নহ তুমি ; তুমি মোর স্বপ্ন-সহচরী,
> প্রতি রাত্রি, দীর্ঘ রাত্রি—তোমা সনে প্রেম-আলাপন.
> আদরে রাঙিয়া ওঠে লজ্জা-নম্র সন্নত আনন,
> গাঢ় আলিঙ্গনে বুকে তোমারে রাখিতে চাই ধরি।
> তোমারে রাখিতে চাই, মায়াবিনী, তৃষিত এ বুকে,
> তোমারে ধরিতে চাই লোভাতুর দুটি বাহু দিয়া,
> অভিসার-গরবিণী, নব-মেঘ-সঞ্চারিণী প্রিয়া,
> শাঙন গগনে চলে বিদ্যুতের লীলা সকৌতুকে।

তোমারে দেখেছি কোথা ? শিপ্রা তটে ? বিদিশা নগরে ?
কুঞ্জ-বনবীথি তলে প্রতীক্ষায় বিহ্বল অন্তর ?
অলকাপুরীর মায়া নব মেঘে মেদুর সুন্দর,
বিরহ-মলিন ছায়া পড়িল কি তোমার অধরে ?
রামগিরি আশ্রমের নির্বাসিত যক্ষেরে তোমার
এ স্বপ্ন সফল করি কবে দিবে প্রেম অলকার ?

'অনুরাধা' কাব্যে সাবিত্রীপ্রসন্ন প্রকৃতি থেকে মানবীপ্রিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বস্তুত তাঁর কাছে এই গতাগতি সহজ বলেই অনায়াস-নৈপুণ্যে তিনি আপন হৃদয়াবেগকে কখনো প্রকৃতির পটভূমিতে, কখনো বা প্রিয়ার পটভূমিতে চিত্রায়িত করে তুলেছেন। এই কাব্যের 'লীলাসঙ্গিনী', 'সন্ধ্যাপ্রদীপ', 'মনের মাধুরী', 'মায়ামুগ্ধ', 'সেই রাত্রি', 'মধুযামিনী', 'বিজয়া', 'তনুদেহ,' 'অনুরাধা,' কবিতায় মানবীদেহের আরতি ও প্রিয়ার বন্দনা করা হয়েছে। একটি প্রেমমুগ্ধ প্রীতিপ্রসন্ন বিদগ্ধ নিপুণ কবিমনের সুন্দর পরিচয়স্থল আলোচ্যমান কবিতাগুচ্ছ। পূর্বোক্ত দুটি কাব্যের ধারানুসরণেই এই কবিতাগুলি রচিত হয়েছে। প্রিয়ার কমল-নয়ন দেখে কবি বলেছেন :

স্নিগ্ধ শান্ত দুটি আঁখি তারি তলে লভিনু শয়ন।
নয়ন-মোহন রূপে পরিতৃপ্ত আমার নয়ন।

(মায়ামুগ্ধ, 'অনুরাধা')

রূপসায়রে প্রেমমুগ্ধ কবি মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন।

কিন্তু কবি এখানেই ক্ষান্ত হন নি। সাম্প্রতিক কবিচেতনায় প্রেমের যে জটিল দুর্গম রহস্যসন্ধানবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়, তা

সাবিত্রীপ্রসন্নের সাম্প্রতিক কবিতায় লক্ষ্য করি। এখানে তিনি অন্যান্য রবীন্দ্রানুসারী কবিদের সরল গভীর প্রেমোপাসনায় তৃপ্ত থাকেন নি। তাঁর 'নিরুত্তাপ' শীর্ষক সম্প্রতি-রচিত কবিতাটি সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত করছি ঃ

নিরুত্তাপ হৃদয়ের লক্ষ্যভ্রষ্ট মিথ্যা ভ্রূভঙ্গিমা
কী তাহার দাম ?
প্রেমশূন্য অবসন্ন তনুর তনিমা
তারে নিয়ে চিরদিন ব্যর্থ মনস্কাম।
লালিত্য লালসাহীন, দেহরন্ধ্রে স্তিমিত কামনা
উদাসীন মন,
উষ্ণস্পর্শে অবসাদ, অবগাঢ় আশ্লেষে উন্মনা
ভাবান্তর আনে না ক' জ্যোৎস্নালোকে নিশীথ নির্জন।
অভিশপ্ত জীবনের অতৃপ্ত মুহূর্তগুলি ঘিরে
নামে অন্ধকার !
শোণিতপ্রবাহে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিছে ধীরে ধীরে
অধরে তৃষ্ণার জ্বালা অন্তরে কামনা দুর্নিবার।
পাষাণ প্রতিমা নিয়ে মানুষের দুর্বহ জীবনে
আগুনের খেলা,—
পতঙ্গ পুড়িয়া ছাই, নিরর্থক আত্মবিসর্জনে
প্রমত্ত আবেগে ঝড় নেমে এল অপরাহ্নবেলা।

প্রেমের তত্ত্ব ও রূপাবিষ্কারে কবি এখানে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা তাঁকে সাম্প্রতিক কাব্যান্দোলনের স্বীকৃতি দেবে।

॥ ৫ ॥

স্বদেশানুরাগ সবিত্রীপ্রসন্নের ব্যক্তিজীবন ও কাব্যজীবনের একটি প্রধান অধ্যায়। তাঁর কাব্যে এর পরিচয় সুস্পষ্ট। ব্যক্তিজীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের পিছনে যে প্রবল দেশানুরাগ কাজ করেছিল, তা 'রক্তরেখা', 'আহিতাগ্নি' ও 'জ্বলন্ত তলোয়ার' কাব্যে প্রকাশ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে তিনি নজরুলের সহযাত্রী। দেশপ্রেমকে যে জ্বলন্ত প্রেরণা ও তীব্র অনুভূতির আগুনে গলিয়ে কাব্য-উপাদানে পরিণত করা হয়, তা বহু পরিমাণেই সাবিত্রীপ্রসন্নের করায়ত্ত ছিল। এই সমস্ত কবিতার সাফল্য সহজবোধ্য কারণেই অনায়াসলভ্য; কিন্তু কাব্যোৎকর্ষের বিচারেও যে সাবিত্রীপ্রসন্নের দেশপ্রেমের কবিতা উত্তীর্ণ হয়েছে, তা রসিক কাব্যপাঠকমাত্রেই স্বীকার করেন। বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলনের ঝোড়ো হাওয়ায় ১৯২৪-এ প্রকাশিত ও বাজেয়াপ্ত 'রক্তরেখা' কাব্যে অগ্নিক্ষরা দেশপ্রেমের বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে। যুব-চিত্তকে মৃত্যুবিজয়ী আহবে উদ্বোধিত করার ক্ষমতা নিয়েই এই সব কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাই তার বিচারে সমালোচকের লেখনী স্বভাবতই সংকুচিত হয়। কেবল ইচ্ছা করে, কবিকণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আবৃত্তি করি:

> দুর্গম বন-কান্তার ছেদি' দুস্তর পথ হেলায় উত্তরিয়া
> চক্রনেমির ঘর্ঘর রবে জগন্নাথের রথ এল বাহিরিয়া;
> অন্ধকারের যবনিকা ভেদি' ছুটায়ে রুদ্ধ আলোর উৎস রাশি,
> তরুণ অরুণ কিরণ-প্রপাতে দিগ্বলয়ের জ্যোতি উঠে পরকাশি।

পার্থসারথি ধরেছে বল্গা তর্জনী তুলি' পথ নির্দেশ করে'
অশ্বযূথের বিদ্যুৎ-বেগ, হ্রেষায় উঠিল গগনপবন ভরে ;
আর্তের স্তরে একি আহ্বান সঞ্চরি' উঠে প্রলয় অন্ধকারে
চঞ্চল আজি দুর্বল প্রাণ, অর্গল কাঁপে নিষেধের কারাগারে ;
বিশ্বের মহারাজ,
নিখিল-মরণ শঙ্কা-হরণ অভয় দানিছে আজ। (আবির্ভাব, 'রক্তরেখা')

'রাজবন্দী' কবিতাটি কবির "পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র, কর্ম-জীবনের আদর্শ বন্ধু" সুভাষচন্দ্রের অভিনন্দনে রচিত। সেখানে কবির সঙ্গে আমাদেরও সুভাষ বন্দনায় কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা করে :

হে অজয়,
সম্মুখে কর্মের পথ, তরুণের শতেক সংশয়,
সহস্র সংকট,
অন্ধকার গিরিগুহা, বিষধর প্রচ্ছন্ন কপট ;
মায়ার কাঁদন
পশ্চাতে গুমরি' পায়ে পরাইয়া দেয় যে বাঁধন ;
আশে পাশে আর
অপদেবতার ছায়া, অট্টহাসি বিকট চীৎকার।
তুমি শুধু দাঁড়াও সম্মুখে
তব দীপালোক হতে জীর্ণ শীর্ণ অসহায় বুকে
হবে জানি সাহস সঞ্চার ;
বার বার
যে দীপ নিভিয়া গেছে যাত্রাপথ অন্ধকার করি'
তুমি তাহা উর্ধ্বে রাখ ধরি! (রাজবন্দী, 'রক্তরেখা')

'আহিতাগ্নি' কাব্যে এই মুক্তিসংগ্রামের বৃহত্তর রূপের প্রতি কবি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। কবি সেই স্বদেশ-সেবকের অপেক্ষায় রয়েছেন,

মৌনদেবতার মুখে যে ফুটাবে তৃপ্ত বরাভয়
নিশ্চল পাষাণদেহে অগ্নিমন্ত্রে সঞ্চারিবে প্রাণ,
উদয়শিখরে লভি উষার প্রথম পরিচয়
অতন্দ্রিত সাধনায় অমৃতের সে পাবে সন্ধান।

(পাষাণ-প্রতিমা, 'আহিতাগ্নি')

কবি নরদেবতার বন্দনা করে বলেছেন,

মানুষ ও দেবতায় তাই চাহি ভীষণ সংগ্রাম,
মানুষ অমর নহে, আরো ভাল বিধি তার বাম।
প্রদীপ্ত পৌরুষে নর জিনি লবে স্বর্গের আসন,
সন্ধিসর্তে স্বর্গদূত ধরাতলে আনিবে ভাষণ ;
অগ্নিময়ী বাণীর ঝঙ্কারে
মানুষ সেদিন দিবে সমুচিত উত্তর তাহারে।
ভুবনবিজয়ী নর, নাহি ডরে দেব কোপানল
গৌরব তিলক তার সমুন্নত ললাটে উজল ।

(নরদেবতায়, 'আহিতাগ্নি')

পরবর্তী 'জ্বলন্ত তলোয়ার' কাব্যটি তরুণ ভারতের মুক্তিদূত সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে রচিত। দেশপ্রেম ও বন্ধুপ্রেমের সম্মিলনে জাত এই কাব্য সমালোচকের সাধারণ বিচারের উপরে : কবি আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে যখন বলছেন,

প্রাণের বন্ধু, এলে দুর্যোগ রাতে
রাঙা রাখী তাই পরানু তোমার হাতে,

হৃদয়-শোণিতে রঙীন এ রাখী
বুকের আড়ালে লুকাইয়া রাখি
আশাপথ চেয়ে অপলক আঁখি
ভিজে উঠে বেদনাতে—
কে জানিত হায়, অমাবস্যায়
দেখা হবে তোমা সাথে।

(দুর্যোগ রাতে, 'জলন্ত তলোয়ার')

তখন কবির প্রতীক্ষায় সমর্থন জানিয়ে ক্ষান্ত হই।

॥ ৬ ॥

সূচনায় বলেছি, বিষয়-পরিবর্তন ও আঙ্গিকের নব নব পরীক্ষায় সাবিত্রীপ্রসন্নের অশ্রান্ত কৌতূহল রয়েছে। 'মডার্ণ কবিতা' ও 'অতসী' কাব্যদুটি তার প্রমাণ। এ দুটি কাব্যের উপজীব্য সমকালীন নাগরিক সমাজ—বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতা নগরীর সমাজ। সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপে সাবিত্রীপ্রসন্নের নৈপুণ্য এখানে প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যোৎকর্ষের বিচারে এই কাব্যদুটি হয়ত উঁচু আসন পাবে না, তবে বিষয় ও আঙ্গিকের নোতুন পরীক্ষা রূপে এর মূল্য আছে। যে সাবিত্রীপ্রসন্ন পল্লীবাংলার, রোমান্টিক প্রেমসাধনার, প্রকৃতিবন্দনার এবং দেশানুরাগের কবি, সেই সাবিত্রীপ্রসন্নের এক নবতর পরিচয় পেয়ে আমরা চমকে উঠি। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ যে অনড়, পুরাতনের উপাসক ও রক্ষণশীল, এই সকল অভিযোগের সবল প্রতিবাদ হিসেবে 'মডার্ণ কবিতা' ও

'অতসী' কাব্যকে উপস্থিত করতে পারি। আধুনিক রবীন্দ্র-প্রভাব-অতিক্রমেচ্ছু কবিসমাজের যে সামান্য লক্ষণ—নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি, ঈষৎ ব্যঙ্গপ্রবণ জীবনবোধ—তারই প্রতিধ্বনি এখানেও পাই। অথচ সাবিত্রীপ্রসন্ন যে কাব্যে ও চিন্তায় রবীন্দ্রজীবন-বোধের দ্বারা প্রভাবিত, তা অবশ্যস্বীকার্য। সেই জন্যই এগুলির বিশেষ মূল্য রয়েছে। সমর সেন বা বিষ্ণু দে-র চতুর নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত এখানে সম্পূর্ণরূপে দেখা দেয় নি, তথাপি তাঁদের সমকালীন ভিন্ন শিবিরের কবিও যে 'চল্লিশের দশকে' এই ধরণের কবিতা রচনা করেছেন, তা বর্তমান কাব্যান্দোলনের ইতিহাসে অনুপেক্ষণীয়। আধুনিক বাঙালি সমাজের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় এই দুটি কাব্যগ্রন্থে। কবিতাগুলির নামেই তার প্রমাণ রয়েছে। 'মডার্ণ কবিতা'র প্রায় সব কবিতার নামই ইংরেজি : 'জেলাসি', 'ম্যামজেল্', 'কনফেশন্', 'লেডিজ সিট', 'প্যারাডাইস লস্ট', 'রোমান্স' প্রভৃতি। আবার 'অতসী' কাব্যে গল্পের ঢঙে গদ্য কবিতার ছন্দে জীবনের 'little ironies'-এর পরিচয় বিধৃত হয়েছে। 'নিত্যানন্দ পাকড়াশী', 'সমরদা', 'মঞ্জুশ্রী', 'মন্দাকিনী', 'অতসী' প্রভৃতি গল্পধর্মী কবিতায় জীবনের বিদ্রূপে-বেদনায় ভরা কঠিন-কোমল মুহূর্তগুলির বিবরণ পাই। বোধ করি এগুলিকে আধুনিক পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কে কবির প্রতিক্রিয়ারূপে বিচার করাই উচিত।

প্রশ্ন হতে পারে, রবীন্দ্রানুসারী কবির পক্ষে এটা স্বাভাবিক, না আদর্শচ্যুতি। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন আদর্শচ্যুতির কথা জোরের

সঙ্গে অস্বীকার করেছেন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে, দেশ ও কালের প্রতি যে অনুরাগ সাবিত্রীপ্রসন্নকে 'পল্লীব্যথা' বা 'রক্তরেখা' রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল, তা সমকালীন ভেঙে-পড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল নগরজীবনের ওপর এই ধরণের ব্যঙ্গকবিতা ও গভীর অর্থবহ কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত করেছে বলে আমার ধারণা। কিন্তু সাবিত্রীপ্রসন্ন সেখানেই থামেন নি। গত দশ বছরে নানা বিষয়ে ও নানা আঙ্গিকে তিনি সমিল কবিতা ও গদ্য কবিতা লিখেছেন। স্বভাবতই অজস্র-প্রসবী লেখনী থেকে নিয়তই উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম হয় না, অপকৃষ্ট কবিতাও আসে। সাবিত্রীপ্রসন্নের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন কাব্যচর্চা কবির নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচায়ক, এ কথা স্বীকার্য। যে প্রীতিপ্রসন্ন আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত রূপমুগ্ধ কবিমন নিয়ে তিনি এসেছেন, তা-ই তাঁকে অশ্রান্ত তাড়না করে ফিরছে। অপরিতৃপ্তি ও সদা-জাগ্রত কৌতূহল চলিষ্ণু মনের লক্ষণ। সাবিত্রীপ্রসন্ন এই মনের অধিকারী ; সেই জন্যই এই নব নব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকেই আবিষ্কার করে ফিরছেন, একথা মেনে নেওয়া উচিত। তথাপি একথা ভরসা করে বলতে পারি, সাবিত্রীপ্রসন্নের কবি-প্রতিভার আজ পর্যন্ত সার্থক স্ফূর্তি ঘটেছে দেশপ্রেম ও নারীপ্রেমের কবিতায়, সামাজিক ও ব্যঙ্গপ্রবণ কবিতায় নয়। মূলতঃ সাবিত্রীপ্রসন্ন একটি রোমান্টিক কবিমনের অধিকারী—যা আজো তাঁকে প্রিয়া ও পৃথিবীর বন্দনা গানে আকর্ষণ করে।

নজরুল ইসলাম

॥ ১ ॥

আমেরিকার জননন্দিত কবি ওয়াল্ট্ হুইটম্যানের কথা ঃ "Who touches this book, touches a man"। নজরুল সম্পর্কে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। একটি প্রবল ব্যক্তি-চরিত্রের স্পর্শ পাওয়া যায় তাঁর গানে ও কবিতায়। তাঁর স্বাতন্ত্র্য, তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর দোষগুণ—সবই কবিতায় প্রতিফলিত। এই উচ্ছ্বাস, এই প্রাণবাহুল্য, এই দৃপ্ত জীবনাবেগই নজরুলের ব্যক্তি-পরিচয় এবং কাব্য-পরিচয়। সেই যে গোলাম মোস্তাফার বিখ্যাত ছড়া ঃ

কাজি নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম।
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
হেসে গান গায় দিন রাত,
প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়,
ধরায় পর তার কেউ নয়।

এখানেই নজরুলের সম্পূর্ণ পরিচয়টি বিধৃত হয়েছে। নজরুল ইসলামের কাব্যে এই গুণনিচয়ের প্রকাশ অনায়াসলক্ষ্য।

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে নজরুলের জন্ম (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, ২৪ মে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)। অপরিসীম দারিদ্র্যের

মধ্যে কেটেছে বাল্যজীবন, লেখাপড়া বিশেষ এগোয়নি, তবে বাংলা ও আরবী-ফারসী পাঠশালা-মক্তবে ভাল করে শিখেছিলেন। তের-চোদ্দ বছর বয়সে 'লেটো' দলে যোগ দিয়ে ওস্তাদ কবিয়াল ও গাইয়ে হয়ে ওঠেন। তখনি দ্রুত পদ্য রচনা, নাটক রচনা, সঙ্গীত রচনা ও সুর যোজনার কাজে হাত পাকা হয়। বার তিনেক স্কুল ছাড়াছাড়ির পর নজরুল পাঠ সাঙ্গ করে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৪৯ নম্বর পল্টনে যোগ দিয়ে করাচী চলে গেলেন। সেনানিবাসে তাঁর কাব্যচর্চা অব্যাহত ছিল। এক পাঞ্জাবী মৌলবীর সাহায্যে ফার্সি শেখেন, বিশেষ করে পড়েন 'দেওয়ান-ই-হাফিজ'। করাচী থেকে তিনি কবিতা লিখে পাঠাতেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও 'সওগাত' পত্রিকায়। হাফেজের একটি কবিতার অনুবাদ 'আশায়' বার হয় 'প্রবাসী'র পৌষ ১৩২৬ (১৯১৯) সংখ্যায়। এ সময়—১৯১৯-এর এপ্রিলে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এই সময়ে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা বের হয় ১৩২৭ সালের বৈশাখে (১৯২০)। এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখা শুরু করেন 'বাঁধনহারা' উপন্যাস লিখে। তিনি পর পর তিনটি পত্রিকা সম্পাদন করেনঃ নবযুগ (দৈনিক, ১৯২০), 'ধূমকেতু' (সাপ্তাহিক, ১৯২২), লাঙল (সাপ্তাহিক, ১৯২৫)। ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' ও 'কামাল পাশা' কবিতা দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি খ্যাতির শীর্ষে উঠলেন। সে খ্যাতির দীপ্তি আজো অম্লান।

নজরুলের সাহিত্যজীবন স্বল্পকালের। ১৯১৭ থেকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ—এই পঁচিশ বছরে তাঁর সাহিত্য-জীবন বিধৃত। এর মধ্যে অশ্রান্ত বেগে তিনি রচনা করেছেন কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ। তাঁর প্রতিভার যোগ্য বাহন কবিতা, গদ্য নয়! তাই গদ্যে তিনি যাই লিখে থাকুন না কেন, নজরুল-প্রতিভা বিচারে তার ঠাঁই নেই! অতিমুখর মনের বিশৃঙ্খল, অনর্গলস্রোত চিন্তাধারা গদ্যের সংযমে বাঁধা পড়তে চায় নি, ফলে নজরুলের গদ্য বিশৃঙ্খল, ভাবাতিরেকে ও উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত। নাটক রচনায়ও নজরুল বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। নাটকের বাস্তব দাবিকে তিনি কখনোই সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে পারেন নি। বস্তুত গদ্য-প্রবন্ধ বা নাটক তাঁর স্বভাবের বিরোধী ছিল। তাঁর প্রতিভাব যোগ্য বাহন কবিতা ও গান। এ দুয়ের একটি কালানুক্রমিক তালিকা এখানে দিচ্ছি। কাব্য : অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলন চাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), প্রলয়শিখা (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৪) পূবের হাওয়া (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫), চিত্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ফণি-মনসা (১৯২৭), সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৭), ঝিঙে-ফুল (১৯২৮), সাতভাই চম্পা (১৯২৮), জিঞ্জীর (১৯২৮), চক্রবাক (১৯২৯), সন্ধ্যা (১৯২৯), নতুন চাঁদ (১৯৪৫), মরু-ভাস্কর (১৯৫০), শেষ সওগাত (১৯৫৮), সঞ্চিতা (কাব্যসংকলন, ১৯২৮)। গান : বুলবুল (১ম : ১৯২৮,

২য় : ১৯৫২), চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, জুলফিকার (১৯৩২), গানের মালা (১৯৩৪), বনগীতি (১৯৩২), গুলবাগিচা, গীতিশতদল (১৯৩৪), সুরসাকী (১৯৩১), নজরুল-গীতিকা (সংকলন, ১৯২০)।

॥ ২ ॥

বাংলা কাব্যের আসরে নজরুল যখন এলেন তখন রবীন্দ্রনাথের বলাকা' কাব্য বেরিয়ে গেছে। 'বলাকা'র উন্মাদনায় তখন কাব্যাকাশ ভরে আছে। আর সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন চূড়ায় উঠেছে। নজরুলের 'বিদ্রোহী' একান্তই তাঁর নিজস্ব আমদানি নয়। 'বলাকা'র মানবিক পৌরুষদীপ্তি 'বিদ্রোহী'র রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির উত্তেজনায় পুনরুজ্জীবিত। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে উদ্ধার করে নজরুলকে সাহিত্যজগতে পরিচিত করিয়ে দেন মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলালের দার্ঢ্য ও বলিষ্ঠতা নজরুলেরও ছিল; তা দেখেই হয়ত মোহিতলাল নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মোহিতলালের ক্লাসিক সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা নজরুলের চরিত্রে ছিল না, সুতরাং মোহিতলালের প্রভাব গোড়াতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব নজরুলের কাব্যে পড়েছিল, একথা অনস্বীকার্য। তা সত্ত্বেও নজরুলের স্বকীয়তা গোড়া থেকেই সুস্পষ্ট, সোচ্চার। তা এত স্পষ্ট ও প্রখর যে চোখে না পড়ে পারে না। 'বিদ্রোহী' ও 'কামালপাশা' কবিতা দুটি তার অবধারিত প্রমাণ।

নজরুল যে রবীন্দ্রপ্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তার প্রমাণ 'বলাকা'র অমর চরণগুলির সঙ্গে 'বিদ্রোহী'র সমধর্মিতা। আর 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়েই।

'বলাকা'র

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধ্‌বে,
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

অথবা ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে অবুঝ, ওরে সবুজ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

অথবা শিকল-দেবীর ঐ যে পূজা-বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া,
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি'।
ঝড়ের মাতন বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা বাছা
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

এই চরণগুলির প্রতিধ্বনি শুনি 'বিদ্রোহী'তে—

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,

আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না ক' কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো,
আমি ভীম ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটী, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর—
চির উন্নত মম শির!......
আমি বেদূঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।

(অগ্নিবীণা)

'বিদ্রোহী' কবিতার দুটি চরণে নজরুলের কাব্যধর্ম ধরা পড়ে বলে আমার বিশ্বাস। "আমি মানি না ক' কোনো আইন" আর "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ"—এই দুটি চরণে নজরুলের পরিচয় পাই। কাব্যসংসারের প্রচলিত আইন-কানুন যে তিনি মেনে চলবেন না এবং নিজস্ব দুর্বার দুর্বশ হৃদয়াবেগের নির্দেশ ছাড়া আর কোনো নির্দেশ পালন করবেন না, তার প্রমাণ এই কবিতায় রয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতা অনবদ্য কবিতা নয়, ত্রুটি রয়েছে যথেষ্ট। তারুণ্য ও

প্রাণাবেগে চঞ্চল কবিস্বরূপটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে, আবার সেই সঙ্গে ধরা পড়েছে বেহিসেবীপনা ও অতিরেক। বিভিন্ন ভাবের সমাহরণ এই কবিতায় হয়েছে, কিন্তু তা সঙ্গতি-সুষমা লাভ করে নি। অত্যাশ্চর্য শক্তির অপরিণত প্রকাশ বলেই 'বিদ্রোহী' কবিতা কাব্যপাঠকের কাছে বেদনাদায়ক হয়েছে। এই কবিতার প্রধান গুণ—অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা, প্রধান দোষ—চড়া সুর ও ভাবাতিরেক। এই কবিতায় হৈ-চৈ আছে প্রচুর, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে গভীর ও আন্তরিক আবেগ, যা সকল মহৎ কাব্যের প্রাণ। কেবল দুঃখ এই, নজরুলের 'গৃহিণীপনা' ছিল না, বোধ হয় হিসেবী ও সংযত হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না।

কিন্তু কাব্যদেহনির্মাণে নজরুল যতই ত্রুটিপূর্ণ হোন না কেন, তাঁর অসাধারণ লোকপ্রিয়তা অনস্বীকার্য। ১৯২০-এর লোকপ্রিয়তা আজো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই বাস্তব দিকটি কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। নজরুল 'তিরিশের' যুগে রবীন্দ্রশাসিত কাব্য জগতের একটি উপগ্রহ মাত্র নন, তিনি ধূমকেতু, তিনি যুগের উন্মাদনার চড়া সুরে তাঁর কাব্যবীণাকে বেঁধে নিয়েছেন, রাজনীতির আবর্তে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মতো তিনিও সাময়িক ঘটনা নিয়ে অজস্র কবিতা লিখেছেন, Topical poet হতে তাঁর বাধে নি। কবি যে একক নন, স্বতন্ত্র নন, তিনি যে দেশের ও দশের, এ কথাটা নজরুল সম্পূর্ণরূপে স্বীকার

করেছিলেন। তাই তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা। 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় নজরুল স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি',
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি !
কেহ বলে, 'তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে !
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকালে বাণী কই, কবি ?'
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী।......
বন্ধু গো আর বলিতে পারি না বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে নাক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুঃখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে !

(সর্বহারা)

সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, দেশের তরুণ শক্তির উপর গভীর বিশ্বাস, শাসক ইংরেজের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং সমাজের অত্যাচারী-অনাচারীদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ এই যুগে—'তিরিশের' দশকে—নজরুলের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বিদ্রোহ দু' প্রকারের। এক, দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে, দুই, সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ নোতুন কিছু নয়, কিন্তু তা নজরুলের কণ্ঠে এত গভীর, এত তীব্র, এত আন্তরিক হয়ে শোনালো যে মনে হল নজরুল-

প্রতিভার এই প্রতিবাদ বিদ্রোহের সঙ্গে অনুস্যূত, এই বেদনা নজরুল-প্রতিভায় মিশ্রিত। এত আবেগ দিয়ে, জোর দিয়ে তখন কেউ এভাবে বলেন নি,

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।

('আমার কৈফিয়ৎ', সর্বহারা)

নজরুল জন ও জনতার বন্ধু, জনতার কবি। জনপ্রেম, দেশপ্রেম, উদার অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেম নজরুলের কবিতায় বিধৃত হয়েছে। সত্যই তিনি চারণ-কবি। তাই তিনি সোচ্চার-কণ্ঠ, চড়া সুরে তিনি প্রতিবাদ জানান, দুর্দম আবেগে তিনি অভিশাপ দেন। কিন্তু তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যায় ভূষিত করলেই আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত হয় না। সমসাময়িক দেশকাল থেকে কবি যে সত্য আহরণ করেন, তা যদি আন্তরিক গভীর কাব্যরূপ লাভ করে, তবেই তা সার্থক। এইদিক থেকে বিচার করলে নজরুলের কাব্য যে অনেকাংশে সার্থক একথা বলা যায়।

অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা—অকৃত্রিম সহজ প্রকাশ—আন্তরিক ভাবাবেগ—দৃঢ় প্রত্যয় নজরুলের কাব্যে রয়েছে। 'তিরিশের' যুগে বিপর্যস্ত জীবনে, অশান্ত দেশকালে, মানুষের জীবনে মহৎ মূল্যবোধের শোচনীয় পরিণতিতে ব্যথিত এক তরুণ কবিপ্রাণ উন্মাদ হয়ে ছুটে গেছে, ব্যর্থতার প্রাচীরে মাথা কুটে মরেছে; প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে যে লগ্নে বিচারের

বাণী নীরবে-নিভৃতে কেঁদেছে, সে লগ্নে এই তরুণ কবিপ্রাণ সমস্ত আবেগ দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। যদি গভীর আন্তরিকতা কবিতার ভিত্তিভূমি হয়, তবে নজরুল তা দাবি করতে পারেন। যদি দেশের ও দশের প্রতি মমত্ব কবিকে সোচ্চার ও মুখর করে তোলে এবং তা যদি কাব্যাপরাধ না হয়, তবে নজরুল সেই গুণে গুণান্বিত। এই মাপকাঠিতে যদি বিচার করি, তবে নিম্নধৃত চরণগুলি পাঠকহৃদয়ের আন্তরিক সমর্থন লাভ করে—

(১) মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

('বিদ্রোহী', অগ্নিবীণা)

(২) দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ,
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

('কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', সর্বহারা)

(৩) গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ. অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে, সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
('মানুষ', সাম্যবাদী, সর্বহারা)

(৪) সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণ-কর।
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
('নারী', তদেব)

(৫) শ্বেত, পীত, কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো, তুমি ভালো জান, নহে তাহা অপরাধ!
তুমি বল নাই, শুধু শ্বেতদ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে,
সাদা র'বে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।
ভগবান! ভগবান! ('ফরিয়াদ', সর্বহারা)

(৬) এই শিকল-পরা ছল মোদের এই শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই তোদের মোরা করব রে বিকল॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়॥
এই বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করবো মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল॥ (বিষের বাঁশী)

এই সব কবিতা ও গান পাঠের পর আমরা রবীন্দ্রনাথের অভিমত পুনরাবৃত্তি করে বল্‌তে পারি : "অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা, তার অনবদ্য ভাব-মূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে। কৃত্রিমতার কোন ছোঁয়াচ তাকে কোথাও ম্লান করেনি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করেনি। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধা-গুণের ঊর্ধ্বে তার আসন গ্রহণ করেছে।"

॥ ৩ ॥

সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত কবিতাকে চিরন্তনের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে দেবার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। দুয়েকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। শান্তিনিকেতনে নলকূপ-খনন উপলক্ষে রচিত হয় 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,' শান্তিনিকেতনের গার্ল-গাইড্‌স্‌দের জন্য 'অগ্নিশিখা, এসো এসো', ওখানকার মেয়েদের জিউ-জুৎ-সু শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা', বৃক্ষরোপণ উৎসব-উপলক্ষে রচিত হয় 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে' প্রভৃতি। নজরুলও এই ক্ষমতা কতকটা আয়ত্ত করেছিলেন। একবার সরস্বতী-বন্দনা উপলক্ষে একটি কবিতা রচনার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে নজরুল রচনা করেন বিখ্যাত 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী'

কবিতাটি—মনের মধ্যে ধ্বনিত হয় সেই অবিস্মরণীয় চরণগুলি :

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী ?
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর ?
পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন—'দেড়শত বছর'।
সপ্তসিন্ধু তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যেখানে শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত্র ঘায়,
যন্ত্রী যেখানে সান্ত্রী বসায়ে
বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,
সেথান হতে কি বেতার-সেতারে
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর ?
মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী ?
ধ্বংস হল কি রক্ষ-পুর ?
যক্ষপুরীর রৌপ্য পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ-কমল ?
কামান গোলার সীসা-স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শীশ-মহল ?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হল কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব ?
তবে এ কিসের আর্ত আরতি,
কিসের তরে এ শঙ্খারাব ? (ফণি-মনসা)

॥ ৪ ॥

কিন্তু নজরুল-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় এই সব চড়া-সুরে-বাঁধা কবিতায় প্রকাশ পায় নি। এখানে হৈ-চৈ আছে, প্রবল দুর্দম উচ্ছ্বাস আছে, ভাবের অসংযম, ছন্দের শৈথিল্য ও শব্দের অতিরেক আছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় ত্রুটি প্রচুর, 'সাম্যবাদী'-পর্যায়ের কবিতাগুলিতে প্রচুর যুক্তি আছে অথচ তা দুর্বল, 'সিন্ধু' কবিতার তিন তরঙ্গেই অতিকথন-দোষ ঘটেছে। নজরুল-প্রতিভার পরিচয় এখানে নয়, অন্যত্র। তাঁর সাহিত্যজীবনের মধ্যদিনে তিনি যে প্রেম-কবিতা ও গান রচনা করলেন, সেখানেই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ অজস্র অকৃপণ ধারায় লাভ করলেন। নজরুলের লোকপ্রিয়তা 'বিদ্রোহী'-যুগের কবিতায়—রাজনৈতিক সামাজিক ও প্রতিবাদমূলক সোচ্চার কবিতানিচয়ে। কিন্তু তাঁর যথার্থ প্রতিষ্ঠা প্রেম-কবিতা ও গজল গানে। প্রথম যুগের শৈথিল্য, অপরিচ্ছন্নতা, বিশৃঙ্খলা এই পর্বে কমেছে এবং তার ফলেই আমরা উঁচুদরের গান ও কবিতা পেয়েছি। তথাপি, একথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, ত্রুটিহীন প্রেমের কবিতা নজরুল কমই লিখেছেন, এবং বারবারই পুনরুক্তি-দোষ ঘটেছে। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, এই যুগে কেবল অনবদ্য চরণ নয়, অনবদ্য কবিতাও তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে। এখানে নজরুলের প্রেম-কবিতা ও সঙ্গীত একত্র আলোচনা করছি। আমাদের কাছে গানগুলির কাব্য-

মূল্যই বিচার্য। যে নজরুল অসংযত, অসংবৃত, প্রগল্‌ভ, তাঁর দেখা এই পর্বে বিরল; আর সেই জন্যই নজরুল প্রতিভার স্থায়ী স্বাক্ষর এখানেই আছে, 'বিদ্রোহী'-যুগের চড়াসুরের কবিতায় নেই।

নজরুলের কাব্যধারা কোনো নির্ধারিত পথে এগোয় নি, বা পরিণতি লাভ করে নি। সর্ব রকম নিয়ম কানুনের তিনি বিরোধী ছিলেন। তাই 'অগ্নিবীণা'র 'বিদ্রোহী'-হুঙ্কারের পরই 'দোলন-চাঁপা'র শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে, ছন্দের নেশায় 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবি খেলায় মেতেছেন। 'ছায়ানটে' এই ছন্দের নেশা ও ভাবের মাধুর্য কল্পনাবেশে সমৃদ্ধ হয়েছে, 'চৈতী-হাওয়া'র উদাস দুপুরে পাঠক মনে নেশা ধরে—'ঘুম জড়ানো ঘুম্‌তী নদীর ঘুমুর পরা পায়!' রণক্লান্ত বিদ্রোহীর জগৎ থেকে কবি কতদূরে চলে গেছেন। তারপরই 'ভাঙার গান', 'বিষের বাঁশী', 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা' কাব্যে কবি সমকালীন রাজনীতি-আবর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, 'দোলন-চাঁপা'র রসাবেশ ছেড়ে চলে এলেন। সমগ্র দেশকে উদ্বোধনী মন্ত্রে জাগ্রত করার ব্রত নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের শত্রু হিসেবে কবি দেখা দিলেন। কবি ও কাব্য দুই-ই রাজরোষে পড়ল, কবি গেলেন ইংরেজ-কারাগারে, বিদ্রোহী বাংলার প্রতিনিধিরূপে নজরুল দেখা দিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' কাব্যনাট্য উৎসর্গের মধ্যে দিয়ে সমগ্র দেশ কবিকে জনকবি বলে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু আবার পট-পরিবর্তন হল। 'দোলন-চাঁপা' 'ছায়ানটে'র রসাবেশবিহ্বল

দিনগুলি যেন আবার ফিরে এল, 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যে 'আবার ফিরে এল বসন্তের দিন'। কবি একদিকে 'সিন্ধু'তরঙ্গে জীবনরহস্য অনুসন্ধান করলেন, অপর দিকে বিহ্বল যৌবনের রূপাঙ্কনে ব্যগ্র হলেন। 'অ-নামিকা', 'গোপন-প্রিয়া', 'মাধবী-প্রলাপে' বাংলাকাব্যকুঞ্জ মুখরিত হয়ে উঠল। 'চক্রবাক' কাব্যে 'সিন্ধু হিন্দোলে'র ইন্দ্রিয় চেতনা, প্রেমের উন্মত্ততা সংহত রূপ পেল। ১৩৩৩-এর বৈশাখের 'কালিকলমে' বেরুল 'মাধবী প্রলাপ', তারপরই 'অনামিকা'। কল্লোলগোষ্ঠীর একজন রূপে সেদিন নজরুল দেখা দিলেন—যৌবনের বন্দনায় তিনি সেদিন অচিন্ত্যকুমার-বুদ্ধদেবের সহযাত্রী হলেন। কিন্তু এখানেই নজরুল থামলেন না। 'চিত্তনামা'য় দেশবন্ধু-তর্পণ করে তিনি আবার ফিরে গেলেন 'অগ্নিবীণা', 'ভাঙার গান', 'বিষের বাঁশী'র দিনগুলিতে। 'সন্ধ্যা' ও 'চন্দ্রবিন্দু' কাব্যে সর্বহারার জন্য আর্তবেদনা আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা পুনর্বার শোনা গেল।

রুদ্র থেকে রতি, রতি থেকে রুদ্র, রুদ্র থেকে পুনর্বার রতিতে : এইভাবে নজরুল বারবার যাওয়া-আসা করেছেন। তাঁর শেষ কাব্য 'নতুন চাঁদ'-এ আবার তিনি রোমান্টিক প্রেমের অনন্ত বেদনার জগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর মহাজীবনকে উপলব্ধির যে ব্যাকুলতা ছিল 'সিন্ধু-হিন্দোলে' তার প্রতিধ্বনি শুনি গজল-গানে ও অধ্যাত্ম-সঙ্গীতে। রুদ্ররূপ বা বিদ্রোহী রূপটাই নজরুল সম্পর্কে শেষ কথা নয়। 'নতুন

চাঁদ' (১৯৪৫) কাব্যে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে নজরুল বলেছেন :

দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি,
একা তুমি জানিতে হে কবি মহাঋষি
তোমারি বিদ্যুতচ্ছটা, আমি ধূমকেতু।

('অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি')

নজরুল শেষ পর্যন্ত এই রোমান্টিক প্রেমবিরহ, 'অশান্ত রোদনের' কবি।

॥ ৫ ॥

প্রেমকবিতা ও গানে নজরুল তীব্র ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের উপাসক। দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মোহিতলাল মজুমদার যে প্রেমকবিতা লিখেছেন, নজরুল তাকেই শিল্পসুন্দর রূপ দিয়েছেন। তীব্র passion, হৃদয়াবেগ, উন্মাদনা, সব-ভোলানো প্রতপ্ত প্রেমাবেগের পূজারী ছিলেন নজরুল। বায়রন, কীটস্, বার্ণস্-এর প্রেমকবিতায় যে তীব্রতা, তা নজরুলের রচনায় সমুপস্থিত ; তথাপি নজরুল দেহভিত্তিক প্রেমের পূজারী নন, তিনি রোমান্টিক প্রেমের উপাসক। প্রথম জীবনে রচিত 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসে তিনি যে ব্যর্থ প্রেমের ছবি এঁকে-ছিলেন (যাতে ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব অনতিস্পষ্ট), তার ধুয়া নজরুল সারাজীবন ধরে গেয়েছেন। রোমাণ্টিক কৈশোর প্রেমের উচ্ছ্বাস এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য, প্রেমকবিতা ও

গানেও সেটি আবিষ্কার করা বিশেষ কঠিন নয়। অজানা বাসনাব্যাকুল তীব্র মদির অতৃপ্ত দেহস্পর্শধন্য প্রেমের বিবরণ পাই 'দোলন-চাঁপা'র 'পূজারিণী' কবিতাটিতে :

কার বক্ষ টুটে
মন প্রাণ পুটে
কোথা হতে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে?
মন-মৃগ ছুটে ফেরে ; দিগন্তর তুলি' ওঠে মোর ক্ষিপ্ত হাহাকার-ত্রাসে !
কস্তুরী হরিণ সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে ; গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম।
আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা !
অনন্ত অগস্ত্য-তৃষাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দু সম, মাগে সিন্ধু আর।
ভগবান! ভগবান! একি তৃষ্ণা অনন্ত অপার!

এই যৌবনদ্রোহী আত্মকেন্দ্রিক রোমান্টিক অতৃপ্ত অনির্দেশ্য প্রেমসাধনার পরিণতি বিরহ-আর্তনাদে। এই কবিতাটি বাংলা প্রেমসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রোমান্টিক প্রেমচেতনা অন্তর্দ্বন্দ্বে, ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যানুভূতি ও মূর্তিমতী নারীতে বিচলিত হয়ে সৌন্দর্যস্বর্গ রচনা করেছে। এই স্বপ্ন-চারণার পরই কবির বেদনার্তি :

সখি! আমার আশাই দুরাশা আজ, তোমার বিধির বর,
আজ মোর সমাধির বুকে তোমার উঠবে বাসর-ঘর!

শূন্য ভরে শুনতে পেনু
ধেনু-চরা বনের বেণু—
হারিয়ে গেনু হারিয়ে গেনু
অস্ত-দিগঙ্গনে।
বিদায়-সখি, খেলা-শেষ এই বেলা-শেষের খনে!
এখন তুমি নতুন মানুষ নতুন গৃহকোণে॥

('পিছু-ডাক', দোলন-চাঁপা)

এই রোমান্টিক প্রেমবিধুরতা নজরুলের প্রেমকবিতার প্রধান সুর।

তুমি অমন করে গো বারে বারে জল ছলছল চোখে চেয়ো না
জল ছলছল চোখে চেয়ো না।
ঐ কাতর কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না,
শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না॥

('বিদায়বেলা', ছায়ানট)

এই রোমান্টিক প্রেমব্যাকুলতার বিনম্র স্নিগ্ধ করুণ প্রকাশ:

বিদায় যেদিন নেবো নাই-বা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে না ক'—সেই ত মনে স্থান!
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠবে বেঁচে, সেই ত আমার প্রাণ!
নাই-বা পেলাম, চেয়ে গেলাম, গেয়ে গেলাম গান।

('গোপন প্রিয়া', সিন্ধুহিন্দোল)

এই রোমান্টিক ব্যাকুলতা প্রতপ্ত প্রেমাবেগে জ্বলে উঠল 'সিন্ধুহিন্দোলে'র কয়েকটি কবিতায়। প্রেমের নবীনতা, চাঞ্চল্য,

সঙ্কোচ, ভীরুতা, কামনার শিহরণ ও বিহ্বলতাকে নজরুল নিপুণভাবে ধরেছেন 'ফাল্গুনী' কবিতায় :

আজ সঙ্কেত-শঙ্কিতা বন বীথিকায়
কত কুলবধূ ছিঁড়ে সাড়ি কুলের কাঁটায় ?
সখী, ভরা মোর এ দুকুল
কাঁটাহীন শুধু ফুল।
ফুল এত বেঁধে হুল ?
ভাল ছিল হায়
সখি, ছিঁড়িত দুকুল যদি কুলের কাঁটায়।

'মাধবী-প্রলাপে'র বিহ্বলতায় যৌবনের মত্ত লগ্নের সুন্দর প্রকাশ :

আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি।
তার নিধুবন—উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে কাম কণ্টক ব্রণ মহুয়া কুঁড়ি।

তারপরই বিশ্বরমার বন্দনা। যে নামের সীমানায় ধরা দেয় না, কামের মহিমায় বিরাজিতা, তারই বন্দনা 'অনামিকা' :

যা কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন
যা কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর
সে সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি। ছুঁয়েছি অধর

তিলোত্তমা, তিলে-তিলে! তোমারে যে করিছে চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে। প্রকাশ গোপন।......

তরু, লতা, পশু-পাখী সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্বকামনাতে।

এর পরই 'বুলবুলের' মিঠে প্রেমসঙ্গীত গজল। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল্', 'আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী', 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে', 'পানিয়া ভরণে চল লো গোরী', 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা', 'কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি', প্রভৃতি অতুলনীয় প্রেমগীতি-গুলি এই সময়েই (১৯২৮) রচিত হয়। এই সঙ্গেই স্মর্তব্য জনপ্রিয় গানগুলি: 'ভালবাসায় বাঁধব বাসা', 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয়', 'প্রিয়া হবে এসো রাণী', 'শাওন আসিল ফিরে', 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে', 'আমায় নহে গো ভালবাস মোর গান', 'কুঁচবরণ কন্যা', 'ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি', 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে', 'কেন আন ফুলডোর' প্রভৃতি গানের বাণীমূর্তি ত্রুটিহীন, শব্দচয়ন নিখুঁত, ছন্দ নমনীয়, ভঙ্গি পেলব, ভাষা স্নিগ্ধ, ব্যঞ্জনা এত মধুর যে কাব্যসম্পদে সমৃদ্ধ কবিতা হিসেবেও এগুলির মূল্য রয়েছে। সরস, কমনীয়, স্নিগ্ধ, চিত্রবহুল এই প্রেমসংগীতগুলি বাংলা গানের রাজ্যে স্থায়ী সম্পদ। কিন্তু সব গান সার্থক হয়ে ওঠেনি। তার কারণ নজরুলের দুরতিক্রম্য রচনাদোষ। সংযম

ও সামঞ্জস্যের অভাবে অনেক ভালো গান শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে।

তবে নজরুল সাফল্য লাভ করেছেন দেশপ্রেমের গানে। সেখানে তিনি আপন মহিমায় দীপ্যমান। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানের উৎকর্ষ সাফল্যের চূড়াকে স্পর্শ করেছে। 'এই শিকল পরা ছল', 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল', 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ', 'নাহি ভয় নাহি ভয়', 'চল্‌রে সুমুখে চল্‌', 'জাগো দুস্তর পথে নবযাত্রী', 'জাতের নামে বজ্জাতি', 'পলাশী হায় পলাশী', 'চল্‌রে চপল তরুণদল', 'অগ্রপথিক হে সেনাদল', 'টলমল টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে' প্রভৃতি বীর্যব্যঞ্জক গানে পৌরুষ ও বলদৃপ্ত প্রাণের পরিচয় সুন্দর ফুটে উঠেছে।

আরো একটি ক্ষেত্রে গীতিকার নজরুলের সাফল্য স্বীকৃত; তা অধ্যাত্ম-সঙ্গীতে—ইস্‌লামী সঙ্গীত ('নাতিয়া') ও শ্যামা-সঙ্গীতে। 'এলো আবার ঈদ', 'ত্রিভুবনের প্রিয় মহম্মদ', 'মহরমের চাঁদ এল ওই', 'নাম মোহম্মদ বলরে মন', 'চল্‌ নামাজি চল্‌', 'মদিনায় ডেকেছে বান', 'বক্ষে আমার কাবার ছবি', প্রভৃতি ইস্‌লামী সঙ্গীত নজরুল রচনা করেছেন। আবার 'ভুল করেছি ওমা শ্যামা', 'দেখে যারে রুদ্রাণী মা', 'শ্যামা নাম তু জপ্‌লে', 'শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা' প্রভৃতি শ্যামাসঙ্গীত জনপ্রিয় হয়েছে। বৈষ্ণব সঙ্গীত ও 'অভিসার' গানসমষ্টি তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু শ্যামাসঙ্গীতে নজরুল যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা ইস্‌লামী বা বৈষ্ণব-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঘটেনি। শ্যামা-

সঙ্গীতে নজরুল একই সঙ্গে রূপ ও অরূপের বর্ণনা করেছেন এবং তা প্রায় ক্ষেত্রেই উপভোগ্য কবিতা হয়ে উঠেছে।

॥ ৬ ॥

কেবল প্রেমের কবিতা রচনা নয়, উপযুক্ত পটভূমি রচনাতেও নজরুল নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্যে নিসর্গ বর্ণনা আলোচনা করলেই এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। নজরুলের রোমান্টিক স্পর্শকাতর কবিমন প্রকৃতির মধ্যে এক অনন্ত সৌন্দর্যপ্রতিমার নিয়তসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট' ও 'সিন্ধুহিন্দোলে' এই প্রেম-পটভূমি প্রকৃতিকে দেখি। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ সন্ধান করে ফিরেছেন নজরুল। নজরুল যে কেবল 'বিদ্রোহী' কবি নন, তিনি যে প্রকৃতি ও প্রেম, হৃদয়বেদনা ও আনন্দেরও কবি, তার প্রমাণ এই শ্রেণীর কবিতায় পাই। চৈতী রাতের পুলকবেদনার শিহরণ প্রকাশ করতে গিয়ে কবি ছবি এঁকেছেন :

> চৈতরাতির গাইত গজল বুলবুলিয়ার রব,
> দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর!
> ভুঁই তারকা সুন্দরী
> সজ্‌নে ফুলের দল ঝরি
> থোপা থোপা লাজ ছড়াত দোলন খোঁপার পর,
> ঝাঁঝাল হাওয়ায় বাজত উদাস মাছরাঙার স্বর। ('চৈতী হাওয়া', ছায়ানট

চাঁদনী-রাতের বর্ণনা :

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা বুদ্বুদ, জোছনা সোনার রাঙে।
তৃতীয়া-চাঁদের 'শাম্পানে' চড়ি চলিছে আকাশপ্রিয়া
আকাশ দরিয়া উতলা হল গো পুতলায় বুকে নিয়া!
তৃতীয়া-চাঁদের বাকী 'তের কলা' আবছা কালোতে আঁকা
নীলিমা-প্রিয়ার নীলা 'গুল্-রুখ' অবগুণ্ঠনে ঢাকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী,
শেহেলী 'লায়লি' দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি মশারি টানি।

('চাঁদনি রাতে', সিন্ধুহিন্দোল)

চিত্রকল্প রচনার অভিনবত্ব এখানে বিশেষ লক্ষণীয়।

নজরুলের কাছে প্রকৃতি স্বতন্ত্র রূপে দেখা দেয়নি, তাঁরই মনোভাবের প্রতিফলন হয়েছে প্রকৃতির রূপে। তরুণ যৌবনের চাঞ্চল্য, বেদনা, আনন্দ বিরহের প্রকাশস্থল এই নিসর্গ চিত্রনিচয়।

'সিন্ধুহিল্লোলে'র 'সমুদ্র' কবিতার তিনটি তরঙ্গে প্রেমাভিব্যক্তি রমণীয় প্রকাশ লাভ করেছে। নিবিড় মিলন ও দুঃসহ বেদনা তারুণ্যের ধর্ম। সমুদ্রে কবি নজরুল সেই ধর্ম আপতিত করে তাকে এঁকেছেন। যৌবন-বেদনার বর্ণনা :

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদমুখ
হেরিয়া উঠিলে জাগি, ব্যথা করে উঠিল ও-বুক।
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গলে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা!

নিয়া নেশা, নিয়া ব্যথা সুখ
তুলিয়া উঠিলে সিন্ধু উৎসুক উন্মুখ !
কোন্ প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হল তব স্বচ্ছ কায়া !
('সিন্ধু', প্রথম তরঙ্গ)

এ তো সমুদ্রের জবানীতে কবির আপন প্রেমবেদনারই প্রকাশ ! সমুদ্র কবির কাছে উদ্দাম হৃদয়াবেগের প্রকাশ মাত্র, তার স্বতন্ত্র সত্তা নেই। 'চক্রবাক' কাব্যের 'কর্ণফুলী', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' প্রভৃতি কবিতা অনুরূপ সাক্ষ্য দেয়।

॥ ৭ ॥

কবিতার আঙ্গিকে নজরুল সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা। শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ, আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার, বর্ণবহুল চিত্রাঙ্কনে নজরুল সত্যেন্দ্রানুসারী। বাক্যবিন্যাসগত-কৌশল, চিত্রকল্প, উৎপ্রেক্ষা ও উপমা ব্যবহারে নজরুলের নৈপুণ্য অবশ্য-স্বীকার্য। ছন্দোক্ষেত্রে পয়ারের প্রবহমানতা ও মাত্রাবৃত্তের পল্লবিত ব্যবহারে, অতি-পর্ব ও শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের নিপুণ প্রয়োগে নজরুলের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। পুরাণ ও কোর-আন্ থেকে কাহিনী ও উপমা নজরুল যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর অনায়াস দক্ষতা ছিল। কবিতার আঙ্গিক গঠনে নজরুলের ছিল অনায়াসসিদ্ধি, যদিও তা ত্রুটিবহুল। যত্নকৃত কলাবিধিতে ছিল তাঁর প্রবল অনীহা; পরিবর্জন ও পরিমার্জনে তাঁর আগ্রহ ছিল না।

অসহিষ্ণুতা, দ্রুততা, ব্যস্ততা তাঁর কবিতায় অতি স্পষ্ট। আবেগ-প্রাবল্য, উচ্ছ্বাস, অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততাই নজরুলের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। হু-হু করে লিখে ফেল্‌তে, তখুনি সুর দিতে এবং তা গাইতে নজরুলের দেরি হত না। এই আশ্চর্য ক্ষমতা একটি সিদ্ধান্তেই আমাদের নিয়ে যায়: প্রতিভা এবং তার প্রচুর অপচয়। নজরুলের প্রতিভা সম্পর্কে এর ওপর আর কেনো কথা নেই। তাঁর পঁচিশ বছরের কাব্যসাধনায় কোন প্রস্তুতি নেই, বিকাশ নেই। কেবল নিরন্তর বিষয়-পরিবর্তন আছে। রুদ্র থেকে রতি, রতি থেকে রুদ্র, রুদ্র থেকে অধ্যাত্ম-বিষয়ে, আবার সেখানে থেকে রতিতে নজরুল বারবার যাওয়া-আসা করেছেন। নজরুল সচেতন ছিলেন না তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে। তিনি জানতেন না তিনি কী করছেন। রবীন্দ্রশাসিত কাব্যসংসারে তিনি যে প্রবল আবেগ ও উদ্দামতা এনেছিলেন, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। তিনি কখনো স্থিতধী হন নি হয়ত বা হবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। যে-সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন, তার সার্থক ব্যবহার তিনি করতে পারেন নি। 'গৃহিণীপনা'র অভাব তাঁর সাহিত্যজীবনে ও ব্যক্তিজীবনে অতি প্রকট। তাঁর এই দুই জীবন একই, একটাকে বাদ দিয়ে অপরটার আলোচনা সম্ভব নয়। ব্যক্তিজীবনের উদ্দামতা উচ্ছৃঙ্খলতা 'বোহেমিয়ান'-স্পিরিট তাঁর কাব্যজীবনেও সংক্রামিত হয়েছে এবং তা থেকে তিনি কখনো মুক্ত হন নি, হয়ত তিনি মুক্তি চান নি। নজরুল স্বভাবকবি,

তাঁর সাফল্যের মূলে আছে অনায়াসসিদ্ধি। বাল্যে 'লেটো' দলে যা আয়ত্ত করেছিলেন, যৌবনে তাই ব্যবহার করেছেন। সে কবিত্বশক্তিকে নজরুল ঘসে-মেজে উন্নত করেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল, এই দুই কবির সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ; কিন্তু তিনি এঁদের গাঢ়তা ও সংহতি গুণটি পরিহার করেছেন, গ্রহণ করেছেন শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্য ও চিত্রাঙ্কনক্ষমতা। সংযম ও আবেগ, এ দুয়ের পরিণয়-সাধনে নজরুল কখনো যত্নবান হন নি।

কবি নজরুলের কবিতা আগামীকাল কী ভাবে গ্রহণ করবে, আজই তা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। শিল্পচেতনার অভাব সত্ত্বেও সমাজচেতনার আলোয় নজরুলের কবিতা ভাস্বর এবং ওজোগুণসম্পন্ন যৌবনের কবিতা হিসাবে তার মূল্য আছে।

তাঁর প্রেমসংগীত ও প্রেমকবিতা যে টিকবে, সেকথা জোর করে বলা যায়। দু হাজারের ওপর গানের রচয়িতা, অনন্য-সাধারণ সুরকার নজরুলকে সমগ্র দেশ ভবিষ্যতেও মনে রাখবে: এই আশ্বাসই আমাদের অবলম্বন। রবীন্দ্রশাসিত বাংলা কাব্যসংসারে ধূমকেতুর প্রচণ্ডতা ও বিস্ময় নিয়ে তাঁর ইতিহাস-স্বীকৃত আবির্ভাব।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একাধিক শিল্পী আছেন যাঁদের কবি-পরিচয় অপর পরিচয়ে ঢাকা পড়েছে। দর্শনের রাজনীতির নাটকের ব্যঙ্গের প্রবন্ধের রাজ্যে তাঁদের দিগ্বিজয় কাব্যজীবনকে রাহুগ্রস্ত করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ সাহিত্যশিল্পীরা কাব্যেতর কীর্তির মহিমায় অধিকতর পরিচিত। আর এই পরিচয় তাঁদের কবিমানসের সার্থক পরিচয়ের পথে বাধা উপস্থিত করেছে, এ কথাও অজ্ঞাত নয়। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রাবন্ধিক মোহিতলাল, ব্যঙ্গশিল্পী নাট্যকার প্র. না. বি., কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল মোহিতলাল ও প্রমথনাথের পরিচয়পথে যে বাধা স্থাপন করেছে তা পাঠক-সমাজ উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। এর ফলে এঁদের কবি-পরিচয়ের সম্যক্ বিচার ও আলোচনা হয় নি। এই শ্রেণীর লেখক-তালিকায় আর একটি নাম যুক্ত করতে পারি: সজনীকান্ত দাস। ব্যঙ্গশিল্পী সম্পাদক প্রবন্ধকার গল্পকার সাহিত্য-গবেষক সজনীকান্ত কবি সজনীকান্তের উপযুক্ত পরিচয় গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন পাঠক-সমাজের কাছে। অথচ এই পরিচয়ের মাধ্যমে যে কবিমানসের সাক্ষাৎ

পাই, সে কবিমানস পাঠকমনকে উদ্বেজিত করে না, কাব্য-সুধাসত্রে আমন্ত্রণ জানায়।

কবি সজনীকান্ত দাসের কাব্যজীবন ত্রিশ বৎসর কাল ধরে প্রসারিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যৌবনের প্রথম উত্তেজক লগ্নে যে যৌবনবন্দনা রচনা করেন, সেখানেই তাঁর কাব্যজীবনের যাত্রা শুরু। সেদিনের আতিশয্য পরে তীব্র ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে, অত্যন্ত দুঃসময়ে প্রায় আত্মঘাতী মুহূর্তে ব্যঙ্গ-খাতে কাব্যানুভূতি আত্মপ্রকাশ করেছে, অবসাদ ও সংশয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কখনও রবীন্দ্রাশ্রয়ে, কখনও বা জীবনের অন্তহীন পথে, কখনও বা যৌবনের উন্মাদনায় কবিমানস নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছে এবং এরই মধ্য দিয়ে আজ দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে প্রৌঢ়ির বিষণ্ন সন্ধ্যায় মানবপ্রেমের তীর্থে উপনীত হয়েছে। কবি সজনীকান্তের কাব্য-পরিক্রমা অন্তে আমরা এই ধ্যানগম্ভীর প্রসন্ন বেদনামুক্ত আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হই। বর্তমান প্রবন্ধে কাব্যপথ-পরিক্রমার ফলশ্রুতি সেই আনন্দলোকে উত্তরণ।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন মধ্যাহ্ন-গগনে, তখন যে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ কাব্য-যাত্রায় বেরিয়েছিলেন, কবি সজনীকান্ত তাঁদেরই একজন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে কেন্দ্র করে যে কবি-পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছিল, তাঁদেরই বলি রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ। এই কবিদের মধ্যে কয়েকটি সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করা যায় যা তাঁদের একসূত্রে

বেঁধে রেখেছিল। এঁদের কাব্য-পরিচয় দেওয়া যেতে পারে এইভাবেঃ প্রাচীন কাব্যধারার মধ্যে নবীনত্বের উদ্‌ঘাটন, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন, সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন ধারাকে বহুনোপযোগী সংবেদনশীলতা ও চারিত্রদান এবং গ্রামজীবনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মমতা প্রকাশ। এঁদের কবিতায় লক্ষ্য করি রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শে অবিচল নিষ্ঠা, সৃষ্টি ও মঙ্গলে গভীর আস্থা, শান্তির শেষ বিজয়ে বিশ্বাস। ঐতিহ্যপ্রীতি ও নিসর্গপ্রেম, গ্রামজীবনানুরাগ ও গার্হস্থ্য জীবনাসক্তি, অমৃততৃষা ও আস্তিকতা, জীবনের গভীরতর রহস্যের ভারতীয় দর্শানালোকে প্রেক্ষণ ও ভারতীয় জীবনের মজ্জাগত বৈরাগ্যপ্রীতি, গভীর জীবনপ্রেম ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের বাতাবরণ গড়ে তুলেছে।

সজনীকান্ত এই কবিগোষ্ঠীরই অন্যতম কবি। প্রকাশিতব্য তৃতীয় খণ্ড 'আত্মস্মৃতি'র পঞ্চম তরঙ্গে [শনিবারের চিঠি ১৩৬২ সালের সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য] সজনীকান্তের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গেই উদ্ধারযোগ্য ; এখানে তিনি রবীন্দ্রানুসারিতার নিঃসংশয় স্বীকৃতি জানিয়েছেনঃ "সত্য কথা বলিতে গেলে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙালী কবিদের প্রায় সকলেই আমরা যেন মূল গায়েন রবীন্দ্রনাথের দোহাকি করিয়াই সার্থক হইয়াছি ; দুই চারিজন একটু দূরে সরিয়া বেসুরা গাহিবার চেষ্টা করিয়াছি বটে, কিন্তু শেষাশেষি ওই রবীন্দ্র-রূপ-সাগরেই ডুব দিতে হইয়াছে, আন্-ঘাটে তরী বাঁধা আর হয় নাই।" এর প্রমাণ সজনীকান্তের

কাব্যে তার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সানুরাগ স্বীকৃতি। আর এই স্বীকৃতিই নানা ভাবে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস, করুণানিধান, পরিমলকুমার, কিরণধন, সাবিত্রীপ্রসন্ন এমন কি যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুলের কাব্যে বিধৃত হয়েছে। এঁরা সবাই রবীন্দ্রকাব্যাদর্শে বিশ্বাসী, প্রকৃতিপ্রেমী, শান্তি-প্রত্যাশী, ঐতিহ্যানুসারী কবি। শেষোক্ত তিনজনের আপাত-রবীন্দ্রবিরোধিতা ও ঐতিহ্যচ্যুতি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণে পরিণত হয়েছে তা এঁদের কাব্য থেকে প্রমাণ করা যায়।

কবি সজনীকান্তের অদ্যাবধি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দশ ; রচনাকাল ঃ ১৯২৮ থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। সেগুলি হল ঃ 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' (১৯২৯), 'বঙ্গরণভূমে' (১৯৩১), 'মনোদর্পণ' (১৯৩১), 'অঙ্গুষ্ঠ' (১৯৩১), 'রাজহংস' (১৯৩৬), 'আলো-আঁধারি' (১৯৩৬), 'কেডস্ ও স্যাণ্ডাল' (১৯৪০), 'পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৪২), 'মানস-সরোবর (১৯৪২), 'ভাব ও ছন্দ' (১৯৫৩), 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' ও 'মাইকেল বধ কাব্যে'র একত্র প্রকাশ)। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সতের বৎসরে রচিত ও প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা কম নয় ; সেগুলির একত্র সংকলন এবং সমগ্র কবিতাবলীর একটি নির্বাচিত সংকলনের প্রকাশ আশু প্রয়োজন। ১৯২৮-১৯৫৯ ঃ এই ত্রিশ বৎসরের কবিতার একটি সামগ্রিক আলোচনার প্রয়াস এখানে করা হল।

॥ ২ ॥

সজনীকান্তের ত্রিশ বৎসরের কাব্যজীবন (১৯২৮-১৯৫৯) সংশয় বেদনা, আনন্দ নৈরাশ্য, দুঃখ সুখে পরিপূর্ণ। কাব্যের সমতলভূমিতে তিনি বিচরণ করেন নি। যৌবনের উদ্‌ভ্রান্তি ও আতিশয্যে তাঁর কাব্যের সূচনা। বর্তমানে তিনি যে পরিণতিতে উপনীত হয়েছেন তা প্রৌঢ়ির গম্ভীর জীবনধ্যানের শান্তিমণ্ডিত। কবি নিজেই বলেছেন: "সৌভাগ্যক্রমে কাব্যসরস্বতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, ছন্দের বন্ধনে অগোচর ও অধরা ক্ষণে ক্ষণে বাঁধা পড়িয়াছেন—মহাজীবন-জলতরঙ্গে আমার নগণ্য জীবনও ঢেউয়ের শীর্ষে উঠিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে।" (আত্মস্মৃতি, প্রথম খণ্ড)। সজনীকান্তের কাব্যের গভীর পর্যালোচনায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সজনীকান্তের কাব্য আলোচনায় দুটি সত্য আমাদের স্মরণ রাখতে হয়। তাঁর কাব্যজীবনে বারবার নৈরাশ্য, সংশয় ও বেদনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বারবারই সে আঁধার উত্তীর্ণ হবার জন্য কবির অন্তর্জীবনে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এখানেই সজনীকান্ত অন্যান্য রবীন্দ্রানুসারী কবিদের পথ থেকে দূরে সরে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কুমুদরঞ্জন করুণানিধান কালিদাস প্রমুখ কবিদের কাব্যজীবনে কখনও সংকট দেখা দেয় নি, সজনীকান্তের কাব্যজীবনে বারবার সংকট দেখা দিয়েছে। মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথের মত তিনিও সেই সংকটের

আবর্তে পড়ে হাহাকার করেছেন, সংকটমুক্তির জন্য প্রাণ পণ করেছেন। এখানেই কবি সজনীকান্তের আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ কবির জীবনে প্রকৃতির প্রভাব—আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, নদীর প্রভাব। সাম্প্রতিক বাঙালী কবিদের জীবনে গ্রামপ্রকৃতি বা নদীর প্রভাব নেই বললেই হয়। আধুনিক কবিরা নগরকেন্দ্রিক জীবনের কবি; যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর হতাশা ও বেদনা, রিক্তবিশ্বাস ও ধর্মচ্যুত নগরজীবনের পরিবেশে তাঁদের কবিকণ্ঠে গান উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কয়েকজন কবি বিরল ব্যতিক্রম সজনীকান্তের কবিজীবনে নদীর ও গ্রামের প্রভাব সুমুদ্রিত হয়ে আছে। এখানেই তিনি রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজেরই একজন। তিনি স্বীকার করেছেন, "কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর সঙ্গে আমার মনের ক্রম-পরিণতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে।" আরও বলেছেন, "এই নদী, তটভূমি ও বালুবেলাগুলি আমার অন্তর্জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।" (আত্মস্মৃতি, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এই নদীগুলি হলঃ বীরভূম-বর্ধমানের অজয়, মালদহের মহানন্দা, বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, পাবনার পদ্মা, দিনাজপুরের কাঞ্চন। কবির বাল্য কৈশোর কৌমার ও প্রথম যৌবন এই নদীগুলির সাহচর্যে ও সান্নিধ্যে কাটে এবং তাদের প্রভাব তাঁর অন্তর্জীবনে মুদ্রিত হয়ে গেছে। কবির জন্ম বর্ধমানের বুদবুদ থানার বেতালবন গ্রামে, ৯ই ভাদ্র, ১৩০৭ বঙ্গাব্দে, ২৫শে আগস্ট ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে।

জীবনের প্রথম কুড়িটি বৎসর কলকাতা থেকে দূরে মফস্বলে নদীর সান্নিধ্যে কবি কাটিয়েছেন। গণিতশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ নিয়ে কবি বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তিনি বিজ্ঞানেরই ছাত্র ছিলেন। ফলে তাঁর রচনায় দেখা দিয়েছে যুক্তি ও নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য, বাস্তবপ্রীতি। আবার শৈশবে মালদহের গম্ভীরা গানের পরিবেশে এবং কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'সরল কৃত্তিবাস', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এবং রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' ও 'কথা ও কাহিনী'র কাব্য-বাতাবরণে তাঁর মনোজীবন গঠিত হয়। এই গণিতপ্রীতি ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন, এবং কাব্যপ্রীতি ও নদীসাহচর্য সজনীকান্তের কবিজীবনকে যুগপৎ বাস্তবানুরাগী ও রোমান্টিক নিসর্গপ্রেমী করে তুলেছিল। বাস্তবানুরাগের ফল ব্যঙ্গকবিতা, রোমান্টিক কাব্য ও নিসর্গ-সাহচর্যের ফল কবিতায় অমৃতের জন্য হাহাকার। সজনীকান্তের কাব্যজীবনে এ দুই-ই সত্য। শৈশবের আর একটি প্রভাব মহৎ চরিত্রের সাহচর্যের ফলে দেখা দিয়েছে; তা হল জীবনে নীতির মূল্য স্বীকার। এর মূলে আছেন দিনাজপুরে (১৯১৪-১৮) ঋষিপ্রতিম চিকিৎসক মহর্ষি ভুবনমোহন করের অসাধারণ চরিত্র।

কবির সাহিত্যজীবনে বাঁকুড়ার কলেজ হস্টেল (১৯১৮-২০) ও কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের অগিল্‌ভি হস্টেলের (১৯২০-২১) স্থান আছে। প্রথমটিতে কলমনবিসী, দ্বিতীয়টিতে সিদ্ধিপ্রাপ্তি। এরই মাঝে যৌবনের প্রথম লগ্নে রবীন্দ্রনাথের

'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্রে'র এবং কাঞ্চন নদীর সাহচর্যে যাপিত কয়েকটি মাস (১৯২০)। এখানেই তাঁর প্রথম সিরিয়স্ কাব্যচর্চার প্রয়াস লক্ষ্য করি। সে কবিতাটির নাম 'বকুলবনের পথে'—প্রথম যৌবনের উদ্‌ভ্রান্তি, আতিশয্য ও উচ্ছ্বাসে জড়িত এই কবিতাটির কাব্যমূল্য খুব বেশী নয়, কবির নিভৃত হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষা এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। এর কয়েকটি চরণ কবি 'আত্মস্মৃতি'র প্রথম খণ্ডে উদ্ধার করেছেন। এটি আদিরসাশ্রিত যৌবনবন্দনা—আতিশয্যে ভারাক্রান্ত; কবিতা হিসেবে নীচু দরের ঃ

> কলস কাঁখে বকুল বীথির পথে
> বধূ যেথায় আনতে চলে জল,
> সাঁঝের কোলে রয় না কেহ সেথা,
> আঁধার বিজন বকুল গাছের তল!

এই ব্যর্থতা পরবর্তী সফলতার বিচারে মার্জনীয়। অগিল্‌ভি হস্টেল-পত্রিকায় সেপ্টেম্বর ১৯২১-এ প্রকাশিত পাঁচটি কবিতাই তাঁর কাব্যজীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। সুখের বিষয়, এখানে তিনি পূর্বের উদ্‌ভ্রান্তি ও আতিশয্য থেকে মুক্তিলাভ করে আত্মস্থ হয়েছেন। এই পাঁচটির দুটি হল 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'গান্ধী'। এখানেই তিনি জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র সেদিন শ্রেষ্ঠ বাণীসাধকের চরণে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তা যে কেবল ভক্তি-উচ্ছ্বাস নয়, পরবর্তী

জীবনের ইঙ্গিতবাহী, সে-কারণেই এর গুরুত্ব। 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় সজনীকান্ত সেদিন এই কথাই বলেছিলেন :

ওগো আঁধারের রবি
ওগো মরতের কবি,
স্বরগে মরতে ঘটালে মিলন
দেবতার কৃপা লভি।
আকাশে মাটিতে তৃণে ফুলে ফলে
প্রতি গৃহকোণে প্রতি হৃদিতলে
চিরবিচিত্র যে সুর উথলে
আঁকিছ তাহারি ছবি।

কবি সজনীকান্ত সেদিন ধরণীর বিচিত্র ছবির শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পন্থা গ্রহণ করলেন—তাঁর ভবিষ্য জীবনপথ নির্ধারিত হয়ে গেল। এর পরই সজনীকান্ত বিজ্ঞানের মায়া কাটিয়ে অনিশ্চিত সাহিত্যজীবনে ঝাঁপ দিলেন।

॥ ৩ ॥

সজনীকান্তের ত্রিশ বৎসরের কাব্যজীবনে চারটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্ব : 'পথ চলতে ঘাসের ফুল', 'বঙ্গরণভূমে', 'মনোদর্পণ', 'অঙ্গুষ্ঠ' : ব্যঙ্গ কবিতার পর্ব (১৯২৮-৩১)। দ্বিতীয় পর্ব 'রাজহংস', 'আলো-আঁধারি' : আত্মরূপ চিত্রণের পর্ব (১৯৩২-৪০)। পূর্ববর্তী পর্বের জের 'মাইকেলবধ কাব্য' এবং 'কেডস্ ও স্যাণ্ডাল' (হাসির কবিতা সংকলন) এই পর্বে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় পর্ব : 'পঁচিশে বৈশাখ', 'মানস-

সরোবর' ঃ রবীন্দ্রাশ্রয়িতার পর্ব (১৯৪১-৪২)। চতুর্থ পর্ব ঃ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলী ঃ আত্মরূপ বিশ্লেষণের পর্ব (১৯৪৩-৫৯)।

প্রথম পর্বে সজনীকান্ত 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'তে অজস্র ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেছেন, 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের তারুণ্যকে উপহাস করে কবিতা রচনা করেছেন এবং নিজের পথাবিষ্কারে রত ছিলেন। এই পর্বে দেখা যায়, কবিত্ব উৎসারের জন্য কোন বহির্ঘটনার প্রয়োজন ঘটেছে। আক্রমণ প্রতিবাদ আঘাতের উপলক্ষ্য যখনই দেখা গেছে, তখনই সময়ের দাবি মেটাতে কবি অগ্রসর হয়েছেন। মানবসমাজের নানা বিচিত্র প্রেমচিত্র 'পথ চলতে ঘাসের ফুলে' অঙ্কিত হয়েছে। একটি নমুনা এখানে দেওয়া যেতে পারে ঃ

আজ রাতে চাঁদ সই উঠ্‌ল বনের ফাঁকে
ধবধবে পথঘাট জোছনায়…
তুমি এস বনপথে ছোঁয়াও সোনার কাঠি ঝুরু ঝুরু বয়ে
যাক্ ঝরণা,
ডাক্‌ছে পাহাড় বন ডাক্‌ছে এ দেহ-মন, ফেলে দিয়ে এস
ঘর-করণা।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গরণভূমে' জাতীয়তামূলক ব্যঙ্গকবিতার সংকলন। এ-সকল কবিতার উপলক্ষ্য সাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা। এগুলি উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করে স্থায়ী আবেদনের স্তরে উন্নীত হতে পারে নি। ব্যঙ্গক্ষেত্রে সজনীকান্তের

কবিপ্রতিভার অনুকূল বিকাশ হয়েছে। তবু এরই মাঝে কয়েকটি দেশাত্মবোধক কবিতার দেখা পাই যেগুলির স্থায়ী আবেদন আছে। 'বঙ্গরণভূমে' কাব্যের 'এ মৃত্যু ছেদিতে হবে', 'শ্মশানে', 'যুগবাণী', 'তুর্দিন' প্রমুখ কবিতা দেশাত্মবোধের মহৎ প্রেরণায় রচিত। ১৯২৪-৩০ সনের বাংলাদেশে সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, সাবিত্রীপ্রসন্নের দেশপ্রেমের কবিতার সঙ্গে এই কবিতাগুলি তুলনীয়। দেশপ্রেমকে যে জ্বলন্ত প্রেরণা ও তীব্র অনুভূতির আগুনে গলিয়ে কাব্য-উপাদানে পরিণত করা হয় এবং যে কাব্য-প্রসাধনকৌশলে হৃদয়ে আসন পায়, তা কবি সজনীকান্তের করায়ত্ত ছিল, তার পরিচয়স্থল এই শ্রেণীর কবিতা। ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাত নয়, মহত্তর প্রেরণার সুরে কাব্যবীণার তার বেঁধে নেবার ক্ষমতা যে তাঁর আছে, সে পরিচয় সজনীকান্ত এখানেই দিলেন। যখন তিনি আহ্বান জানালেন ঃ

> তুমি আমি কারাগারে দেখিতেছি মৃত্যু-বিভীষিকা,
> কে মুছিবে এ জাতির ললাটের কলঙ্কের লিখা !···
> বিবাদের বাণী নহে, জাতি মুক্তিবাণী আজ চাহি,
> বিকৃত জীবন নহে, চাহি সত্যের মৃত্যুর সাধনা ;
> ছুটেছে নিখিল বিশ্ব নূতন আলোকে অবগাহি,
> কারাগারে রুদ্ধ হয়ে করি কি আত্ম-আরাধনা ?
> ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হবে এ পাষাণ কারার প্রাচীর—
> বাহিরে খুঁড়িছে মাথা মুক্তির আলোক সুবিপুল,

কাঁদিতেছে অন্ধকারে ভারতের বাণী সুগভীর—
কারাগার ব্যবধান, মিলাইতে হবে দুই কূল।
এ মিলন-সাধনায় প্রচারিতে নব যুগবাণী—
আমাদের যাত্রা সুরু, যাত্রা শেষ কবে নাহি জানি।
(যুগবাণী, 'বঙ্গরণভূমে')

তখন পাঠক কবিকণ্ঠে সুর মিলাতে দ্বিধা বোধ করেন না।

এর আগে ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী' ও 'নব্যভারত' পত্রিকায় সিরিয়স্ কবিতা লিখে সজনীকান্ত খ্যাতিলাভ করেছেন। এ সময়ে রচিত কবিতাগুচ্ছের একটি কবিতা বিশেষ উল্লেখ দাবি করে। 'প্রবাসী'র ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'অগ্নিদূত' কবিতাটি ('আলো-আঁধারি' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত) সজনীকান্তের সিরিয়স্ কবিতা রচনার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে' এটিকে স্থান দিয়েছিলেন। এই পর্বে কবি সজনীকান্ত একবার হালকা চটুল কবিতা, একবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা, আবার সিরিয়স আত্মবিশ্লেষণধর্মী কবিতা রচনা করেছেন। কবি এ পর্বে আত্মস্থ হন নি ; পথের অনুসন্ধান চলেছে ; হতাশা ও ব্যর্থতার বেদনা কখনও বা কবিকে গ্রাস করছে, কখনও বা কবি তা থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছেন। এর সুন্দর পরিচয় পাই 'অসহায়' ('আলো-আঁধারি') কবিতাটিতে। অমৃতসন্ধানপথে হলাহলের অঞ্জলি কবি হাত পেতে নিয়েছেন, আবার নতুন পথে চলেছেন। মানবজীবনের

বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতার মাঝেই কবি অমৃতসন্ধান করেছেন' এই বলে :

বাসনা-বহ্নি জ্বলুক জ্বলিতে দাও,
দেহ-অঙ্গার পাবক-পরশকামী,
মৃতার বক্ষে কেহ না বসন টানে
শবের ললাটে সাজে না খয়েরী টিপ!
জীবনে বাঁচিবে, তবু করিবে না ভুল,
কে তুমি পাষাণ, কে তুমি অহঙ্কারী?
চিরকাল যারে চলিতে হইবে পথে
বিপথে যাবে না, তাও সম্ভব কভু!

'অঙ্গুষ্ঠ' ও 'মনোদর্পণ' কাব্যে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পথানুসন্ধান-বিভ্রান্তি ও কবি-মনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যঙ্গকবিতায় কবিপ্রাণ যে তৃপ্তিলাভ করছে না তার প্রমাণ বারেবারেই পাওয়া যায় এই পর্বে

কল্লোল-কালিকলম-গোষ্ঠীর তারুণ্যকে ব্যঙ্গ করে কবি যখন লিখছেন :

ও পাড়ার ওই পটলির মুখে পাণ্ডু-পাটল হাসি
ফাটা ফুসফুসে আমি আর হুতো চোপসান-কাশি কাশি।

তখনই অন্যদিকে কবিকণ্ঠে শুনি অমৃতের হাহাকার :

যোগী নীলকণ্ঠ সম মহোল্লাসে করি আত্মসাৎ বিশ্বহলাহল
আমার বক্ষের মাঝে নবজন্ম লভে অকস্মাৎ শুষ্ক তৃণদল।
(স্বপ্ন-সহচরী, 'আলো-আঁধারি')

পরবর্তী পর্ব এই নবজন্মের কাহিনী।

প্রথম পর্বের শেষ ভাগে কবির জীবনে নিষ্ঠুর মৃত্যুর আঘাত এসে পড়ল। জননীর মৃত্যুতে কবিচেতনা বিবশ হয়ে গেল; এ আঘাত থেকে কবি মুক্তি পেতে চাইলেন ব্যঙ্গকবিতায়। কেবল 'অঙ্গুষ্ঠ' ও 'মনোদর্পণে'র কবিতাগুলি নয়, 'কেডস্ ও স্যাণ্ডালে'র ব্যঙ্গকবিতাগুলিও এই মানসিক পটভূমিতে রচিত। নিদারুণ দুঃখাঘাতে বা দুঃসময়ে কবি ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেছেন। একদিকে পিতৃআশ্রয় ত্যাগের ফলে অন্নচিন্তা, অপরদিকে জননীর মৃত্যুজনিত শোকাঘাতে মনের অস্থিরতা—এই অন্তর ও বহির্জীবনের বিচলিত অবস্থাতেই কবি ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেন। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, "অত্যন্ত দুঃসময়ে প্রায় আত্মঘাতী মুহূর্তে ব্যঙ্গ-খাতেই আমার চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়। মায়ের প্রায় মৃত্যুশয্যায় বসিয়া 'হসন্ত তরফদারে'র প্রথম খসড়া ফাঁদিয়াছিলাম, আজ ৭ই অক্টোবরে 'অন্নচিন্তার চেয়ে বড়' যখন কিছুই নহে, তখন 'বিবাহের চেয়ে বড়' লিখিলাম। কিন্তু হাসি দীর্ঘস্থায়ী হইল না, অপরূপ 'মৃত্যু-মাধুরী' সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্ত অধিকার করিল।" (আত্মস্মৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ ১৫৬)।

১৯২৪-এ পিতৃআশ্রয় ত্যাগ করে এসে কবি লিখলেন বিখ্যাত 'ব্যাঙ্' কবিতা নজরুলকে ব্যঙ্গ করে, ১৯২৬-এ দিনাজপুরে মায়ের নিদারুণ রোগশয্যার বসে 'হসন্ত তরফদারে'র খসড়া রচনা করলেন আর ১৯৩১-এর উপরোক্ত ৭ই অক্টোবরে

'প্রবাসী'-প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ-পদে ইস্তফা দিয়ে লিখলেন নির্দোষ বাঙ্গের কবিতা 'বিবাহের চেয়ে বড়' ('কেডস্ ও স্যাণ্ডাল' কাব্য)।

বোধকরি রূঢ় বাস্তবের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাস্তব থেকেই কবি প্রেরণা পেয়ে লিখলেন :

একা বসে জলভরা নদীতীরে
কেন ভাসি নয়নের নীরে,
কেন এ অভাগা সন্ধ্যা গোঙাল
চেয়ে চেয়ে অনিমিখ

আধ পর্দায় ঘেরা বাতায়নে
যেথা বসে পুঁটি কড়াকিয়া গনে,
তারি অবসরে ডাঁশা পেয়ারায়
কষিয়া বসায় দাঁত।

পুঁটি কে, জান না ? বোসেদের খুকী,
মাখম-কোমল, প্রস্তর-বুকী—
ভিতরে তাহার শয়তান হায়
আমারই ভেঙেছে আঁত।...

আমারে দেখিলে হয়ে চঞ্চলা
পুঁটি হেঁকে পড়ে, 'প'য়েতে 'র'-ফলা,
'এ'-কার তাহাতে, পিছনে 'ম' যোগ
করিলে কি হয় কহ।

শুনিয়া যদিবা প্রেম-ইশারায়
জানাইতে তারে কিছু প্রাণ চায়,
পুঁটি না তাকায় ; হেন দুর-ভোগ
ক্রমে হয় দুঃসহ।
(বিবাহের চেয়ে বড়ো, 'কেডস্ ও স্যাণ্ডাল')

রোমান্টিক প্রেমের এই তরল ব্যঙ্গকবিতা রচনার পরমুহূর্তেই কবিকণ্ঠে জেগে ওঠে হাহাকার :

উঠ হিমাদ্রি-প্রায়,
দুঃখসিন্ধু হের গরজিছে
ব্যথাবেদনার লোনাজল উথলায়।
ক্রুর নিপীড়নে কম্পিত আজি
ক্ষুব্ধ সাগর-তল,
ধাতব পৃথ্বী বাষ্প-বিকারে
মথিছে সিন্ধু জল।...
বিষ্ণুচক্রে হের বরাভয়,
বিদরে অন্ধকার,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মাধুরী
নেহারো চমৎকার!
(মৃত্যু-মাধুরী, 'আলো আঁধারি')

সমকালে রচিত কবিতার মধ্যে এই মেরু-প্রমাণ ব্যবধান কবিমানসের অস্থিরতা, বিপরীত প্রতিক্রিয়া ও অপ্রত্যাশিত অনুভূতির পরিচয়স্থল। শোক ও হাসি, মৃত্যু ও জীবনচাঞ্চল্য, বেদনা ও আনন্দের টানাপোড়েনে কবিমানসের যে বিচিত্র

আলো-আঁধারের ধূপছায়া-পটভূমি রচিত হয়েছে প্রথম পর্বের শেষভাগে, তা দ্বিতীয় পর্বে এসে একটি নিশ্চিত প্রত্যয়ভূমিতে অধিষ্ঠিত হল 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায়; এখানেই সজনীকান্তের কবিমানস আত্মস্থ হল।

॥ ৪ ॥

প্রথম পর্বে কবিমানসের যে অস্থিরতা ও সংশয়, তার সমাধান হল দ্বিতীয় পর্বের 'রাজহংস' কাব্যের প্রথম কবিতা 'রবীন্দ্রনাথ'-এ। কবিতাটি 'রাজহংস' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়, ও 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বর্জন ঠিক হয় নি এই জন্য যে কবিমানসের শান্তি ও প্রত্যয়ের অধিষ্ঠানভূমি এই কবিতাটি। তাই এর আলোচনা দ্বিতীয় পর্বের সূচনাতেই করণীয়।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর-পূর্তিতে দেশব্যাপী যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী সমারোহে অনুষ্ঠিত হল ১৯৩১-এর শেষে, সে-উপলক্ষ্যে 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি রচিত। অগিল্‌ভি-হস্টেল-পত্রিকায় কবির যে রবি-প্রণাম, তা থেকে কবি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর ১৯২১ আর ডিসেম্বর ১৯৩১—ঠিক দশ বৎসরের ব্যবধান। এই সময়ে কবি অভিজ্ঞতার বিচিত্র জগৎ পরিভ্রমণান্তে সেই রবি-তীর্থেই ফিরে এলেন। এই প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সজনীকান্ত যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের কবি নন, তিনি যে প্রত্যয়সিদ্ধ রবীন্দ্রানুসারী কবি,

তাঁর প্রমাণ এই প্রত্যাবর্তন। দুঃখ শোক ব্যঙ্গ আঘাত সংশয় ও বেদনার মূল্যে ক্রীত এই প্রত্যাবর্তন। তাই সজনীকান্তের কাব্যসাধনার মহত্তর পর্যায়ের সূচনা এই কবিতাতেই হল। এই পর্বটিকে সাধারণভাবে আত্মরূপচিত্রণের পর্ব বলে অভিহিত করতে পারি। ব্যঙ্গের পালা শেষ হল। ১৩৩৯ অগ্রহায়ণে (১৯৩২ খ্রী) 'বঙ্গশ্রী'তে যোগদান—এর মাঝে চোদ্দ মাস আত্মঘাতী 'শনিবারের চিঠি'তে বেপরোয়া ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার আক্রমণের শ্মশান-সাধনা-অন্তে কবি আত্মস্থ হলেন। ব্যঙ্গ-কবিতা ছেড়ে "টুকরি" কবিতা রচনা শুরু করলেন। কেবল বিষয় নয়, সুরেরও পরিবর্তন হল। এ-সবেরই সূচনা হল ওই 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটিতে।

এই কবিতায় কবির কাছে রবীন্দ্র-প্রতিভা হিমালয় রূপে প্রতিভাত হয়েছে এবং হিমালয়ের চিত্রাঙ্কনেই কবি জীবনের সার্থকতা লাভ করেছেন :

হিমালয়
তুমি হিমে ঢাকা থাক, নদীরে করো না হিম।
আমার কুটির.আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সবজি ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাক, নাহি থাক—
হিসাব তাহার আমি তো রাখিব নাকো ;
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও নদীজলে—
কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিকথা তার যে পারে রাখুক লিখে।

নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।
(মাঘ, ১৩৩৮)

রবীন্দ্র-উৎসসন্ধানে সজনীকান্ত যাত্রা করেন নি, ররীন্দ্রকাব্য-প্রবাহে ডুব দিয়েই তিনি অমৃতের আস্বাদ পেতে চেয়েছেন। এ-সময়ের লেখা আর একটি রবি-বন্দনা 'শ্রীচরণেষু' (আষাঢ় ১৩৩৬) কবিতায় সজনীকান্ত প্রণতি জানিয়েছেন এই কথা বলে ঃ

আসিয়াছ এ ধরায়—ললাটে স্বর্গের দ্যুতি,
তুমি কেহ নহ মৃত্তিকার।
উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বলোকে আপনার সঙ্গীতে বিহ্বল—
একেলা ছুটিয়া চল, ধূলি-পঙ্ক-ম্লান ধরাতল।

রবীন্দ্র-বন্দনায় কবি সজনীকান্তের নবজন্ম হল। দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হল 'রাজহংস' কাব্যে। এই কাব্য মাতৃনামে উৎসর্গীকৃত। মায়ের রোগশয্যায় বসে ব্যঙ্গকাহিনীর খসড়া রচনা করে কবি আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিলেন। শোকের প্রথম আঘাত উত্তীর্ণ হবার পর আজ তিনি মৃত্যুর মহত্তর রূপটিকে দেখেছেন। একদিকে রবি-প্রণতি, অপরদিকে মাতৃবন্দনা—এই দুই মহৎ আকর্ষণের ফলে কবি ব্যঙ্গবিদ্রূপের সমতলভূমি ছেড়ে কাব্যের নিশ্চিত প্রত্যয়ের উপত্যকাভূমিতে উপনীত হলেন। 'রাজহংসে'র উৎসর্গ-পত্র তারই পরিচায়ক। জীবন ও মৃত্যুর যে রহস্যের সন্ধান কবিরা বারবার করেছেন,

তার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা সজনীকান্তের কবিমানসকেও আলোড়িত করেছে, তার প্রথম পরিচয় এখানেই পাই। উৎসর্গপত্রের বিষণ্ণ গম্ভীর জীবনজিজ্ঞাসার আন্তরিকতা তাই পাঠকমনকে অভিভূত করে :

যে চপল নদী পার হয়ে এল গিরি-বন-প্রান্তর,
কখনো আলোকে, কখনো অন্ধকারে,
থমকি দাঁড়ায়ে সহসা সে যদি চাহিত পিছন ফিরে,
হিমালয়-শিরে পেত কি দেখিতে কোথায় উৎস তার ?
এ পারে-ও পারে ব্যবধান-ছেঁড়া গোমুখীর গূঢ় ব্যথা
বুঝিত কি নদী নদীজল-কলকলে ?

এই প্রশ্নের সমাধান সহজেই ঘটে নি। জননী-নাম-বন্দনায় কবি আশ্রয় খুঁজেছেন :

জননী, তোমারে স্মরিয়া আমার কাব্যের দীপশিখা,
জ্বালাইয়া রাখি অবোধ অন্ধকারে,
দেখিতে না পাই, বুঝি অনুভবে, তুমি আছ কাছে কাছে ;
নিজে এস মাতা, লহ মোর দীপারতি।

জীবন-মৃত্যুর 'অবোধ অন্ধকারে' কবির যাত্রা শুরু হল। 'রাজহংসে'র সূচনা মাতৃনামের উৎসর্গে, শেষ সহধর্মিণী-বন্দনায়। মাঝে চারিটি ভাগ : 'হিমালয়', 'নির্ঝরিণী', 'অরণ্য-প্রান্তর' ও 'আকাশ-সাগর'। আগেই বলেছি, এই দ্বিতীয় পর্ব আত্মরূপচিত্রণের পর্ব। 'রাজহংস' কাব্য তার সার্থক পরিচয়স্থল। এই কাব্যের কয়েকটি কবিতা বাংলা কাব্য-সংসারে স্থায়ী

আসন লাভের যোগ্য। 'কালকূট', 'দুই মেরু', 'তিমির-তীর্থ', 'পান্থ-পাদপ', 'তমসা-জাহ্নবী', 'সরস্বতী', 'চিরজয়ী', 'আকাশ-সাগর' : এই আটটি কবিতা সজনীকান্তের কবিমানসের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে অবশ্য-আলোচ্য।

'কালকূট' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট'-কাব্য-রচনার অব্যবহিত পূর্বে লিখিত, 'পত্রপুটে'র ১৩-সংখ্যক কবিতার সঙ্গে এর ভাবের সমধর্মিতা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছেন ওই কাব্যের এবং এর 'মর্দানা আওয়াজ' ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সপ্রশংস মন্তব্যে ভূষিত হয়েছে। অসম ও অমিল পদ্যছন্দে সজনীকান্ত 'কালকূট' কবিতায় যে পারুষ্যবীর্য গাম্ভীর্যের ধ্বনিরোল এনেছেন, তা কেবল ছন্দের অভিনবত্বে নয়, ভাবের মৌলিকতা ও সাহসে দীপ্যমান। মৃত্যু-মাঝে জীবনের নির্ভর বন্দনাগানের যে দীপ্র কবিকণ্ঠ এখানে ধ্বনিত হয়েছে, তা স্মরণযোগ্য :

দূর কর মোর মোহ-আবরণ,
বৈশাখের উন্মাদ বাতাসে
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক যুগান্তের কালো মায়াজাল,
হাসুক শ্যামল কিশলয়।

যে জীবন যুগে যুগে মৃত্যুরে করিল উপহাস,
মৃত্যুরে করিল নমস্কার—
করিল না ভয়—
শ্মশানের ভস্মস্তূপে সে জীবন খুঁজিছে আলোক,

মাটি ফুঁড়ি উঠিবে আকাশে—
মৃত্যুর বন্দনা-গানে
সে জীবনে বারবার জানাই প্রণতি।
মৃত্যুরে করিতে জয়, নির্ভয়ে করিতে হবে পান
জীবনের সেই কালকূট।

আত্মরূপচিত্রের পরিচয় পাই 'তুই মেরু' কবিতায়। জীবনের আলো ও আঁধারের বিপরীত আকর্ষণে দোলায়িত কবিমানসের অপরূপ কাব্যচিত্র এই কবিতা। মনের উত্তর-মেরুতে 'ছায়াহীন আলো', 'মৃত্যুহীন গাঢ় শীতলতা', দক্ষিণ-মেরুতে 'বারিধি গর্জন, রৌদ্রকরে নীল জল উঠে ঝলকিয়া'। দক্ষিণ-মেরুতে জীবনের জীবনের কাকলি, যৌবনের গান, 'তপ্ত ভোগ তপ্ত কান্নাহাসি', উত্তর-মেরুতে বার্ধক্য-মৃত্যুর করাল ছায়া পূতিগন্ধে আকাশ ভরপুর, জীবনের 'বীভৎস বিকৃতি'। দক্ষিণ-মেরুতে কবি সবার, উত্তরে একাকী। এ তুয়ের আকর্ষণে কবিমন আজ ক্লান্ত, মেলে না সমাধান ঃ

দক্ষিণেরে ভালবাসি, উত্তর আমারে করে প্রেম,
সমাধি-শয়ন রচি মোর লাগি সে জাগে প্রহর,
দক্ষিণে আঁকড়ি লোভে আমিও অনন্তকাল ধরি
রচি উত্তরের ব্যবধান।
জানি না, মৃত্যুর অন্ধকারে
উত্তর দক্ষিণ মোর মিশে গিয়ে এক হবে কি না,
হয়তো প্রতীক্ষা তার করি।

যৌবনের তপ্ত ভালবাসা ও জীবনের মৃত্যুহীন গাঢ় শীতলতা,

দক্ষিণ ও উত্তর মেরু—এ দুয়ের মধ্যে কাম্য কে, সে প্রশ্নের স্পষ্ট সমাধান এখানে পাই না। তবে 'পান্থ-পাদপ' কবিতাটিতে কবি তাঁর সত্য পরিচয় প্রকাশ করেছেন—জীবনের ঘাটে ঘাটে নানা পরিচয়ের ফুল কুড়িয়ে যে মালা গেঁথেছেন, তাকে অবহেলে ত্যাগ করে চলে গেছেন নবতর পরিচয়ের আশায়। 'অজয়' উপন্যাসের নায়িকারাই এই কবিতার পান্থপাদপ। কবি নিরুদ্দেশের পথিক, সংসারে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ তাঁর যাত্রা ভুলিয়েছে, কিন্তু তাঁর গতি ক্ষান্ত হয় নি। নম্র নিবেদনে কবির সত্য পরিচয়টি প্রকাশ পেয়েছে ঃ

> চির-পথিকের অজানা যাত্রা পথে
> তোমরা, হে সখী, ছায়া-সুশীতল পাদপ হইতে পার,
> আঁধার মাটিতে শিকড় গাড়িয়া আছ।
> আমার জীবনে শুধু
> তোমা সবাকার খণ্ড খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।
> এর বেশী কিছু নহে,
> আমি তোমাদের নহি—
> চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।

কবিজীবনের সত্য পরিচয়টি এখানেই বিধৃত হয়েছে ঃ 'চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।' কবি নিজেই বলেছেন তাঁর 'আত্মস্মৃতি'র তৃতীয় খণ্ডে এই পর্বটি—বিশেষ ভাবে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দটি 'আত্মস্থ হইবার বৎসর।' ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, কাব্যগত জীবনেও তেমনই কবি আত্মস্থ হয়েছেন।

'তমসা-জাহ্নবীতে' কবির জীবনে নদীর গূঢ় প্রভাবটির পরিচয় বিধৃত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের গোড়ায় বলেছি, অজয়, মহানন্দা, দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, পদ্মা, কাঞ্চন প্রমুখ নদী কবির বাল্য কৈশোর কৌমার যৌবনকে এবং অন্তর্জীবনকে প্রভাবিত করেছে। আজ মধ্য-যৌবনে ভাগীরথীতীরে উপনীত হয়ে কবি নদী-ঋণ স্বীকার করেছেন এবং জাহ্নবী-তীরে জীবনমৃত্যুরহস্যের আবরণ উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। এই ব্যাকুল আত্মজিজ্ঞাসার গভীরতা ও তীব্রতা এই পর্বের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আলোক ও তমসার বিপরীত কোটির আকর্ষণে কবিচিত্ত দোলায়িত হয়েছে, 'তমসা-জাহ্নবী' তারই কাব্য-পরিচয়।

'রাজহংস' কাব্যের শেষ দুটি কবিতা 'চিরজয়ী' ও 'আকাশ-সাগর' সহধর্মিণী-বন্দনা। ঠিক তার আগের কবিতাটি 'সরস্বতী'। জীবনসাধনার দিক দিয়ে 'আকাশ-সাগর' এই কাব্যের শেষ কবিতা, কিন্তু কাব্য-সাধনার দিক দিয়ে 'সরস্বতী' 'রাজহংসে'র শেষ কবিতা। 'আকাশ-সাগর' কবিতায় শ্রান্ত জীবনপথিকের নম্র নিবেদন :

> অবশেষে দেবী, তোমারই চরণতলে
> শ্রদ্ধা-প্রেমের অর্ঘ্য আনিনু বহি ;
> বিপথে ঘুরিয়া তোমাতে আমার সমাপ্ত পথচলা।

'পান্থ-পাদপে'র বিচিত্র রমণীকুলের সাক্ষাৎ আর পাওয়া যাবে না, কবি-জায়া সুধা দেবীই এখন কাব্যসুধাসত্রের দেবী।

হিমালয়-চূড়া থেকে কবি নেমে এসেছেন সন্ধ্যায় গ্রামের পথে—সরোবরের বাঁধাঘাটে। আকাশ-সাগর, এখন সরোবর-তীরে বাঁধা পড়েছে, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীই এখন কবিজীবনের নিয়ন্ত্রী। তাই কবির বিনিঃশেষ আত্মসমর্পণ ঃ

সন্ধ্যা নামিল, স্নান শেষ কর দেবী,
তুলসীমঞ্চে জ্বালিতে হইবে দীপ—
আমি রব পিছে পিছে,
করজোড়ে শুধু রহিব দাঁড়ায়ে উঠানের এক ধারে।
প্রণাম সারিয়া উঠিবে যখন তুমি,
দেখিতে পাইবে, আমার আকাশে সারি সারি দীপ জ্বালা,
তোমার সাগরে যুগ যুগ ধরি কাঁপিবে তাহারি ছা।

দেবী ভারতীর অন্বেষণও শেষ পর্যন্ত গৃহাঙ্গনে এসে সমাপ্ত হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে কোথাও দেবীকে কবি পেলেন না, তখন ঃ

ক্লান্ত দেহে ফিরিনু আমি দীর্ঘ পথ ধরি,
শান্ত মনে বসিনু এসে ঘরের বাতায়নে,
ঘুমায়ে পড়িলাম।
জাগিয়া আজ খুঁজিয়া পেনু হারানো আপনারে ;
আমার মন জুড়ে
বসিয়া আছে আমার সরস্বতী।

বাইরে নয়, অন্তরেই কমলাসনার প্রতিষ্ঠা। এই সত্যের উপলব্ধিতে 'রাজহংস' কাব্যের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় পর্বের শেষ কাব্য 'আলো-আঁধারি'। আত্মরূপ-

চিত্রণের সাধনা এখানে সম্পূর্ণ হয়েছে। 'রাজহংস' মাতৃনামে উৎসর্গীকৃত, এই কাব্যে 'আলো-আঁধারি' 'মৃত্যু-মাধুরী', 'জড়', 'অগ্নিদূত', 'অসহায়', 'আহ্বান', 'ভুল', 'ভ্রান্তি', 'নিয়তি', 'স্বপ্ন-সহচরী', 'ব্যর্থতা' 'মোহ-মুদ্গর' প্রভৃতি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের (১৯২৪-৩৬) নানা বিচিত্র কবিতা সংকলিত হয়েছে। তাই এগুলিকে 'রাজহংস' কাব্যের পরিণতি না বলে সমকাল ও পূর্বকালে বিচিত্র কাব্য-ভাবনার একত্র সমাহরণ বলাই উচিত। তবু একটি সূত্রে এগুলি গাঁথা আছে—জীবনমৃত্যুর রহস্যসন্ধানের ব্যাকুলতা, আত্মজিজ্ঞাসার তীব্রতা ও পথভ্রান্তির বেদনা এগুলিকে বিশেষ অর্থদান করেছে। ব্যঙ্গ হাসি ও চটুল কবিতার যে পর্ব কবি পিছনে ফেলে এসেছেন, সেখানে আর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নি। পরন্তু গভীর দর্শনচিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তার পরিচয়স্থল এই কাব্য। সমালোচক মোহিতলালের প্রশংসাধন্য এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সজনীকান্ত 'আত্মস্মৃতি'র তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় তরঙ্গে বলেছেন, "এত দিন ব্যঙ্গ হাস্য ও হালকা কবিতার কবি ছিলাম। এই দুই কাব্যে ['রাজহংস' ও 'আলো-আঁধারি'] প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক কবির স্তরে উত্তীর্ণ হইলাম ; কিন্তু সাধারণের দরবারে তাহাতে যে লাভ বিশেষ হইল তাহা মনে হয় না ; শনিবারের চিঠির 'সংবাদ-সাহিত্যে'র লেখক সজনীকান্তকে কবি সজনীকান্ত অতিক্রম করিতে পারিল না। আমার সাহিত্য জীবনের ইহাই সর্বাধিক ট্রাজেডি।" বর্তমান প্রবন্ধের সূচনায় সজনীকান্তের

কাব্যপাঠে এই বাধার প্রতি ইঙ্গিত করেছি। এ বাধা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারলেই পাঠকের পক্ষে কাব্যরস আস্বাদন করা সম্ভবপর হবে।

'আলো-আঁধারি' কাব্যে কয়েকটি সার্থক রোমান্টিক প্রেম-কবিতা আছে। 'ছবি', 'পরশমণি', 'স্মরণ', 'তুমি', 'জাগরণী', 'নিদালী', 'অকথিত,' 'বিচিত্রা,' 'বর্ষায়' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের যে উল্লাস ও আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে, তা স্মরণযোগ্য। ব্যঙ্গবিদ্রূপের কবি ও সম্পাদক সমালোচক সজনীকান্তের কথা মন থেকে মুছে ফেলে এই দাম্পত্য-রস ও রোমান্টিক প্রেমবিলাসের বর্ণসমৃদ্ধ দৃশ্যগুলি আমাদের উপভোগ করতে হয়। রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের একটি সামান্য লক্ষণ—রোমান্টিক প্রেমের বন্দনা। কিরণধন, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, পরিমলকুমার, কালিদাস, সতীশচন্দ্রের মত সজনীকান্তও কাব্য-বীণায় রোমান্টিক প্রেমের সূক্ষ্ম তারে ঝঙ্কার তুলেছিলেন, এই কবিতাগুলি তারই প্রমাণ। সজনীকান্তের কাব্যজীবনের তৃতীয় পর্বে উত্তীর্ণ হবার পূর্বলগ্নে এই সুমধুর প্রেমরসের সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা যাক—মৃত্যু-রহস্যকে দর্শনচিন্তায় নয়, প্রেমালসেই কবি পরাজিত করে বলেছেন ঃ

> বিজয়ী আমি, নহে এ পরাজয়!
> বাড়ুক বেলা, পড়ুক বেলা, করি না আর ভয়।
> নামে নামুক ম্লান গোধূলি-বেলা,
> দিনের পরে গগন 'পরে বসে রঙের মেলা।

গাহিবে গান, কাঁপিবে প্রাণ প্রদীপশিখা সম,
নিবিবে জানি, রশ্মি-শেষ তবুও মনোরম।
মিলনখানি মালার মত দোলে ভুবনময়,
আমার ঠোঁটে মিলালে ঠোঁট, মধুর পরাজয়!

[পরশমণি, 'আলো-আঁধারি']

॥ ৫ ॥

কবিজীবনের সূচনায় অগিল্‌ভি হস্টেল পত্রিকায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটিতে সজনীকান্ত তাঁর কাব্যজীবনের কোষ্ঠীপত্র রচনা করেছিলেন। তারপর যৌবনের উদ্‌ভ্রান্তি ও আতিশয্য, আত্মঘাতী ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও তিক্ততার পথ পেরিয়ে 'রাজহংস' কাব্যের "রবীন্দ্রনাথ" কবিতায় নবজন্ম লাভ করেছিলেন। এ-সবই পূর্বে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্র-সাধনার মহত্তর পরিণতি ঘটল তৃতীয় পর্বে—রবীন্দ্রাশ্রয়িতার পর্বে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯৩০-এ যে মনোমালিন্য ঘটেছিল ও যার ফলে সজনীকান্ত 'প্রবাসী' প্রেসের কর্মাধ্যক্ষপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন, সে বিচ্ছেদ দূরীভূত হয়ে কবির সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হয়েছিল ১৯৩৪-এর জুনে খড়দহে গঙ্গাতীরে রবীন্দ্রনাথের সাময়িক আবাসস্থলে। সেইদিনই সজনীকান্তের চোখে রবীন্দ্রনাথের নবপরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমি গঙ্গার সন্তান।" 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যের 'গাঙ্গেয়' কবিতার উৎস সেই স্বীকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে (৭ আগস্ট ১৯৪১) সজনীকান্তের

কবিজীবনে তৃতীয় পর্বের সূচনা হল। মহত্তম কবি-প্রতিভার চরণে নম্র প্রণতি নিবেদন করতে গিয়ে সজনীকান্ত তাঁর কাব্যজীবনে নোতুন পথ খুঁজে পেলেন। দ্বিতীয় পর্বের সমস্যা-সমাধান এক মুহূর্তে তুচ্ছ হয়ে গেল, নিদারুণ মৃত্যুঘাতে সজনীকান্তের কবিমানসে নবতর সংশয় উপস্থিত হল—'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে সে সংশয় ধ্বনিত হয়েছে ঃ

জীবনের মাঝে আনন্দ আছে বার্তা পেয়েছি তোমার কাছে,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত আছে কি, সেই সন্ধান দিবে কি তুমি ?…
বৃথা কবিতার বুনি জাল—
তোমার কাব্য পুঞ্জিত হয়ে পার হয়ে গেল তুহিন-রেখা !
সেখানে বরফ গলে না হায়,
কার আঁখিজল হিমালয় হল কেহ কি পেয়েছে
ঠিকানা তার ?…
গান যে আকাশে ভেসে বেড়ায়,
সুর হয়ে তুমি ধরার বাতাসে ছড়ায়ে গিয়েছ আপনাকেই।
প্রাণের আগুন নেবে যে হায়,
সুরের আগুন জ্বালে যেইজন মরণে তাহার কিসের ভয় !

মৃত্যূত্তীর্ণ সেই কবির বন্দনা রচিত হয়েছে 'গাঙ্গেয়' কবিতায় —'গাঙ্গেয়, তব অশীতিবর্ষে তোমায় প্রণাম করি।' 'বলাকা' কবিতায় নিখিল মানবের যে চিরন্তন প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে, সজনীকান্ত তারই সূত্র তুলে গঙ্গার সন্তান রবীন্দ্রনাথের নিখিল বিশ্বপরিক্রমার বিবরণ দিয়ে প্রণতি জানিয়ে বলেছেন ঃ

আজো সন্ধান মেলে নাই কবি, পাও নি জবাব কোন।
মূক প্রত্যাশা বধির আকাশ চেয়ে
খোঁজে উত্তর, মিলায় পক্ষধ্বনি—
অসীম আকাশে জগতের গতি নীরব অন্ধকারে।
গাঙ্গেয়, পুন গঙ্গোত্রীতে তোমার যাত্রা শুরু।

রবীন্দ্র-জীবনকে অবলম্বন করেই সজনীকান্ত বিশ্বরহস্য-সন্ধানে যাত্রা করে এক নবতর কাব্যপর্বে উপনীত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষপূর্তিতে সজনীকান্তের এই জিজ্ঞাসা পরবর্তী বাইশে শ্রাবণের নিদারুণ মৃত্যুঘাতে খণ্ডিত হল, কবিজীবনের ভারসাম্য বিচলিত হয়ে উঠল।

এরই প্রতিক্রিয়ায় আমরা পেলাম বিখ্যাত 'মর্ত হইতে বিদায়' কবিতাটি। সজনীকান্তের কাব্যভাবনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার উপর কতদূর নির্ভরশীল তার পরিচয় এখানেই পেলাম। সেইসঙ্গে মহৎ শোকের আঘাতে জাগ্রত কবিমনের একটি মহৎ প্রকাশরূপে এই কবিতাটির সূচনায় যে আর্ত হাহাকার, তা গভীর ও আন্তরিক :

বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?
অরণ্যভূমি আঁধার করিয়া শতেক বর্ষ ধরি
শাখাপ্রশাখায় মেলি সহস্র বাহু
মৃত্তিকারস করিয়া শোষণ শিকড়ের পাকে পাকে
নিম্নে বিরচি বহুবিস্তৃত স্নেহছায়া-আশ্রয়—
অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?...
বিফল উপমা, কোথা অরণ্য, কোথায় বনস্পতি,

কোথা কালিদাস, উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে কবি—
কোথায় উজ্জয়িনী ?
শুধু মেঘদূত গগনে গগনে গুমরিছে গুরু গুরু,
পবনে করিয়া ভর
কালসমুদ্র পার হয়ে এল সহস্র বর্ষের।
শত-পারাবত-কূজন মুখর ভবনবলভি যত
মিশিছে ধূলায়, শুনিতেছি মোরা আজো—
কপোতকাকলি এ কলিকাতায় অলস মধ্যদিনে।

নিদারুণ মৃত্যুঘাতে বিবশ কবিচিত্তের মর্মমথিত ক্রন্দনবাণী মুহূর্তেই পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে—'ভুবন ছাড়িয়া ভুবনের কবি গিয়াছে পরমক্ষণে', এই শোকের সান্ত্বনা কোথায় ? কবি সান্ত্বনা পেয়েছেন গৃহকোণে। ভুবনজোড়া হাহাকার থেকে কবি আত্মাপসরণ করে এলেন :

অন্ধকারেতে সভয় চরণ ফেলিয়া এলাম ঘরে—
আমার রুদ্ধ ঘরে ;
সম্বিৎহারা সম্বিৎ পেনু ফিরে—
প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
স্নিগ্ধশিখায় জ্বলিতেছে ঘৃতদীপ ;
চিতার আগুন ঘরের প্রদীপে কখন ছুঁইয়া গেছে—
ছুঁয়েছে পরম স্নেহে।
দ্বিধা-কম্পিত দুই করতল এক হল আশ্বাসে,
বলিতে পারি না কোন দেবতারে ঘৃতদীপ-মহিমায়
নিবেদিনু নতি চরম নমস্কারে।

কবিপ্রাণের মত্ত হাহাকার এখানে সান্ত্বনা লাভ করেছে। 'রাজহংস' কাব্যের 'পান্থ-পাদপ' কবিতার নায়ক এখন আপন মানস-সরোবরের তীরে আশ্রয় সন্ধান করছেন। 'মানস-সরোবর' কাব্যে সেই আশ্রয় সন্ধানের কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

'মানস-সরোবর' কাব্যের প্রথম কবিতা 'মানস-সরোবরে' যে আশ্রয়সন্ধানের কাহিনী, শেষ কবিতা 'নচিকেতা'য় তারই মহত্তর ব্যঞ্জনাগর্ভ রূপায়ণ। নচিকেতার প্রতি কবির জিজ্ঞাসা ঃ

> নচিকেতা, তব সন্ধান হল শেষ ?
> মৃত্যু-আলয়ে আতিথ্য লভি ফিরিলে মর্তভূমে ;···
> মিলেছে কি সমাচার ?···
> নচিকেতা, তব সাধনা কঠোর কি দিল আমারে আনি ?
> একটি কাহিনী—উপলখণ্ড কালবারিধির তটে,
> যজ্ঞ-অগ্নি তাহারই একটি নাম।
> হায় নচিকেতা, মর্তলোকের জীবন মরণশীল,
> ধরার বিরহ-ব্যথায় কাতর শঙ্কিত ভীরু প্রাণ
> তোমার কাহিনী মাঝারে তাহারা পেয়েছে কি আশ্বাস
> সম্মুখ হতে উঠেছে কি কারো প্রাণমৃত্যুর
> রহস্য-যবনিকা,
> দৃষ্টি হইতে ছিঁড়িয়া খসেছে কারো সংশয়-জাল ?
> হায় নচিকেতা, বিফল সাধনা তব।

মহত্তম কবিপ্রতিভার অন্তর্ধানে সজনীকান্ত যে সান্ত্বনা

গৃহপ্রদীপের আলোয় পেতে চেয়েছিলেন, পরবর্তী দিনের ঝোড়ো বাতাসে সে প্রদীপশিখা কেঁপে কেঁপে উঠেছে; নচিকেতার অমৃত-সাধনায় মৃত্যুগ্রস্ত ধরণীর কবি আশ্বাস লাভ করেন নি, তাই এ কথা বলতে তিনি বাধ্য হয়েছেন :

নচিকেতা, তব প্রাচীন কাহিনী মানি যে অর্থহীন,
মৃত্যুর কালো, আলো তার মাঝে পশিবে না
কোনও দিনও,
নচিকেতা ছাড়ো পুরাতন প্রতারণা।

'মর্ত হইতে বিদায়' ['পঁচিশে বৈশাখ'] কবিতার রচনা-তারিখ ১৯ ভাদ্র ১৩৪৮, আর 'নচিকেতা' ['মানস-সরোবর'] কবিতার তারিখ আশ্বিন, ১৩৪৮। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে সান্ত্বনালাভ ও সান্ত্বনাচ্যুতির এই নিদারুণ বেদনা কবি সজনীকান্ত বহন করেছেন। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনে যে আশ্রয় ছিলেন, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে কবি আলোচ্য তৃতীয় পর্বে আর কাব্যজীবনে ভারসাম্য ফিরে পাচ্ছেন না। ঠিক তার পরে রচিত [কার্তিক ১৩৪৮] 'মানস-সরোবর' কবিতায় আবার সেই পুরাতন আশ্রয়—কাব্যবিশ্বাস ফিরে পাবার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করি—

সব ভুল, সব ভুল, যাহা কিছু জানিয়াছিলাম;
সকল দিনের শেষে নাহি নামে রাত্রির আঁধার,
সকল রাত্রির শেষে জাগে না প্রভাত।...

এই মৃত্যু, এই পরিণাম।
সব ভুল, সব ভুল, যাহা কিছু জানিয়াছিলাম।
ক্লান্ত পক্ষ বিস্তারিয়া, রাজহংস পঁহুছিল শেষে
হিমাচল-পাদমূলে গাঢ়নীল মানসের তীরে।...
আমারও বিশ্রাম জানি এই নীল মানসের তীরে,
যে মানস আমারই মানসে;
মোর হিমাচল-মূলে স্তব্ধ শান্ত নীলাম্বু-সায়র—
আমি রচিয়াছি সেথা ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গের অন্তিম বিশ্রাম,
আপনি করেছি সৃষ্টি টলমল নীর নীল স্বচ্ছ সুশীতল,
অগাধ অতল জল, মোর তপ্ত জীবনের জ্বালা অবসান।

আত্মরূপচিত্রণের পর্ব ও আত্মরূপবিশ্লেষণের পর্ব ঃ
এ দুয়ের মাঝে আলোচ্য তৃতীয় পর্ব—রবীন্দ্রাশ্রয়িতার পর্ব। তবে এই মহৎ আশ্রয়ে থেকেও কবি সজনীকান্ত আত্মবিশ্লেষণের হাত এড়াতে পারেন নি। 'রাজহংস' কাব্যের (দ্বিতীয় পর্বে) 'দুই মেরু' ও 'পান্থ-পাদপ' কবিতায় যে আত্মরূপচিত্রণ, তা আরও গভীর ও বিশ্লেষণ-ধর্মী হয়েছে 'মানস-সরোবর' কাব্যের দুটি কবিতায়—'আমি' ও 'স্লেটের লেখা'য়। সজনীকান্তের কবিমানসের বিশ্লেষণে এ দুটির পরিচয় গ্রহণ অবশ্যকর্তব্য। 'পান্থ-পাদপ' কবিতায় দেখেছি, কবি আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন একটি সুন্দর বর্ণনায়—'চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি'।

'আমি' কবিতাটিতে আত্মবর্ণনা আরও গভীরে পৌঁচেছে।

আত্মজিজ্ঞাসায় কবিপ্রাণের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। কবি আত্মানুসন্ধানে বেরিয়েছেন :

> কে আমি, কি মোর পরিচয়—
> এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে বারম্বার পাসরি পাসরি
> ভালমন্দে গড়া আমি মোর বিশ্বে পেয়েছি প্রকাশ।

বোধ করি প্রত্যেক বিবেকবান্ সৎ কবির মনেই এই জিজ্ঞাসা ওঠে ; কেউই এর হাত এড়াতে পারেন নি। সজনীকান্ত এর হাত এড়িয়ে যেতে চান নি, এখানেই তাঁর কাব্যসাধনার আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে খণ্ড জীবনচিত্রগুলি অখণ্ড সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, আপাত-বৈষম্যের অন্তরালে নিগূঢ় ঐক্যদর্শন গড়ে ওঠে। সজনীকান্তের সেই সামগ্রিক দৃষ্টির পরিচায়ক 'আমি' কবিতাটি। কবি সংসারের একজন, ঘৃণা প্রেম তিনি পেয়েছেন, বিলিয়েছেন, তথাপি তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘোচে নি। আর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের এই নির্জনতাবোধ কোনদিনই যায় না। তাই কবির স্বীকৃতি :

> সেখানে একাকী আমি, সে অসীম একান্ত আমার—
> ভাষাহীন সে অসীমে চিরমূক ইতিহাস মোর।

কিন্তু কবি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। যে মহত্তম কবি তাঁর শেষ testament-এ মানবতার প্রতি মৃত্যুঞ্জয় আস্থা স্থাপন করেছেন, সজনীকান্ত তাঁরই ভাবশিষ্য। তাই সজনীকান্ত ঘোষণা করেছেন :

জীবনের দুঃখ শোক লাঞ্ছনা ও অপমান মাঝে
এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি—
মহত্তেরে বৃহতেরে প্রতিদিন করিব স্বীকার।…
সমস্ত বেদনা-বিষ এ জীবনে করিয়া মন্থন
মুঠি ভরি যে অমৃত এতদিনে করিয়াছি পান,
সাধ যায় জনে জনে নিজ হাতে দিতে সেই সুধা—
নিজেরে প্রকাশ করি সকলেরে গড়িয়া তুলিতে,
মুছে-যাওয়া শূন্যতায় রূপহীন মানুষের আর কোনও
নাহি পরিচয়।

সজনীকান্ত তাঁর কাব্যপাঠককে নৈরাশ্যের অতল গভীর খাদের সামনে ছেড়ে দেন নি, অমৃত-পথের—মানুষ ও সংসারের প্রতি প্রেমের নির্দেশ দিয়েছেন।

'স্লেটের লেখা' কবিতাটিতেও আত্মরূপচিত্রণের ও আত্মপরিচয়লাভের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবিমানসের সহজাত নিঃসঙ্গতা নিয়ে তিনি এখানেও জীবনপথ-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন:

মোর ভালবাসা শিশুকাল হতে ফিরেছে দোসর খুঁজে—
কখনো ভিক্ষা কভু কাতরতা কখনো পরাক্রম।
আজও সে বিবাগী, তবু
অজানা অনাম অনিশ্চিতের খুঁজিতেছে আশ্রয়।

শেষ পর্যন্ত জননী-আশ্রয় লাভ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। মানস-সরোবর-পরিক্রমায় এই জননী-আশ্রয় রবীন্দ্রাশ্রয়ের পটভূমিতে মহত্তর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

॥ ৬ ॥

মানস-সরোবর আশ্রয়েই সজনীকান্তের কাব্যের তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি। প্রথম পর্বের উদ্‌ভ্রান্তি ও তিক্ততা এবং দ্বিতীয় পর্বের আত্মরূপচিত্রণ-সাধনা উত্তীর্ণ হয়ে কবি তৃতীয় পর্বে যে রবীন্দ্র-আশ্রয়ে পৌঁচেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারলেন না; আবার নবতর কাব্যবিশ্বাস ও আশ্রয়-সন্ধানে চতুর্থ পর্বে যাত্রা শুরু করলেন। এই শেষ পর্বের (১৯৪৩-৫৯) কবিতা একত্র সঙ্কলিত হয় নি, বিভিন্ন পত্রিকায় তা ছড়িয়ে আছে। এই পর্বের যে বিশিষ্ট লক্ষণ, তাকে বলতে পারি আত্মরূপবিশ্লেষণের পর্ব। প্রৌঢ়ির প্রশান্তি এখন কবিমনে আধিপত্য বিস্তার করেছে। যৌবনের বিক্ষুব্ধ উন্মাদনা এবং অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা এখন অপসৃত হয়েছে, তার স্থানে এসেছে প্রশান্ত আত্মবিশ্লেষণ। সকল তিক্ততা ও বেদনা থেকে, সংশয় ও হতাশা থেকে কবি এই পর্বে মুক্ত হয়েছেন। সজনীকান্তের সাম্প্রতিক কবিতাবলী পাঠে অন্ততঃ এই ধারণাই মর্থিত হয়।

ত্রিশ বৎসরের কাব্যপরিক্রমা অন্তে এ কথাই আমাদের মেনে নিতে হয় রবীন্দ্র-রূপ-সাগরতীর ছেড়ে কবি সজনীকান্ত অন্যত্র যেতে চান নি। তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতা আপাত, বাহ্যিক ও সাময়িক। কাব্যজীবনে তিনি রবীন্দ্রকাব্যাদর্শে দীক্ষিত। সমরোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার হতাশা ও বেদনা তাঁর কাব্যজীবনে পরমাপ্রাপ্তি নয়। কল্লোল-কালিকলম-পূর্বাশা-

গোষ্ঠী থেকে আজ পর্যন্ত প্রবাহিত যে আধুনিক সংশয়ী অবিশ্বাসী নাগরিক কাব্যধারা, সজনীকান্ত তাকে কোনদিনই সমর্থন করেন নি। 'শনিবারের চিঠি'র তীব্র আধুনিক কাব্য-সমালোচনার মূলে সজনীকান্তের এই কাব্যবিশ্বাস। একে অস্বীকার করলে বিদ্রূপ-কটূক্তিটাই প্রাধান্য পায়, প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রকাব্যাদর্শে বিশ্বাসী আস্তিক, সৃষ্টির মঙ্গলে বিশ্বাসী, শান্তিপ্রত্যাশী কবিমানস এই পর্বেই স্পষ্টতর চেহারায় দেখা দিয়েছে।

এ কথা স্মরণযোগ্য যে আলোচ্য পর্বটি আধুনিক ভারতবর্ষের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ১৯৪৩-এ পঞ্চাশের মন্বন্তর ও যুদ্ধ, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃবলি, ১৯৪৭-এর খণ্ডিত স্বাধীনতা ও দেশভাগ, ১৯৪৮-এ গান্ধী-হত্যা, ১৯৪৮-৫০এ ছিন্নমূল জীবনের আশ্রয়সন্ধান প্রভৃতি বড় বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে, বহু মানবিক মূল্যবোধের অবসান ঘটেছে, দ্রুত পরিবর্তমান সমাজ-জীবনে ভাঙন দেখা দিয়েছে, আণবিক যুগের নবরূপ প্রকাশ পেয়েছে, আত্মঘাতী মারণাস্ত্রের আবিষ্কারে ও মহাবিশ্বজয়ের নেশায় সভ্যতা গভীরতম সংকটলগ্নে উপনীত হয়েছে।

সজনীকান্তের মত সমাজসচেতন সদাজাগ্রত কবি এ-সবের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না এবং অনুভূতিপ্রবণ কবিমানসে এ-সবের প্রতিক্রিয়াও গভীর-ভাবে মুদ্রিত হয়—একথা মনে রেখে শেষ পর্বের কাব্যালোচনায় আমাদের প্রবৃত্ত

হতে হয়। আজকের দ্রুতপরিবর্তমান বিশ্বে যখন সার্বিক সংকট লগ্নটি উপস্থিত এবং মানবিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত, তখন কোনও সৎ কবির পক্ষেই আপন আদর্শে অবিচল থাকা অত্যন্ত কঠিন সাধনা। সর্বগ্রাসী হতাশা ও নৈরাশ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নাস্তিক তিক্ত জাবনাদর্শকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে, না, একে পেরিয়ে আস্তিক জীবনদর্শনে পৌঁছতে হবে—এই কঠিন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন দুনিয়ার সকল সাহিত্যসেবক। এই পর্বে কবি সজনাকান্ত স্বনামে ও 'গোপালদা'র (সংবাদ-সাহিত্য, শনিবারের চিঠি) বেনামে যে-সব কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলি সযত্নে অনুধাবন করলে লক্ষ্য করা যায় তিনিও এই জিজ্ঞাসার হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। আজকের পরিবর্তমান বিশ্বে কোনও কিছুরই স্থায়ী সমাধান সুলভ নয়। কবি সজনীকান্তের কবিতায় আত্মরূপবিশ্লেষণের ও আত্মজিজ্ঞাসার তীব্রতা ও গভীরতা এই পর্বে লক্ষ্য করি, তা প্রমাণ করে তিনি বিবেকবান্ সৎ কবি—যিনি শান্তির শেষ বিজয়ে, মানবিক মূল্যবোধের মহত্তর সৃষ্টিতে, কল্যাণ ও মঙ্গলের জয়যাত্রায় আস্থা রাখেন। কিন্তু বস্তুসচেতন কবি এত সহজেই পরিত্রাণ পান না। বাস্তবের কঠিন জিজ্ঞাসা ও তার সামনে আদর্শের অসহায়তা তাঁকে ব্যথিত ও পীড়িত করবেই। সেই বেদনা সজনীকান্তের এই পর্বের কবিতায় লক্ষণীয়। 'গোপালদা'র তিব্বতী গুহায় প্রস্থান, প্রত্যাবর্তন ও পুনঃপ্রস্থানে এই অস্থিরতা ও বেদনারই পরিচয় বিধৃত হয়েছে। তথাপি সজনীকান্তের

সাম্প্রতিক কবিতায় দেখি, তিক্ততা নৈরাশ্য হতাশা প্রাধান্য লাভ করে নি, ধরণীর প্রতি গভীর ভালবাসাই জয়লাভ করেছে। 'গোপালদা'-মারফত সেই মৃত্যুঞ্জয় প্রেমবিশ্বাসের বাণী সজনীকান্ত আমাদের শুনিয়েছেন [শনিবারের চিঠি, সংবাদ-সাহিত্য, পৌষ ১৩৬৫] :

পুরাতন এ ধরণী, তাই তো নবীনা প্রতিদিন,
ছয়টি ঋতুর রসে সঞ্জীবিয়া রাখে আপনারে
নিত্য বিবর্তন মাঝে ; সঞ্চয়ের ব্যর্থ গ্লানিভারে
স্মরণ করে না কভু অতীত কালের কোন ঋণ।
মাটির আঁধারে তার প্রাণসুধারস রয় জমা,
সেই রহস্য ফুলে ফলে নিত্য হয় বাহিরে প্রকাশ—
তারি মাঝে আছে মন্ত্র রুধিবারে মহামৃত্যু-ত্রাস,
তাই চিরপুরাতন এ ধরণী চিরমনোরমা।
ওরে মৃত্যুভীত, সেই প্রাণমন্ত্র কবে শিখে নিবি,
লোভহীন নিবেদনে নিজেরে নিঃশেষে করি দান,
চলমান কালস্রোতে বার বার করি পুণ্যস্নান
এ চির যৌবন-তীর্থে ধরণীর, হব চিরজীবী।
অনুখন চলে যেন ভাঙা-গড়া তোমার মাঝারে—
গতিহীন অক্ষয়েরে মহাকাল প্রতিদিন মারে।

আলোচ্য শেষ পর্বে (১৯৪৩-৫৯) কবির ব্যক্তিগত জীবনের দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একটি, তাঁর পঞ্চাশ-পূর্তি উপলক্ষে জন্মোৎসব-অনুষ্ঠান (৯ ভাদ্র, ১৩৫৬), অপরটি তাঁর

চক্ষু-অপারেশন (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)। এই দুটি ঘটনাই তাঁর কাব্যজীবনে স্বাক্ষর রেখে গেছে।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাত ও তিক্ততাসৃজন কবি সজনীকান্তের কাম্য নয়, তার প্রমাণ এখানে পাই। পঞ্চাশ-পূর্তি উপলক্ষে সুসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে কবিকে যে সংবর্ধনা সাহিত্যিক-বন্ধুরা জ্ঞাপন করেন, তার উত্তরে সজনীকান্ত যে ছন্দোবদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, তাতে কবিমানসের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কবি বলেছেন—

একদা মোর এই তো ছিল দাবি—
আমার হাতে বিশ্বজোড়া মনের আছে চাবি—
যেখানে যত কুলুপ সেই চাবিতে যাবে খুলে,
পারিব দিতে আশার বাণী নিরাশ হৃদিমূলে ;
সবার বুকে সবার লাগি জাগাব ভালবাসা,
আমার মুখে মুখর হবে মূক মনের ভাষা ;
নূতন সুরে আমি গাহিব গান,
উঠিবে গেয়ে সঞ্জীবিত পুরাতনের প্রাণ।
একদা মোর এই তো ছিল দাবি—
পেয়েছি হাতে সত্য-শিব-সুন্দরের চাবি ॥

জীবনের মহৎ সাধনার আকাঙ্ক্ষাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। পঁচিশে বৈশাখকে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন, 'প্রণাম করি পঁচিশে বৈশাখে, সারা যুগের সার্থকতা ঘিরিয়া থাক্ তাঁকে।' নৈরাশ্য তাঁর হৃদয়কে অধিকার করে নি, প্রীতিসাধনার কবি সজনীকান্ত

সমস্ত দুঃখবেদনাকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন, তাঁর কাব্যসাধনা সম্পর্কে এটাই বড় কথা।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঃ চক্ষু অপারেশন। নবদৃষ্টি-লাভের ফলে গীতিকবিতার একটি নোতুন স্রোতোধারার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সজনীকান্ত একটি নোতুন প্রত্যয়ভূমিতে উপনীত হয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতার মূল রস শান্তরস, একটি প্রীতিপ্রসন্ন উত্তেজনামুক্ত শান্ত ধ্যান-দৃষ্টির পরিচয় এখানে বিধৃত হয়েছে। এই নোতুন কাব্য-ফসলের প্রথম সাক্ষাৎ পাই ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি, ১৯৫৮তে রচিত দুটি সনেটে (শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। অন্যতর সনেট 'নবায়ন' এই নোতুন প্রত্যয়ের পরিচয় বহন করে, এটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য ঃ

অন্ধতার আবরণ বিদূরি বিজ্ঞান-শলাকায়
সুনিপুণ হস্ত যাঁর প্রকাশিল নব সূর্যালোক—
লভি নয়নের জ্যোতি তাঁর প্রতি নতি মোর ধায়,
অবারিত দৃষ্টি মোর দিনে দিনে দূরগামী হোক।
তমসা-আচ্ছন্ন আঁখি যা দেখেছে কটু ও কষায়,
চারিদিকে যা দেখিয়া ভেবেছিনু অন্ধ হোক চোখ—
নবীন দর্শন লভি চিত্ত মোর প্রার্থনা জানায়—
সুন্দর হউক ধরা, মানুষেরা হোক বীতশোক।
বহুদিন ভুলেছিনু পৃথিবীতে এত আছে আলো,
যত আলো এ আকাশে এ মাটিতে তত ভালবাসা—
জড়ত্বের আবরণ মানুষেরে দেবত্ব ভুলালো,

জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় ঘুচুক এ তম সর্বনাশা।
দরদী বিজ্ঞানী এস, এ আঁধারে দৃষ্টি-দীপ জ্বালো,
আনন্দে হাস্থক পৃথ্বী, দূর হোক নিষ্ফল হতাশা॥

ব্যক্তিগত উপলক্ষ্যকে কাব্যের অমরতা দানের একটি সুন্দর প্রকাশ বলেই এটি অভ্যর্থিত হবে। গীতিকবিতা যে কবির ব্যক্তিজীবনের কাব্যরূপায়ণ, সেটি এখানে পুনর্বার প্রমাণিত হল। পরবর্তী এক বৎসরে সজনীকান্তের কাব্যরচনায় যে জোয়ার লক্ষ্য করা যায়, তার সূচনা এখানেই—অন্ধ তমসার উপর বিজয়লাভে আলোকের এই বন্দনায়।

কবি সজনীকান্তের কাব্যজীবনের ভিত্তিভূমি যে রবীন্দ্রকাব্য, তার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। উপরোক্ত কবিতায় আস্তিক জীবনদর্শনের যে পরিচয় পাই, তা রবীন্দ্রকাব্য-নিষ্ণাত কবি-মানসের আন্তর প্রকাশ। রবীন্দ্র-আনুগত্যের শেষতম পরিচয় পাই একটি 'টুকরি' কবিতায় [ফাল্গুন ১৩৬৪, শনিবারের চিঠি দ্রষ্টব্য]। রবির আলোয় বিশ্বজগৎ ও রবি-প্রতিভালোকে বাংলার কাব্যজগৎ উদ্ভাসিত হয়েছে, এই পুরনো সত্যের নবতম ঘোষণা এই কবিতাটি :

সবাই মিলে তুলেছিলাম ছবি
কেউ বা মোরা গল্প-লেখক
কেউ বা মোরা কবি।
অনেক কালের পর—
রাতের নভে হারিয়ে গেলাম
আমরা পরস্পর।

মহাকালের কালো পাড়ে
তারার ঝিকিমিকি
বাড়িয়ে দিয়ে, আমরা শুধু শিখি—
জগৎ জুড়ে আলো ছড়ায় রবি,
ছবির মতন আমরা শুধু ছবি।

যে শান্তি ও বৈরাগ্যের অধিষ্ঠানভূমিতে কবি উপনীত হয়েছেন, তা একাধিক কারণে আশঙ্কার স্থল বলে প্রতীয়মান হবে। জগৎ ও জীবনের প্রতি কবির অনাসক্তি ঘটতে পারে অথবা তিনি কাব্যসাধনাকে ধর্মসাধনার তুলনায় নিম্নাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। সুখের বিষয়, সজনীকান্তের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা অমূলক। প্রখর বাস্তবচেতনা ও কাণ্ডজ্ঞান তাঁকে রক্ষা করেছে। পূর্বে যে মনোবৃত্তি তাঁকে রোমান্টিকতার আতিশয্যকে তীব্র ব্যঙ্গ করতে প্ররোচনা দান করেছিল, আজ তা কবিকে অসূয়ামুক্ত দর্শনচেতনার স্তরে উত্তীর্ণ করেছে। জগৎ ও জীবনকে সত্যরূপে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে সজনীকান্ত দেখেছেন। মুগ্ধ আত্মরতি ও রোমান্টিক প্রেমসাধনা সাম্প্রতিক বিশ্বাসরিক্ত হৃদয়হীন জগতে কী অভ্যর্থনা পেতে পারে, তার পরিচয় সজনীকান্ত উপস্থিত করেছেন একটি সনেটে। সেটির নাম 'বৃন্দাবনের প্রতি মথুরা' [চৈত্র ১৩৬৪, শনিবারের চিঠি]ঃ

ফরমাশ করেছ বন্ধু, লিখিবারে প্রেমের সনেট--
যে প্রেম সনেট-প্রসূ, রাজপথে স্তব্ধ বহুদিন।
তাহারে যতই ডাকি বলে সে যে, "ইট ইজ ট্যু লেট!"

হৃদয়ের পিণ্ড জুড়ে বসিয়াছে লিভার ও স্প্লীন।
শূন্য মধু-বৃন্দাবন, ঝোলে সেথা 'টু-লেট'-ট্যাবলেট,
মথুরার করণিকে বেণু ভেঙে হল আলপিন।
রাজাকে করিতে খুশী ভারে ভারে মদ আসে ভেট,—
নিধুবনে কেকাকুহু স্তব্ধ, ক্যানেস্তারা-টিন।
তাই তো নিবিষ্ট মনে লিখিতেছি ভুয়া আত্মস্মৃতি,
প্রেমের সমাধি 'পরে গড়িতেছি তাসের প্রাসাদ—
স্পেডকে রয়াল ডেকে লভি যে চরম আত্মপ্রীতি,
একমুখী ভালবাসা হয় বহুমুখী সাম্যবাদ।
বাল্যে যাঁর রাসলীলা তাঁরি কণ্ঠে ভগবদ্‌গীতি,
কুঞ্জে যে কূজিল প্রাতে, সন্ধ্যায় সে করে আর্তনাদ॥

আজকের যে জগৎ-মথুরায় রোমান্টিক ভাবনা-বৃন্দাবনের 'বেণু ভেঙে আলপিন' তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে কোন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপনা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। ধরণীপ্রীতি ও মানবপ্রেমের সঞ্জীবনী-মন্ত্রে কবি সজনীকান্ত এই বিশ্বাসরিক্ত জগতে রবীন্দ্রকাব্যাদর্শে গঠিত কবিমানসের প্রত্যয়টিকে রক্ষা করেছেন। সরস্বতীর সাধনমন্দিরে এই বাণীসাধক তাঁর 'মূক বন্ধু' 'বাণীহীন মসীপত্রখানি'র আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনার সারস্বত-বিশ্বাসটিকে ব্যক্ত করেছেন একটি কবিতায় ['বন্ধুর প্রতি', জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫, শনিবারের চিঠি]:

মানি সেই মূক আবেদন
তোমারে স্মরিয়া বন্ধু, খুলিয়াছি মনের ভাণ্ডার।
এ অনিত্য পৃথিবীতে—নিত্য যাহা রহে ধ্বনিময়
অতিক্রমি খণ্ডকাল তাই হয় চিরচমৎকার।

সংশয়ের ঊর্ধ্বে উঠি নিত্য হোক ক্ষণ-পরিচয়—
তুমি একা মোরে দিলে, আমি দিব সবার উদ্দেশে—
কে শুনিবে নাহি জানি, না জানি কে নেবে ভালবেসে।
তুমি উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য মোর এ বিশ্ব-ভুবন।
ছন্দে সুরে যদি কভু সার্থকতা লভে মোর বাণী
হারাইয়া যাই যদি তুমি আমি এই ভবে
ধন্য হবে মসীপাত্রখানি ॥

'রাজহংসে'র কবি সজনীকান্ত তাঁর কাব্য-'মানস-সরোবর'-পরিক্রমা-অন্তে এই নিশ্চিত মৃত্যুঞ্জয় আশ্বাসের প্রত্যয়-ভূমিতে উপনীত হয়েছেন ; এখানেই তাঁর কাব্যসাধনা সার্থকতা লাভ করেছে।

❁ অনুচিন্তা ❁

সত্যেন্দ্রনাথ ও সুইন্‌বর্ন্‌

॥ ১ ॥

বর্তমান শতকের প্রথম পাদের বাংলা কাব্যসাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি নিশ্চিত ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের নেতারূপে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা তাঁর সম্পর্কে গুরুতর মনোযোগ ও আলোচনা দাবি করে। অথচ সত্যেন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ মূল্য নিরূপণের প্রয়াস ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের 'সত্যেন্দ্রনাথ : কবিতা ও কাব্যরূপ' ছাড়া অদ্যাবধি সামান্যই হয়েছে। সত্যেন্দ্র-কাব্যপাঠের যে ফলশ্রুতি, তা কেন পাঠককে তাঁর সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণে উৎসাহিত করে না, এ প্রশ্নের গভীর আলোচনা বিশেষ হয় নি। অথচ এই প্রশ্নের সন্তোষ-জনক উত্তরের উপর সত্যেন্দ্র-কবিমানসের মূল্য নির্ভরশীল। মহৎ কবিতা যে কেবল যুক্তি শৃঙ্খলা নয়, তা মেধা পাণ্ডিত্য নয়, ছন্দোল্লাস ও অপরিমিত উচ্ছ্বাস নয়, শিশুসুলভ আতিশয্য ও উত্তেজক লঘু কল্পনার খেলা নয়, তা সত্যেন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা সব সময় মনে রাখি না। ফল হয়েছে এই, সত্যেন্দ্রনাথ কবি ও পদ্যকার, উভয় আখ্যাতেই ভূষিত হয়েছেন: এবং এ দুয়ের কোনো একটিকে যে ত্যাগ করতেই হয়, সে বিষয়ে পাঠকমন দ্বিধাগ্রস্ত।

ইংরেজি কাব্যসংসারে অনুরূপ সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুইন্‌বর্ন্‌কে নিয়ে। সুইন্‌বর্ন্‌ কি মহৎ কবিপ্রতিভা, না নিতান্তই পদ্যকার? তিনি কি সামগ্রিক কবিকল্পনার (imagination) অধিকারী, না লঘু কল্পনার (fancy) কারবারী? তিনি কি সামগ্রিক সুষম বাণীশ্রীর অধিকারী, না মঞ্জুল বাক্‌সর্বস্বতা ও ছন্দোল্লাসের কারবারী? এই প্রশ্নের সমাধানের উপরেই সুইন্‌বর্নের কবি-প্রতিভার মূল্য নির্ভরশীল। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে ইংরাজি সমালোচনাক্ষেত্রে এই প্রশ্ন নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। গস্‌, ওয়াইজ, ম্যাককেল, নিকলসন, কম্পটন রিকেট, হেণ্ডারসন্‌ প্রমুখ প্রখ্যাত সমালোচকরা এ নিয়ে নানা গভীর আলোচনা করেছেন এবং স্বীকার করতেই হয়, সুইন্‌বর্ন্‌ প্রথম শ্রেণীর কবির শিরোপা পান নি।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সুইন্‌বর্নের মিল প্রচুর, অমিল কম। তাই সুইন্‌বর্নের কাব্য-প্রতিভা নিরূপণের আলোকে সত্যেন্দ্র-প্রতিভার পুনর্বিচার করা যেতে পারে। কাব্যপ্রসাধনে—বিশেষত বহিরঙ্গ-প্রসাধনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারে নৈপুণ্য, চিত্রকল্প রচনায় অনায়াস দক্ষতা, কবিকল্পনার আকস্মিকতা, শিশুসুলভ আতিশয্য ও উত্তেজনা, খেয়ালি কল্পনাবিহার, ছন্দোল্লাস, শ্রুতিমাধুর্যের প্রতি ঝোঁক—উভয়ের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় এবং তা একটি অপ্রতিরোধ্য তুলনাত্মক আলোচনায় আমাদের আকর্ষণ করে।

টেনিসন একদা সুইন্‌বর্ন্‌কে লিখেছিলেন, তিনি সুইন্‌বর্নকে

তাঁর আশ্চর্য ছন্দোনৈপুণ্যের জন্য ঈর্ষা করেন। স্যুইন্‌বর্নে তা-ই প্রাধান্য লাভ করেছে। একটি সুমধুর ছন্দসঙ্গীতে, গীতধ্বনিতে স্যুইন্‌বর্নের কবিতা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি 'Atalanta in Calydon' (১৮৬৪) এই সংগীতে মুখরিত ও গুঞ্জরিত হয়ে আছে। টেনিসনের Idylls of the King-এর গভীর গীতধ্বনি, ব্রাউনিং-এর Dramatis Personæ-র গম্ভীর জীবনবন্দনা, লঙ্‌ফেলোর প্রশান্ত জীবন-সন্ধানের শান্ত সুরের মাঝে তাপদগ্ধ নিদাঘ-সন্ধ্যার আকস্মিক ঝঞ্ঝাপাতের মত্ত কলরোলের মত এসে পড়ল আটালাণ্টার উত্তেজিত উল্লসিত ছন্দবর্ষণ। সংগীতোন্মত্ত ছন্দোন্মাদ কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হল :

When the hounds of spring are on winter's traces,
The mother of months in meadow or plain
Fills the shadows and windy places
With lisp of leaves and ripple of rain ;
And the brown bright nightingale amorous
Is half assuaged for Itylus,
For the Thracian ships and the foreign faces,
The tongueless vigil and all the pain.

(Chorus from 'Atalanta in Calydon')

উজ্জ্বল বেগুনি রঙের ভরতপাখির গান আর বৃষ্টির ধারাপতনের সংগীতে মুহূর্তেই সমস্ত সংসার মুখরিত হয়ে ওঠে, অর্থ হারিয়ে যায়, অর্থহীন গীতধ্বনি প্রাধান্য লাভ করে। এখানেই

সুইন্‌বর্নের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয় যেন কবি বাণীলাবণ্যে, শব্দসংগীতে, ছন্দোল্লাসে উন্মত্ত হয়ে গেছেন। যখন পড়ি,

O death, a little, a little while, sweet death

বা। She bore the goodliest sword of all the world

বা। A little since, and I was glad, and now
I never shall be glad or sad again.

তখন মনে হয় একই ভাবের পুনরাবৃত্তিতে বা একই ধ্বনির পুনঃপুনঃ উচ্চারণে একটি শব্দের মায়াজাল কবি বিস্তার করে এই সংগীতমুখর খেয়ালি কল্পনার নেশায় বুঁদ হয়ে গেছেন।

সুইন্‌বর্ন্‌ আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি পৃথিবী ও সমুদ্রের সন্তান ; আরো স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন, তিনি একটি সমুদ্র-বিহঙ্গ, যে তরঙ্গের দোলায় দুলছে। সমুদ্রই তাঁর জননী, একথা তিনি একাধিকবার বলেছেন। সমুদ্রের অশ্রান্ত কলরোল ও তরঙ্গদোলায় তিনি আপন জীবনকে—সেই সঙ্গে কবিমানসকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তিনি সমুদ্রবর্ণনায় উচ্ছ্বসিত :

Sea, and bright wind, and heaven of ardent air,
More dear than all things earth-born ; O to me
Mother more dear than love's own longing, sea,
More than love's eyes are, fair.........

(The Garden of Cymodoce)

একটি সৌন্দর্যবিহ্বল প্রেমমুগ্ধ আত্মরত কবিকণ্ঠে আমরা শুনি জীবনোল্লাসের অনুপম বর্ণনা :

The joy that lives at heart and home
The joy to rest, the joy to roam,
The joy of crags and scaurs he clomb
The rapture of the encountering foam
Embraced and breasted of the boy,
The first good steed his knees bestrode,
The first wild sound of songs that flowed
Through ears that thrilled and heart that glowed,
Fulfilled his death with joy.

জীবনের এই অমিতোল্লাসই সুইন্‌বর্নের ছন্দোল্লাস। এই দুই তাঁর কাছে সমার্থক।

॥ ২ ॥

সুইন্‌বর্নের পরিচয় তাঁর জীবনোল্লাসে, পেগান দৃষ্টিভঙ্গিতে, মুগ্ধ সৌন্দর্যধ্যানে। অক্সফোর্ডের ছাত্ররূপে যে সুইন্‌বর্ন্‌কে আমরা চিনি, তিনি গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যপাঠে তন্ময়। ইতালি-ভ্রমণান্তে যে সুইন্‌বর্নের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে, তিনি বলেন, 'ইতালী আমার দ্বিতীয় মাতৃভূমি'। তাঁর সাহিত্যবিহার প্রাচীন গ্রীক নাটকের জগতে—যেখানে জীবনসম্ভোগ শেষ কথা!

কাব্যজীবনে সুইন্‌বর্ন্‌ যে ক'জন কবির মুগ্ধ পাঠক ছিলেন

তাঁরা হলেন—সেক্‌স্‌পীয়র, উগো, শেলি, মার্লো এবং ল্যান্‌ডর আত্মার এ্যাডভেঞ্চার, জীবনের উল্লাস, জীবনসম্ভোগের ব্যাকুল বাসনা তাঁকে পাগল করেছে এবং এঁদের কাব্যপাঠে সেই প্রেরণাই তিনি পেয়েছেন। তবে তাঁর গুরু ভিক্তর উগো, তাঁরই কথায় 'যিনি সেকস্‌পীয়রের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি'। উগোর কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন ধ্বনিমাধুর্য, ছন্দোচাপল্য, বাণীলাবণ্য। তিনি মুগ্ধচিত্তে বারবার আবৃত্তি করেছেন উগো-র 'Gastibelza' কবিতার সুমিত সুমিষ্ট চরণগুলি ঃ

> **Gastibelza l'homme a la carabine**
> **Chantait ainsi :**
> **Quelqu'un a-t-il connu dona Sabine ?**
> **Quelqu'un d'ici ?**
> **Dansez, chantez, villageois ! la nuitgagne**
> **Le mont Falou,**
> **Le veut qui vient a travers la montagne**
> **Me rendra fou.**

সুইন্‌বর্ন্‌ নিজেই বলেছেন, এই সুন্দর চরণগুলির ধ্বনিমাধুর্য ও ছন্দোলালিত্য তাঁর কাব্যসাধনার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে কী ভাবে নৈরাশ্য ও বেদনায় পরিণত করেছে এবং একটি নবতর আনন্দচেতনায় তাঁর কবিমানসকে উদ্ভাসিত করেছে। সৌন্দর্যসম্ভোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে বিষাদ, তারই প্রকাশ ঘটেছে এই স্বীকৃতিতে। আর এখানেই সুইন্‌বর্ন্‌ কেবল

পদ্যকার নন, কবি রূপে দেখা দিয়েছেন। প্রাচীন গ্রীক ও ইতালীয় সাহিত্যের পেগান দৃষ্টিভঙ্গিকে আত্মসাৎ করে অনিবার্য দুঃখকে আপন কাব্যে সুইন্‌বর্ন্‌ প্রকাশ করে অমরতার আশীর্বাদ লাভ করেছেন।

সুইন্‌বর্ন্‌ যে কেবল প্রেমিক কবি নন, সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিমানসের মৃদু গুঞ্জরণে আত্মরতি ও আত্ম-তৃপ্তিতে আচ্ছন্ন নন, তার প্রমাণ তাঁর Dolores কবিতাটি। Poems and Ballads সংকলনে সুইন্‌বর্ন্‌-কে আমরা দেখি তিনি, প্যাশন ও প্রেমের কবি। বিশুদ্ধ প্রেমের সাধনায় তিনি যে শিখরে উন্নীত হয়েছেন, সেখানে দেখি জীবনোল্লাস কি ভয়ংকর সৌন্দর্যে মুক্তি সন্ধান করে ফিরছে। সুইন্‌বর্ন্‌-কবিমানসের স্বরূপটি Dolores কবিতার সেই জীবন-সম্ভোগীর বর্ণনায় বিধৃত হয়েছে ঃ

When, with flame all around him aspirant,
Stood flushed, as a harp-player stands,
The implacable beautiful tyrant,
Rose-crowned, having death in his hands;
And a sound as the sound of loud water
Smote far through the flight of the fires,
And mixed with the lightning of slaughter
A thunder of lyres.

কবি সুইন্‌বর্ন্‌ সেই beautiful tyrant—দুরন্ত জীবনসম্ভোগী। আর এই দুরন্ত দুর্দম গ্রীক জীবনসম্ভোগের পিছনে রয়েছে

অবশ্যম্ভাবী ক্লান্তি ও দুঃখ, হতাশা ও বেদনা। তাই Dolores কবিতায় দেখি সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী কুমারী ডোলোরেস শেষ পর্যন্ত বেদনার দেবীতে (Lady of Pain) পরিণত হয়েছেন। রূপমুগ্ধ তরুণ কবিকণ্ঠে সেই অনিবার্য হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সন্ধানের অনিবার্য পরিণতি হয়েছে সৌন্দর্যাধার দেহে বেদনার উৎস আবিষ্কার :

Ah beautiful passionate body
  That never has ached with a heart !
On the mouth though the kisses are bloody,
  Though they sting till it shudder and smart,
  More kind than the love we adore is,
They hurt not the heart or the brain,
  O bitter and tender Dolores,
    Our Lady of Pain.

পেগান সৌন্দর্য সাধনার এই অনিবার্য দুঃখকর পরিণামের আন্তরিক হাহাকারেই সুইন্‌বর্ন্‌-কবিমানসের প্রতিষ্ঠা। সৌন্দর্য-সাধনায় আদর্শচ্যুতির বেদনা ও হাহাকারে সুইন্‌বর্ন্‌-এর নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা মনোযোগী পাঠকের শ্রদ্ধা দাবি করে।

॥ ৩ ॥

এখন দেখা যাক, সত্যেন্দ্রনাথ অনুরূপ মনোযোগ ও শ্রদ্ধা দাবি করতে পারেন কি না। রঙ ও রূপের সন্ধানে সুইন্‌বর্নের মতো সত্যেন্দ্রনাথের ক্লান্তিহীন যাত্রা। শ্রুতি ও দৃষ্টির

তৃপ্তিসাধনে উভয়েরই অদম্য উৎসাহ। ছন্দোলালিত্য ও মিষ্টি শব্দ সৃজনে উভয়েরই সমান দক্ষতা। লঘু কল্পনার পাখায় ভর করে উভয়েই আনন্দে ভেসে যান স্বপ্নসায়রে।

সুইন্‌বর্ন্‌ প্রসারপিনের উদ্যানে একটি স্বপ্নজগৎ গড়ে তুলেছেন অনুপম চিত্ররীতিতে—

Here, where the world is quiet ;
Here, where all trouble seems
Dead winds, and spend waves riot
In doubtful dreams of dreams ;
I watch the green field growing
For reaping folk and sowing,
For harvest-time and mowing,
A sleepy world of streams.

এটি অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্নজগতের বর্ণনা।

সত্যেন্দ্রনাথেও অনুরূপ চিত্ররূপের—স্বপ্নজগতের পরিচয় পাই—

(১) জাগ্‌ল রে নিদ্‌-ঘরে পাখী, আজ নারে নিদ্‌ সইতে
আঁখি হল অনিমেষ আলো-থই থইতে!
শোন্‌ সখী, শোন্‌ মুহু— কুহু কুহু কুহু কুহু,
বুকভরা সুখ নারে বইতে!
সে সুরের মনোহরে জ্যোছনার সরোবরে—
শত তারা এত জল-সইতে? (বেলাশেষের গান)

(২) ঢুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় ঢুলের তুমি ঢলবিথার
তন্দ্রা তোমার সুর্মা-চোখের তন্দ্রা তোমার আলতা পার
নীল গাভী নীল মেঘ দুহে নাও তার বিজলী শিং ধরি,
নীল পরী গো নীল পরী! (নীল পরী)

(৩) ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে, ঠুম্‌রী তালে ঢেউ তোলে !
বেল-চামেলীর চুমকি চুলে, ফুলের হাওয়ায় চোখ ঢোলে !
কুড়ুক পাখীর উলুর রবে ঘুম ভাঙে তার, দিন কাটে,
ঝীর্‌রি-দোয়েল-শালিক-শ্যামা-বুলবুলিদের কনসার্টে !...
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলিস ঝুমকো ফুলের বন দিয়ে,
ঢেউ ঝিলিকে মাণিক জেলে চাঁদের নয়ন নন্দিয়ে।
(ঘুমতী নদী, বিদায়-আরতি)

॥ ৪ ॥

সুইন্‌বর্ন্‌ ও সত্যেন্দ্রনাথ, উভয়ের রচনাতেই উচ্ছ্বাস ও ধ্বনির প্রাবল্য আছে ; ছন্দোলালিত্য ও শব্দমাধুর্যে উভয়েই সময় সময় আত্মহারা হয়েছেন। লঘু কল্পনার লীলাচাপল্য উভয়ের রচনাতেই আছে, শিশুসুলভ আতিশয্যও উভয়ত্র উপস্থিত। কিন্তু সুইন্‌বর্নে এ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আছে, যা সত্যেন্দ্রনাথে নেই। 'Atalanta in Calydon', 'Dolores', 'The Garden of Cymodoce' প্রমুখ কবিতায় কেবল বর্ণালিম্পন, ধ্বনিলালিত্য ও চিত্রসৌন্দর্য নেই, আছে সামগ্রিক সুষম বাণী-শ্রী, স্থিতধী জীবনবোধ এবং সামগ্রিক ঐক্যানুভূতি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় এই শেষোক্ত গুণনিচয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ শ্রেণীর কবিতার অপরিহার্য যে ক'টি গুণ—uniformity, wisdcm ও moderation—সর্বাঙ্গীণ সমতা, প্রজ্ঞা ও সংযম—এগুলির অভাব সত্যেন্দ্র-কাব্যে সহজেই ধরা পড়ে।

সুইন্‌বর্নের জীবনবোধ সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না, তার একটি চরম প্রমাণ গ্রহণ করা যাক। সমুদ্রের উপর উভয়েই কবিতা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের 'পুরীর চিঠি' (অভ্র-আবীর) ও সুইন্‌বর্নের 'The Graden of Cymodoce': এ দুই কবিতার প্রতিতুলনায় এই কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুইন্‌বর্নের সামগ্রিক জীবনবোধ সত্যেন্দ্রনাথে নেই। সুইন্‌বর্ন্ সমুদ্রের অশান্ত কলরোলে ও তরঙ্গদোলায় আপন জীবনকে ও সেই সঙ্গে কবিমানসকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নিজেকে সমুদ্র-বিহঙ্গ বলেছেন, তা এই আলোচনার গোড়ায় দেখিয়েছি; জীবনের অমিতোল্লাস ও ছন্দোল্লাস 'The Graden of Cymodoce' কবিতায় ও অন্যত্র সুইন্‌বর্নের কাছে সমার্থক হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'পুরীর চিঠি' কবিতায় এ ধরণের কোন জীবনবোধের পরিচয় নেই। শিশুসুলভ বিস্ময় ও আতিশয্যমাখানো দৃষ্টি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন:

কতই কথা লিখছে সাগর, লিখছে বারো মাস,
উতলা ঢেউ লিখছে সাগর-মথন-ইতিহাস;
দেখছি আমি মুহুর্মুহু জাগছে দিকে দিকে
সাপের রাশি সাপের ফণা চিহ্নিত স্বস্তিকে;
উঠছে সুধা, ফুটছে গরল; যাচ্ছে যেন চেনা
আঢ়ক হাতে লক্ষ্মী!—সাথে লক্ষ্মী কড়ি ফেণা।
ছন্দে ওঠে মন্দ ভালো; চলছে অভিনয়—
দেবাসুরের দ্বন্দ্বলীলা দুরন্ত দুর্জয়।

ঝড়ের বেগে ঝাণ্ডা নিশান ওঠে এবং পড়ে,
নীল-জাঙিয়া নীল-আঙিয়া অসুরগুলো লড়ে!
হঠাৎ হল দৃশ্য বদল উল্‌টে গেল পট—
ঘাঘরা ঘোরায় কোন্ মোহিনী মাথায় সোনার ঘট!
তারে ঘিরে অপ্সরীরা তরফা নেচে যায়,
ফেণায় চারু চিকণ কারু দুল্‌ছে পায়ে পায়।

কেবল নৃত্যপর ছন্দের উল্লাস; সমুদ্রতরঙ্গদোলায় কোন জীবনবোধ আভাসিত হয় নি। 'Poems and Ballads' সংকলনের অনেক কবিতায় সমুদ্রতরঙ্গদোলায় সুইন্‌বর্ন্ কবিজীবনের মুক্তিকে পেয়েছেন এবং বলেছেন, পৃথিবী নয়, সমুদ্রই তাঁর জননী। শেষ জীবনের কবিতায় তিনি সমুদ্রের বর্ণনায় কবিমানসের স্বরূপটিকে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতি-রূপমুগ্ধ ব্যাকুল কবিমানসের এই আন্তর-প্রকাশ তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষা উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে:

Sea, wind, and sun, with light and sound and breath
The spirit of man fulfilling—these create
That joy wherewith man's life grown passionate
Gains heart to hear, and sense to read and faith
To know the secret word our Mother saith
In silence, and to see, though doubt wax great,
Death as the shadow cast by life on fate,
Passing, whose shade we call the shadow of death.

জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে কবির এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় অনুপস্থিত।

সমুদ্র বর্ণনায় যেখানে সত্যেন্দ্রনাথ অধিকতর দায়িত্বজ্ঞান ও পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, সেখানেও এই প্রজ্ঞাদৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করা যায়। 'সিন্ধুতাণ্ডব' কবিতাটিতে সংস্কৃত পঞ্চচামর ছন্দের বাংলায় প্রয়োগ-পরীক্ষাই প্রাধান্য লাভ করেছে, সেখানে কবির নিজস্ব জীবনবোধের কোন পরিচয় নেই। প্রথম স্তবকটিই তার যথেষ্ট পরিচয়ঃ

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ শ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায়, শোনাও কেবল।

সমগ্র কবিতাটিতে বক্তব্য এর চেয়ে এগোয় নি।

অপেক্ষাকৃত দায়িত্বসম্পন্ন কবিতা—'সমুদ্রাষ্টক'-এ সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য সামান্য। যেখানে তিনি সমুদ্র সম্পর্কে শাস্ত্র-বর্ণনার অনুসরণ করেছেন। সমুদ্র সম্পর্কে বৈদিক ঋষিরা যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, তারই ছন্দোবদ্ধ রূপ এই কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথের শাস্ত্রনিষ্ঠা ও অধ্যয়নশীলতার পরিচয় এখানে পাইঃ

সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী ;
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি। তোমায় মোরা প্রণাম করি !
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণ-প্রিয় !
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু তুমি মহৎ কবি,ছন্দ তব প্রাচীন অতি ;—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে 'বিরাট-রূপা-সরস্বতী'।
আর্য তুমি বীর্যে বিভু, ঝঞ্ঝা তব উত্তরীয় ;
মন্ত্রভাষী ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।...

মেঘের তুমি জন্মদাতা, প্রাবৃট তব প্রসাদ যাচে,
বাড়ব-শিখা তোমার টীকা, জগৎ ঋণী তোমার কাছে,
রত্ন ধর গর্ভে তুমি, শস্যে ভর ধরিত্রীও,
পন্থা—পদ-চিহ্ন-হরা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি,
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি।
তোমায় কবি বর্ণিবে কি ? নও হে তুমি বর্ণনীয়।
আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

এই বর্ণনার প্রতি চরণে শাস্ত্রোক্তি ছড়িয়ে আছে, কবিমানসের বিশেষ কোনো পরিচয় এখানে অনুপস্থিত। এখানে বিদ্যা আছে, প্রজ্ঞা নেই। নিজস্ব বক্তব্যরহিত এই সমুদ্র-বন্দনায় তাই সুইন্‌বর্নের মত সত্যেন্দ্র-কবিমানসের কোনো পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় নি।

আরেকটি কবিতা আছে যা সত্যেন্দ্র-প্রতিভার সমর্থনে উপস্থিত করা যায়। তা 'মহাসরস্বতী' কবিতাটি। মহাসরস্বতীর বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত বিদ্যা, মনোযোগ ও শক্তি নিয়োগ করেছেন, কিন্তু এই সরস্বতী কবিমানসের প্রেরণাদায়িনী

নন, ইনি নিতান্তই শাস্ত্রোক্ত দেবী। শাস্ত্রনিষ্ঠ ভক্তকবিকণ্ঠে মহাসরস্বতীর বন্দনাই এখানে শুনি ;

বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা! চিত্তময়ী! অয়ি জ্যোতিষ্মতী!
মহীয়সী মহাসরস্বতী!
শক্তির বিভূতি তুমি। তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী! অন্ধকারে তুমি উষা-প্রভা!
সূর্যে-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে ;
সবিতৃ-সম্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।
ছিন্ন-মেঘ অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা
তুমি নিরুপমা।

এই মহাসরস্বতীকে কবি 'আত্মার আরাম', 'ব্রহ্ম-ছায়া', 'গায়ত্রী শাশ্বতী', ও 'বিশ্ব-বিম্ববতী' বলেছেন, কিন্তু কবিমানসে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কবিকল্পনার যে নিগূঢ় প্রেরণা 'বিচিত্ররূপিণী চিত্রা' বা 'দেবী সারদা'য় পরিণত হয়েছেন, তা এখানে অনুপস্থিত। এ জন্যই সত্যেন্দ্রনাথ যতই বলুন,

রুদ্রের দুহিতা দেবী! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান,
সব কুণ্ঠা হোক্ অবসান।...
দুর্লভের গূঢ়-তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্পনা,
অয়ি দেবী মহতী কল্পনা!

এই দেবী কবিমানসে আসন পাতেন নি, তিনি 'সিদ্ধির প্রসূতি ঋদ্ধি আরাধিতা মহাসরস্বতী' হয়ে রইলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় কুত্রাপি এই মহাসরস্বতীর প্রভাব পড়ে নি। তাই

এই সরস্বতী-বন্দনা সাগর-বন্দনার মতোই বাহিরের বস্তু, কবিচিত্তভূমিতে এর অধিষ্ঠান নয়। এ জন্যই সত্যেন্দ্র-প্রতিভাকে প্রথমশ্রেণীর গীতিকবি-প্রতিভা বলা যায় না।

সুইন্‌বর্ন্‌ ও সত্যেন্দ্রনাথ একই পাথেয় নিয়ে কাব্যসরণিতে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সুইন্‌বর্ন্‌ যেখানে গ্রীক পেগান জীবনোল্লাস-সন্ধানে বেরিয়ে মহত্তর দুঃখ ও বেদনাকে বরণ করে নিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে সংশয়-বেদনাবিহীন লঘু কল্পনার জগতে নীলপরী, ইল্‌শে-গুঁড়ি ও পাল্কি-চলার গানের তন্দ্রালস সুরে আচ্ছন্ন হয়েই কবিকৃত্য সমাপ্ত করেছেন।

সত্যেন্দ্র-প্রতিভার গভীর আলোচনা আমাদের একটি অনিবার্য দুঃখকর সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়; তা হল—সত্যেন্দ্রনাথ অপরিণত এবং অচরিতার্থ কবিশক্তির অধিকারী।

সমাপ্ত



শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	পংক্তি সংখ্যা	মুদ্রিত	সংশোধিত
২৭০	১৬	(১৯৫৩),	(১৯৫৩,
২৭২	৯	ব্যতিক্রম	ব্যতিক্রম।
২৭৭	১৮	চাহি সত্যের মৃত্যুর	চাহি সত্য মৃত্যুর
ঐ	২০	করি কি	করিব কি
২৮১	৭	ভাসি নয়নের	ভাসি আমি নয়নের
২৮৭	১	যোগ্য। 'কালকূট',	যোগ্য। 'কে জাগে', 'কালকূট',
ঐ	১৫	দূর কর মোর মোহ-আবরণ,	দূর কর মোহ-আবরণ,
ঐ	২২	ভস্মস্তপে	ভস্মস্তূপে
২৮৮	১০	দক্ষিণ-মেরুতে জীবনের	দক্ষিণ-মেরুতে
২৯০	১	'তমসা-জাহ্নবীতে'	'তমসা-জাহ্নবী'তে
২৯২	২	উৎসর্গীকৃত, এই	উৎসর্গীকৃত, পিতাকে উৎসর্গীকৃত এই
ঐ	১৭	কাব্যে	কাব্য
২৯৫	৯	বুনি জাল	বুনি যে জাল
২৯৭	৭	মিশিছে	মিশেছে
৩০০	৯	নীর নীল	নীল নীর
৩০৬	১১	সেই রহস্য	সে রহস্য
ঐ	১৭	হব চিরজীবী	হবি চিরজীবী
৩১১	৫	শুদ্ধ, ক্যানেস্তারা-টিন।	শুদ্ধ, বাজে ক্যানেস্তারা-টিন